নীহাররঞ্জন গুপ্ত

৫-১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মানুষের মনটাকে যদি কোন বস্তুর সঙ্গে তুলনা করা যেত তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যেত সে বস্তুটি শুধু বিচিত্রই নয় দুর্বোধ্যও বটে।

কিন্তু তার চাইতেও বুঝি বিচিত্র ও দুর্বোধ্য সেই মনের মধ্যে যে ভালবাসা নামক বস্তুটি সময় সময় জন্ম নেয় সেই অতনুঘটিত ব্যাপারটি।

নইলে যে পুরুষ তাকে শুধু তাচ্ছিল্যই নয়, এক প্রকার ঘৃণাই করেছে, তারই প্রতি শীলার সমস্ত মনটা অমনভাবে ছুটে গিয়েছিল কেন এক দুর্দমনীয় অন্ধ আবেগে।

আর কেনই বা সেই ভালবাসার পায়ে মাথা খুঁড়ে, নিজের সবটুকু দৈন্য প্রকাশ করে শুধুমাত্র রিক্ততার হাহাকার নিয়ে ফিরে গেল।

বিচিত্র। সবটাই আগাগোড়া যেমন বিচিত্র তেমনি দুর্বোধ্য।

কিন্তু কিরীটী বলেছিল শাশ্বতকে, প্রথমটা দুর্বোধ্য অবিশ্যি আমারও মনে হয়েছিল শাশ্বত। কিন্তু শীলার জবানবন্দীর পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা, সেই দীর্ঘ কাহিনীর মধ্যেই উত্তর আমি খুঁজে পেয়েছিলাম।

শীলার জবানবন্দী! বিস্মিত শাশ্বত প্রশ্নটা করেছিল কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে, শীলা লিখিত কোন জবানবন্দী দিয়েছিল নাকি?

মৃদু হেসে কিরীটী বল্লে, দিয়েছিল।

কিন্তু কই, আদালতে মামলার সময়—

না, সে জবানবন্দী তার আমি আদালতে পেশ করি নি।

কেন?

কারণ সে জবানবন্দী সে আদালতকে দেয় নি।

তবে?

দিয়েছিল আমাকে। এবং একান্তভাবে আমাকেই তার নিজস্ব জবানবন্দী হিসাবে লিখে দিয়ে গিয়েছিল।

ব্যাপারটা ঠিক আমি বুঝলাম না কিরীটী।

আসলে আমার কাছে শীলার বলবার কিছু ছিল। কিংবা ঠিক আমার

কাছেও হয়তো নয়, কোন একজনের কাছে অন্তত তার নিজের সব কথা না বলে বুঝি সত্যিই কোন উপায় ছিল না। বুকের মধ্যে যে ব্যথাটা তার বিষের মত ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল, অন্তত কোন একজনের কাছে সেটা বলে মুক্তিই চেয়েছিল বুঝি সে।

মুক্তি!

হ্যাঁ, চিঠিটা তুমি যদি চাও তো দিতে পারি। তবে একটি শর্তে।

কি শর্ত?

পড়া হয়ে গেলে সেটা আবার তুমি আমাকে ফিরিয়ে দেবে।

বেশ।

কথা দিচ্ছ ফিরিয়ে দেবে?

কথা দিলাম।

ছোট বা সংক্ষিপ্ত কোন চিঠি নয়।

বিরাট ষোল পৃষ্ঠা ব্যাপী সুদীর্ঘ এক চিঠি।

সেদিন রাত্রেই কিরীটীর ওখান থেকে ফিরে এসে শয়নের পূর্বে চিঠিটা নিয়ে বসেছিল শাশ্বত।

শ্রদ্ধেয় কিরীটীবাবু,

এই চিঠিটা যখন আপনার হাতে পৌঁছাবে তখন আমি অনেক দূরে। তবু শেষ পর্যন্ত কেন যে যাবার আগে এই চিঠিটা আপনাকে লিখতে বসেছি তা আমি নিজেই জানি না।

মনকে নানা ভাবে আজ দুদিন ধরে প্রশ্ন করেও কোন সদুত্তর পাই নি।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত চিঠিটা আমার ধৈর্য ধরে পড়বেন কিনা আপনি তাও জানি না।

তবু কেন লিখছি তাই না।

বললাম তো কেন যে লিখছি তা নিজেই জানি না আমি।

আপনার জীবনে এ যাবৎ কত পুরুষ ও মেয়ে হয়তো এসেছে।

কত মেয়ে পুরুষের জীবনের কত জঘন্যতম গ্লানির উদ্ঘাটনও হয়তো আপনার তীক্ষ্ণ বিচার ও বিশ্লেষণের কাছে হয়েছে।

আমার মত কত মেয়ের জীবনের ট্র্যাজিডীই হয়তো আপনাকে দেখতে হয়েছে, শুনতে হয়েছে।

কিন্তু তবু তাদের সকলের পাশে পাশে যখনই আমার কথা আপনার মনে পড়বে, একটা অনুরোধ শুধু সেদিন আমাকে ঘৃণা করবার আগে যেন একটি কথা অন্তত মনে করেন, যত পাপ বা যত অন্যায়ই করে থাকি না কেন তার পিছনে ছিল এক হতভাগিনী নারীর জীবনব্যাপী প্রেম-তৃষ্ণা সেদিন।

এক হতভাগিনী যে জীবনে প্রথম ভালবাসার সত্যিকারের স্বাদ পেয়ে শুধুমাত্র সমাজের চোখ-রাঙানিতেই সেই ভালবাসার মালা কণ্ঠে তুলে নিতে পারে নি বলেই ভীরু দৃষ্টিতে যাকে সে ভালবেসেছিল তারই মুখের দিকে কেবল চেয়েছিল।

ভাবতে পারেন কি আপনি, এক হতভাগিনী নারীর জীবনের সমস্ত সাধ আশা আকাঙ্ক্ষা যখন ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে সেই সময় নতুন করে এলো আবার ঘর বাঁধবার ডাক।

আর সেই ডাকে সেদিন যদি সাড়া দিয়েই থাকি খুব অন্যায়ই কি করেছিলাম!

বিশ্বাস করুন আপনি, বেশী কিছু না, টাকাকড়ি, ঐশ্বর্য, প্রাচুর্য কোন কিছুই চাই নি আমি সেদিন, চেয়েছিলাম শুধু একখানি ঘর।

একখানি ঘর, যে ঘরের মধ্যে আর কিছু না থাক, থাক শুধু একটু ভালবাসা, একটু নিশ্চিন্ত আশ্বাস।

তাইতো যাবার বেলায় আজ ভাবছি সেটুকু থেকেও ভগবান আমাকে বঞ্চিত করলেন, কেমন এ বিচার তাঁর বলতে পারেন!

দয়াময়ই যদি নাম তাঁর তো এ কেমন ধারা দয়া তাঁর!

একজনের সর্বস্ব নিয়েও তাঁর তৃপ্তি হলো না, শেষ সম্ভাবনাটুকু পর্যন্তও তার কেড়ে নিয়ে নিঃস্ব একেবারে পথের ভিখারী করে ছেড়ে দিলেন তাকে।

আমি চোর, আমি জালিয়াত, আমি লোভী, সব—সবই আমি কিন্তু আজ একবার আমার সৃষ্টিকর্তাকে সামনাসামনি পেলে জিজ্ঞাসা করতাম একটি কথাই, সব অভিযোগই আমার 'পরে মেনে নেবো আমি, কিন্তু তার আগে একটি কথার জবাব দাও, এ সব কিছুর জন্য দায়ী কে? তুমিই যদি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা তবে আমাকে তো তুমিই করেছ লোভী, চোর, জালিয়াত। তবে সকল অপরাধের ভার কেন একা আমাকেই বা বইতে হবে? আর তুমিই বা কোন যুক্তিতে থাকবে চিরদিন ধরাছোঁয়ার বাইরে?

কিন্তু সেও তো সেই পুরাতন প্রশ্ন।

কোন জবাব যার আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

তাছাড়া যে কথা বলবার জন্য এই চিঠির অবতারণা সেই কথাই বলি।

নরহরিবাবুর নাম—

নরহরি।

নরহরি সরকার।

অকস্মাৎ যেন নতুন করে আবার মনে পড়ে গেল সমস্ত ব্যাপারটা শাশ্বতর।

মাত্র কয়েকটা দিন আগেকার কথা।

ব্যাপারটা শেষ হয়েও যেন শেষ হয় নি।

শেষের সুরটি যেন এখনো বাজে বেজে আছে।

১ ॥

প্রথমটায় কিরীটী তার বন্ধু পুলিস ইনেসপেক্টর শাশ্বত চৌধুরীর কথায় তেমন যেন কোন মন দেয় নি বা আগ্রহও দেখায় নি

কেমন যেন একটা নির্লিপ্ত অন্যমনস্ক ভাব।

সোফাটার উপর শিথিল এলায়িত ভঙ্গিতে গা ঢেলে দিয়ে নিঃশব্দে পাইপ টানতে টানতে শাশ্বতর কথা শুনছিল কেবল।

অকস্মাৎ একসময় যেন কথার মধ্যে সোজা হয়ে উঠে বসল. দু চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

শরীরের শিথিল এলায়িত ভঙ্গিটা ঋজু, তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। একটু যেন গুছিয়ে বসল কিরীটী। এবং মৃদু আগ্রহান্বিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে, তারপর ?

কিরীটীর প্রশ্নে শাশ্বত যেন এতক্ষণে কিছুটা আশান্বিত হয়ে ওঠে। এবার উৎসাহের সঙ্গে বলে, তারপর যে কি সেইটাই তো বর্তমানে বুঝে উঠতে পারছি না এখনো।

কি বুঝে উঠতে পারছ না শাশ্বত ?

সত্যি সত্যিই ঐ শীলা রায় আসল না নকল। অর্থাৎ অনিরুদ্ধবাবুর কথাই ঠিক, না সে মিথ্যা বলছে—

মিথ্যা বলবার যখন কারণ এক্ষেত্রে আছে তখন তার পক্ষে মিথ্যা বলাটা খুব একটা বিচিত্র নয় অবিশ্যি—কিন্তু তোমাদের ঐ শীলা রায় যে

সত্যিই আসল শীলা রায় নয় সে সম্পর্কেই বা তোমাদের অনিরুদ্ধবাবু এমন ভাবে স্থিরনিশ্চিত হলেন কি করে? উভয়ের মধ্যে পূর্ব-পরিচয় কিছু ছিল নাকি?

ছিল।

কি রকম? কিরীটী আবার তাকাল সাগ্রহে ওর মুখের দিকে।

এই ঘটনার বৎসর তিনেক পূর্বে দিল্লীর একটা ইনডাসট্রিয়াল একজিবিসনে ওদের পরস্পরের নাকি দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ-পরিচয় হয়েছিল ঘটনাচক্রে। সেই সময় মাস ছয়েকের জন্য অনিরুদ্ধবাবুকে দিল্লীতে থাকতে হয়েছিল তার ইনস্যুরেন্সের কাজের ব্যাপারে।

কিরীটী অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর যেন কতকটা আত্মগত ভাবেই মৃদু কণ্ঠে বললে, তাহলে অনিরুদ্ধবাবুর মতে ঐ শীলা রায় আসল শীলা রায় নন।

না।

হুঁ। তা তোমাদের শীলা রায় কি বলছেন ওই অনিরুদ্ধ সম্পর্কে? তাঁর মতে ওই অনিরুদ্ধবাবুই আসল বা জেনুইন অনিরুদ্ধই তো?

হ্যাঁ, তিনি অবিশ্যি অনিরুদ্ধ সম্পর্কে কোন মতদ্বৈধই প্রকাশ করছেন না। অনিরুদ্ধবাবুরই ধারণা বৎসর দেড়েক আগে যে ট্রেন ডিজাস্টার হয়েছিল তাতেই আসল শীলা রায়ের মৃত্যু হয়েছে, ওই শীলা রায় সাম আদার পার্সন ইন ডিসগাইস।

হ্যাঁ হ্যাঁ—একটু আগে তুমি একটা কি ট্রেন ডিজাস্টারের কথা বলছিলে বটে। তা—

কেন, তোমার মনে নেই, বছর দেড়েক আগে মোগল সরাইয়ের কিছু পরে ডাউন তুফান এক্সপ্রেসের বড় রকমের একটা ডিজাস্টার হয়েছিল!

হ্যাঁ হ্যাঁ—তা নয়, বলছিলাম তুমি একটু আগে বলছিলে না সেই ট্রেনের দুর্ঘটনাতেই মৃত ও অজ্ঞাত যাত্রীদের তালিকাতে তোমার ওই অনিরুদ্ধের নামও ছিল?

হ্যাঁ, শুধু অনিরুদ্ধ কেন, ওই শীলা রায়ের নামও তার মধ্যেই তো ছিল।

তাই নাকি!

হ্যাঁ, তিনিও সেই ট্রেনেরই যাত্রী ছিলেন।

হুঁ, শাশ্বত, গোড়া থেকে তুমি তোমার কাহিনীটা আর একবার বল তো?

গোড়া থেকে বলব?

হ্যাঁ, কারণ ওই ট্রেন দুর্ঘটনায় মনে আছে আমার এক পরিচিত সহপাঠীও মারা যায় আর নামটাও ছিল তার ওই অনিরুদ্ধ ঘোষই—

বল কি !

হ্যাঁ, মৃতের তালিকার মধ্যে যাদের সঠিক ভাবে আইডেনটিফাই করা যায় নি—তাদের মধ্যেই অনিরুদ্ধও ছিল বলেই আমার ধারণা।

কিরীটীর কথায় শাশ্বত যেন বেশ একটু উদগ্রীবই হয়ে ওঠে এবং বলে, অনিরুদ্ধ এককালে যখন তোমার সহপাঠী ছিল তখন নিশ্চয়ই তাকে তুমি এককালে বেশ ভাল ভাবেই চিনতে ?

তা চিনতাম, কারণ কলেজ অ্যাথেলেটিক ক্লাবের সে যে কেবল অন্যতম পাণ্ডা বা সেক্রেটারীই ছিল তাই নয় কলেজ ড্রামাটিক ক্লাবেরও সে ছিল অন্যতম পাণ্ডা বা প্রধান উৎসাহী।

তাই নাকি !

হুঁ। হি ওয়াজ এ বর্ণ অ্যাকটর।

তাকে দেখলে এখন চিনতে পারবে ?

তা দশ বারো বছরের কথা হলেও চিনতে হয়তো পারব, কিরীটী বললে।

সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় বুকপকেট থেকে একটা খাম বের করে, খামের ভিতর থেকে পোষ্টকার্ড সাইজের একটা ফটো টেনে বের করে, শাশ্বত ফটোটা কিরীটীর সামনে এগিয়ে ধরল। বললে, দেখ তো চিনতে পার কিনা। এটা অবিশ্যি শুনেছি তার কলেজ জীবনের অব্যবহিত পরেরই ফটো।

সাগ্রহে কিরীটী শাশ্বতর হাত থেকে ফটোটা নিয়ে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফটোটা নিরীক্ষণ করে মৃদু কণ্ঠে বললে, হ্যাঁ, এ ফটো মনে হচ্ছে তারই।

অনিরুদ্ধ ঘোষেরই ফটো।

কিরীটীর চিনতে কষ্ট হয় না।

পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়স হবে তখন অনিরুদ্ধর। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের ছাত্র সে তখন।

পরিধানে শাদা ফ্লানেলের ট্রাউজার ও গায়ে টেনিস কোট। বুকে কলেজ ব্লু এনগ্রেভ করা।

ফটোটার পিছনে অনিরুদ্ধর নিজের নাম সই করা ও তার নীচে তারিখ।

ঠিক দশ বছর পূর্বেকার তারিখ।

শাশ্বত আবার কথা বললে, তাহলে তো দেখছি যে শীলা রায় ও অনিরুদ্ধ

ঘোষকে নিয়ে আমাদের বর্তমান সমস্যা। সেই অনিরুদ্ধ ঘোষ তোমার পূর্ব-পরিচিত রায় ?

তাই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু এ তো অনিরুদ্ধর দশ বৎসর আগেকার ফটো, বর্তমান সময়ের তার কোন ফটো নেই তোমার কাছে শাশ্বত ?

আছে।

কই দেখি ?

খাম থেকে আর একটি অনুরূপ সাইজের হাফ্ বাস্ট্ ফটো টেনে বের করে আবার শাশ্বত কিরীটীর হাতের মধ্যে এগিয়ে দিল।

এবারে বেশ কিছুক্ষণ ধরে যেন দুখানা ফটো কিরীটী গভীর মনোনিবেশ সহকারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ ও বিচার করে দেখতে থাকে।

একটি দশ বছর আগেকার, অন্যটি দশ বছর পরের।

দশ বৎসর সময় নেহাত অল্প সময়ের ব্যবধান নয়। রীতিমত দীর্ঘ সময়েরই ব্যবধান।

এবং দশ বৎসর সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানে মানুষের চেহারার অনেক পরিবর্তনই হতে পারে এবং বহু ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবে হওয়াটাও বিচিত্র নয়।

তবু মানুষ মাত্রেরই নিজ নিজ চেহারার যে জন্মগত বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্ব, দশ বৎসর সময়ের ব্যবধানেও কোন বড় রকমের কোন দুর্ঘটনা না ঘটলে খুব বেশী একটা বদলে যায় না। বিশেষ বিশেষ ঢং বা রেখার মধ্যে দিয়েই চেহারার জন্মগত বিশেষত্বটুকু বজায় থেকেই যায়।

তবু কিরীটীর মনে হয় দুটো ফটোর চেহারাই একই জনের।

কোন একই ব্যক্তিবিশেষের।

শাশ্বতই আবার কথা বললে, আমার তো মনে হয় ফটো দুটি একই লোকের। তোমার কি মনে হচ্ছে কিরীটী ?

ফটো দুটি পাশাপাশি রেখে পূর্ববৎ তীক্ষ্ণ নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে কিরীটী পুনরায় বলে, সেই রকমই তো মনে হচ্ছে—

তাই যদি হয় তো ঐ অনিরুদ্ধ তো তোমার দেখছি বন্ধুলোকই হে।

মৃদু হেসে কিরীটী অনিরুদ্ধের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, তাই কী !

ওকে তোমার সাহায্য করাও তো কর্তব্য ওই বিপদে।

কিন্তু বিপদটা তার আবার কোথায় ?

বিপদ নয় ! সেই পাগলা মৃত জমিদার নরহরি সরকারের উইল অনুযায়ী

এখন ওই শীলা রায়কে বিবাহ না করলে নরহরির সম্পত্তির কপর্দকও অনিরুদ্ধ যে পাবে না।

কি রকম ?

তাহলে আর এতক্ষণ ধরে তোমাকে বললামই বা কি আর তুমি শুনলেই বা কি ?

হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে মৃত নরহরিবাবুর সঙ্গে অনিরুদ্ধর কি যেন সম্পর্ক একটা আছে বলছিলে।

অনিরুদ্ধ হচ্ছে তার মৃতা বোন শৈবলিনী দেবীর একমাত্র পুত্র।

অর্থাৎ বল মৃত নরহরির ভাগ্নে।

হ্যাঁ, আর নরহরি ছিলেন চিরকুমার—অকৃতদার।

কাজেই তার মৃত্যুতে অন্য কোন ওয়ারিশন যখন নেই তখন ঐ অনিরুদ্ধই মৃত নরহরির সমস্ত সম্পত্তির ন্যায্যত মালিকানা স্বত্ব পাচ্ছে—

কিন্তু তাতে আবার গোলমালটা কোথায় ? কিরীটী বলে।

গোলমাল একটা আছে বৈকি।

কেন, গোলমালটা এর মধ্যে আবার কিসের ? আর যখন কোন সম্পত্তির দ্বিতীয় ওয়ারিশন নেই বলছই ?

গোলমালটা হচ্ছে মৃত নরহরি সরকারের উইলের শর্তে।

উইলের শর্তে ?

তাই তো বলছি। নরহরি বিচিত্র এক উইল করে রেখেছেন তার চিরন্তন পাগলামির ঝোঁকে।

লোকটা পাগল ছিল নাকি ?

তাছাড়া আর কি ?

কি রকম ?

পাগলাই তো। নইলে অমন পাগলের মত উইল কে করে বল তো ?

তা কি লেখা আছে উইলে ?

উইলে লেখা আছে দিল্লীর কোন এক বিধবা আশ্রমের বিমলা দেবীর একমাত্র কন্যাকে যদি অনিরুদ্ধ বিবাহ করে তাহলেই মৃত নরহরির সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে সে। অন্যথায় মাসে মাসে তিনশত টাকা করে মাসহারা পাবে মাত্র।

বিচিত্র উইল তো! তা ওই তোমাদের শীলা রায় বোধ হয় ঐ বিমলা দেবীরই কন্যা ?

তাই।

বিমলা দেবী বর্তমানে জীবিতা না মৃতা?

বছর আষ্টেক হল তার মৃত্যু হয়েছে।

হুঁ। তা তোমাদের ঐ শীলা রায়ের মনোবাঞ্ছাটা কি? তিনি অনিরুদ্ধকে বিবাহ করতে রাজী না, না?

সে রাজী কি অরাজী সে প্রশ্নই তো এখনো উঠছে না অনিরুদ্ধ যতক্ষণ না ঐ শীলা রায়কেই আসল শীলা রায় বলে স্বীকৃতি দিচ্ছে।

কিরীটী এর পর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। ফটো দুটো সামনে টেবিলের 'পরে রাখা, সেই দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে থাকে।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ একসময় আবার কিরীটী শাশ্বতর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, আচ্ছা শাশ্বত, বলতে পার তোমার ঐ বর্তমান নাটকের মধ্যে তৃতীয়া কোন নারী আছে কিনা?

তৃতীয়া নারী?

হ্যাঁ—মানে তোমাদের অনিরুদ্ধর পরিচিত—

কই, সে রকম কিছু আছে বলে তো—

জান না তাই তো।

হ্যাঁ, মানে—

তারই সর্বাগ্রে ভাল করে সন্ধান নাও, তারপর—

তারপর?

তারপর এও তোমার জানতে হবে ওই শীলা দেবী সত্যি সত্যিই তোমাদের অনিরুদ্ধকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক কিনা এবং—

কী?

যিনি দেড় বৎসর পূর্বেকার ট্রেন ডিজাস্টারের ফলে মৃত বলে চিহ্নিতা হয়ে গিয়েছিলেন, হঠাৎ মাস দুয়েক পূর্বে তার এ ভাবে পুনরাবির্ভাব সম্ভবপর হল কি করে! এই দেড় বৎসর সময় তিনি কোথায় কি ভাবে ছিলেন!

ট্রেন ডিজাস্টারের ফলে মাথায় গুরুতর চোট খেয়ে তার স্মৃতিভ্রংশ হয়েছিল।

স্মৃতিভ্রংশ!

ঠিক ওই সময় ঢং ঢং করে দেওয়াল ঘড়িতে রাত্রি এগারটা ঘোষিত হল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পুরাতন ভৃত্য জঙ্গলীর আবির্ভাব ঘরের মধ্যে, বাবু—

কী?

মা বলছেন খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে—

সত্যিই রাত এগারটা—নাঃ, অনেক রাত হয়ে গেছে। বলতে বলতে ওঠে শাশ্বত।

চললে না কি?

হ্যাঁ, কাল আসছি আবার—আসব তো?

এস।

কিরীটীর শেষের কথায় শাশ্বত যেন একটু আনন্দিত মনেই ঘর ত্যাগ করে।

॥ ২ ॥

ঘটনাটা বিচিত্রই সন্দেহ নেই।

শাশ্বত যে ইতিহাস পরের দিন এসে দ্বিপ্রহরে শোনাল পুনরায় কিরীটীকে, যদি সবটাই তার সত্য হয় তো বিচিত্র নিঃসন্দেহে।

রায়বাহাদুর নরহরি সরকার স্বোপার্জিত নয় পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত বিরাট সম্পত্তি ও শাঁসালো ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্সের দৌলতে মৃত্যুকালে যা রেখে গিয়েছেন সেটা রীতিমত লোভনীয়ই নিঃসন্দেহে। এবং তার একমাত্র ওয়ারিশন বর্তমানে অনিরুদ্ধ ঘোষ।

নরহরির একমাত্র সহোদরা শৈবলিনী দেবীর একমাত্র পুত্র ওই অনিরুদ্ধ।

ভাই বোন নরহরি ও শৈবলিনী বলাই বাহুল্য রীতিমত একগুঁয়ে প্রকৃতির ছিল। অবিশ্যি ওই বিশেষ গুণটি তারা ভাই বোন তাদের স্বর্গীয় পিতৃদেব রাখোহরির চরিত্র থেকেই পেয়েছিল।

নরহরি ও শৈবলিনীর মা ওদের যখন একজনের বয়স এগার ও অন্যের নয় তখনই স্বর্গতা হন।

দ্বিতীয় বার আর দারপরিগ্রহ করেন নি রাখোহরি।

ছেলেমেয়ে দুটিকে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া ও মানুষ করে তোলা ব্যাপারটা স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকেই নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন।

যদিচ রাখোহরির পিতৃদেব একদা কোম্পানীর মুচ্ছুদ্দিগিরি করে প্রচুর সম্পদ গড়ে তুলেছিলেন, তথাপি একমাত্র পুত্র রাখোহরিকে সে সময় সেই কলকাতার নব্যযুগের নতুন শিক্ষার আওতা থেকে দূরে সরিয়ে তো নিয়ে যানই নি বরং সেই দিকেই উৎসাহিত করেছিলেন।

ফলে নতুন শিক্ষা ও সংস্কারের আলোয় রাখোহরি নতুন মানুষই গড়ে উঠেছিলেন।

তখনকার সময়কার কলকাত্তায়ী বাবুয়ানীতে ভেসে যান নি।

তারই পুত্র নরহরি ও কন্যা শৈবলিনী।

কাজেই পিতার সংস্কৃতির ছাপটা পুত্র ও কন্যা দুজনারই মনের মধ্যে বেশ ভাল ভাবেই পড়েছিল।

পুত্র ও কন্যাকে রাখোহরি ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে আটকে রাখেন নি।

বাইরের জগৎটাকে চিনবার অবকাশ দিয়ে মানুষের মত মানুষ করেই গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। পুত্রকন্যাদের বিবাহের ব্যাপারেও কোন সামাজিক পচা সংস্কারকে প্রাধান্য দেন নি, ফলে অকস্মাৎ একদিন যখন রাখোহরি শুনলেন তাঁর মেয়ের মুখে—মেয়ে তার এক ক্রিশ্চান যুবক আলফ্রেড ঘোষকে ভালবেসে বিবাহ করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে, রাখোহরি মেয়েকে কোনরূপ বাধা দিলেন না বটে তবে স্পষ্টই বলে দিলেন, বিয়ে তুমি করতে পার, বাধা দেব না। কিন্তু বিয়ে যদি কর তো আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্কই আর থাকল না এইটুকুই শুধু মনে রেখ।

বাপের স্পষ্ট কথায় মেয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বলল, বেশ। তাই হবে।

তার চাইতে কোন স্বজাতের ছেলেকে পছন্দ করে বিয়ে কর না কেন? হিন্দুর মেয়ে হয়ে ম্লেচ্ছের সঙ্গে—যে লোক নিজের ধর্ম ত্যাগ করে অন্য বিদেশীর ধর্মে আশ্রয় নিয়েছে—

কিন্তু শৈবলিনী ততক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল না।

পিতার কথার মাঝখানেই সে ঘর ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল।

শুধু ঘর নয় পিতৃগৃহই ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল চিরদিনের মত। আর সে পিতৃগৃহে পা দেয় নি।

রাখোহরিও জীবনে বাকী ক'টা দিন কোনদিন আর ওই মেয়ের নাম মুখে আনেন নি।

এবং ওই ব্যাপারের ঠিক বৎসর দুই পরেই রাখোহরি পেলেন দ্বিতীয় আঘাত।

আঘাতটা এল একমাত্র পুত্র নরহরির কাছ থেকে এবারে।

প্রথম আঘাত এসেছিল একমাত্র কন্যার দিক থেকে, দ্বিতীয় আঘাত এল একমাত্র পুত্রের কাছ থেকে।

ছেলের বয়েস হয়েছে, এবারে তাকে বিবাহ দিয়ে গৃহী করা দরকার। উপযুক্ত মনোমত পুত্রবধূর সন্ধান অনেকদিন থেকেই করছিলেন রাখোহরি।

কিন্তু তেমন মনের মত একটি বধূও চোখে পড়ছিল না।

হঠাৎই ওই সময় শ্রীরামপুরে একটি পাত্রীর সন্ধান পেয়ে পাত্রীটিকে দেখে রাখোহরির চোখ যেন জুড়িয়ে গেল। মেয়েটির বয়স তখন মাত্র পনের, স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী।

নরহরি তখন বি.এ. পড়ছে—ফোর্থ ইয়ার।

মেয়ে দেখে পছন্দ হওয়ায় এক প্রকার পাকা কথা দিয়েই রাখোহরি গৃহে ফিরে এলেন।

রাত্রে ছেলেকে ঘরে ডেকে কথাটা বললেন রাখোহরি।

সঙ্গে সঙ্গে নরহরি জবাব দেয়, তোমার মনোনীতা পাত্রীকে আমার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয় বাবা।

বজ্রাহতের মতই যেন কথাটা শুনে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়েছিলে রাখোহরি। এবং প্রথম ক'টা মুহূর্ত তাঁর মুখ দিয়ে কোন বাক্যই সরে নি।

পুত্র নরহরি তখন আবার বলে, কথাটা দু-চার দিনের মধ্যেই তোমাকে আমি জানাতাম। আমি যাকে বিয়ে করব তাকে আমি মনোনীত করেছি।

মনোনীত করেছ?

হ্যাঁ, বিমলা তার নাম।

কোথাকার মেয়ে? কার মেয়ে? বয়স কত?

বয়স আমার চাইতে বছর তিনেকের ছোট। তবে—

তবে—

সে, মানে সে বাল্যবিধবা।

বিধবা! যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না তখন রাখোহরি।

হ্যাঁ—

তুমি, তুমি—বিধবা বিয়ে করবে হরি?

নয় বছর বয়েসের সময় তার বিয়ে হয়েছিল কিন্তু এক বছরের মধ্যেই সে বিধবা হয়েছে। ওই বিয়ে তো বিয়েই নয়।

নরহরি ওই বিধবা বিবাহ করবে বলায় কত বড় আঘাত যে সে তার প্রৌঢ় বাপকে দিয়েছিল পরমুহূর্তেই বুঝতে পারলে যখন অকস্মাৎ জ্ঞান হারিয়ে রাখোহরি চেয়ার থেকে মাটিতে পড়ে গেলেন।

সে জ্ঞান আর রাখোহরির ফেরে নি।

চব্বিশ ঘণ্টা পরেই মৃত্যু হয়েছিল।

রাখোহরি যতই নব্যযুগের আবহাওয়াকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করুন না কেন, বংশানুক্রমিক যে হিন্দু সংস্কার তাঁর রক্তের মধ্যে মিশেছিল সেই সংস্কারের দাবীকে অগ্রাহ্য করবার মত মেরুদণ্ডের জোর বুঝি তাঁর ছিল না, তাই মেয়ের দিক থেকে একবার আঘাত পাবার পর একমাত্র পুত্রের দিক থেকে আঘাতের পুনঃসম্ভাবনাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটল

নরহরি কিন্তু সত্যি সত্যিই বিমলাকে প্রাণাপেক্ষাই ভালবেসেছিল এবং বাপ রাখোহরি জীবিত থাকলে যে সে বিমলাকে বিবাহ করতই তাতে বুঝি বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশও ছিল না।

কিন্তু যে প্রেমের স্বীকৃতির মূলেই অকস্মাৎ অত বড় একটা বিপর্যয় ঘটে গেল, পরে সেই প্রেমকেই প্রকাশ্যে স্বীকৃতি দিতে কি জানি কেন নরহরির মত জিদী একগুঁয়ে মানুষও পারে নি সেদিন। ফলে স্থিরীকৃত বিবাহটা শেষ পর্যন্ত আর ঘটে ওঠে নি।

বিমলা কিন্তু ব্যাপারটা সেদিন বুঝতে চায় নি।

বোঝবার চেষ্টাও করে নি।

নরহরির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করে আর একজনকে বিবাহ করে সংসার পেতে বসল।

কিন্তু বিবাহের পর চারটি বছরও গেল না দেড় মাসের শীলাকে নিয়ে দ্বিতীয়বার বিধবা হল বিমলা।

নরহরি কিন্তু জীবনে কোনদিনই ভুলতে পারে নি বিমলাকে।

আর ভুলতে পারে নি বলেই বোধ হয় জীবনে ও পথই আর মাড়ায় নি সে।

বিমলা ও নরহরির সঙ্গে দ্বিতীয়বার আর দেখাসাক্ষাৎ হয় নি জীবনে। তবে দেখাসাক্ষাৎ না হলেও বিমলার সমস্ত সংবাদই নরহরি রাখত।

বিধবা হবার পর দ্বিতীয়বার বিমলা যে তার শিশু কন্যাটিকে নিয়ে দিল্লীতে গিয়ে কোন এক বিধবা আশ্রমের স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর চাকরি নিয়েছিল নরহরি সে সংবাদ পেয়েছিল যথাসময়েই।

এবং দিল্লীতে ঘটনাচক্রে নরহরির এক পরিচিত ব্যক্তি ছিল, তার মারফতই বিমলার সমস্ত সংবাদই সর্বদা পেয়েছে নরহরি।

বিমলা সম্পর্কে নরহরির মনের দুর্বলতার কথাটা জানা থাকলেও নরহরি সম্পর্কে বিমলার সত্যিকারের মনের কথাটা কিন্তু জানা যায় নি কখনো।

এমন কি তার একমাত্র মেয়ে শীলাও কিছু কোনদিন জানতে পারে নি বা শোনে নি।

শীলার বয়স যখন পনেরো বৎসর সেই সময় বিমলার মৃত্যু হয়।

নরহরি তখন জীবিত। এবং শীলার অসহায় অবস্থার কথা জানতে পেরে নরহরিই তখন তার পড়াশুনা ও জীবনধারণের সমস্ত ব্যবস্থা করে দেয় নিজে অলক্ষ্যে থেকে তার সেই বন্ধুর মারফত।

অনন্যোপায় শীলাকেও সে সাহায্য হাত পেতে নিতে হয়েছিল কারণ সত্যিই সেদিন শীলা দাঁড়াবার মত এতটুকু শক্ত মাটিও দিল্লীর মত শহরে কোথায়ও খুঁজে পায় নি।

শীলা ছাড়াও আর একজনের 'পরে নরহরির নজর ছিল বরাবরই।

সে বড় আদরের সহোদরা শেবলিনীর একমাত্র সন্তান অনিরুদ্ধ।

ভালবেসে পিতার মতের বিরুদ্ধেই বিয়ে করেছিল শৈবলিনী অ্যালফ্রেড ঘোষকে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বেচারীর, সুখী হতে পারে নি সেও কোনদিন জীবনে স্বামীর চারিত্রিক উচ্ছৃংখলতার জন্য।

অ্যালফ্রেডের চরিত্রে যে কেবল উচ্ছৃংখলতাই ছিল তা নয়, লোকটা ছিল যেমন বেহিসাবী তেমনি বাউণ্ডুলে ও অস্থির—চঞ্চল প্রকৃতির।

চঞ্চল প্রকৃতির জন্য কোথায়ও সে স্থির হয়ে বেশীদিন চাকরি করতে পারে নি একটানা।

প্রথমে হয়েছিল পুলিস সার্জন, তারপর কিছুদিন টি. টি. আই., তারপর ব্রোকারী—তারপর একটা বিলেতী ঔষধ কোম্পানীর এজেন্ট।

শেষের দিকে আবার মদও ধরেছিল।

এবং অল্প বয়েসে মৃত্যুর কারণও হয়েছিল সেই অতিরিক্ত মদ্যপান।

সারাটা জীবনই বলতে গেলে শৈবলিনীকে ঘোরতর অশান্তি, অভাব আর অনটনের মধ্যেই কাটাতে হয়েছে।

একমাত্র সান্ত্বনা বুঝি ছিল শৈবলিনীর একমাত্র পুত্র অনিরুদ্ধ।

অনিরুদ্ধ বরাবর বৃত্তি পেয়ে গিয়েছে।

এবং শৈবলিনীর ইচ্ছাতে সে কলকাতায় থেকেই বরাবর পড়াশুনা করেছে মা বাপের সংসর্গ থেকে দূরে।

পিতার মৃত্যুর পর নরহরি বহুবার বহুভাবে বোন শৈবলিনীকে সাহায্য
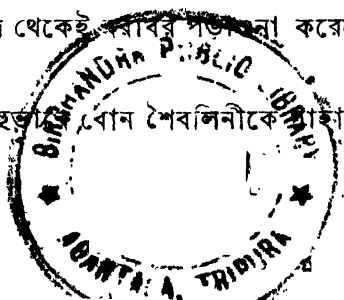
করতে চেয়েছে কিন্তু শৈবলিনী ভাইয়ের কোন সাহায্যই কোন দিন নিতে রাজী হয় নি।

এমন কি স্বামীর মৃত্যুর পর যে দুই বছর শৈবলিনী বেঁচেছিল, সে সময় নিদারুণ অর্থাভাবেই তার দিন কেটেছে কিন্তু তখনও ভাইয়ের কোন সাহায্য সে নেয় নি।

শৈবলিনী যখন মারা যায় অনিরুদ্ধ তখন বি. এস.-সি. পাস করে স্নাতকোত্তর বিভাগে পড়ছে।

কিন্তু মার মৃত্যুর পর আর সে পড়ে নি।

পড়া ছেড়ে এলাহাবাদে চাকরি নিয়ে চলে যায় কোন এক বিলাতী ইনসিওরেন্স কোম্পানীর এজেন্ট হিসাবে।

শীলা আর অনিরুদ্ধর মোটামুটি পূর্ব-কাহিনী হচ্ছে এই।

নরহরির মৃত্যুর পর তার উইলের নির্দেশানুযায়ী তার সলিসিটার শীলা আর অনিরুদ্ধকে দুখানা চিঠি দেন আলাদা আলাদা ভাবে।

নরহরির স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি মিলিয়ে তার মূল্য দশ লক্ষ টাকারও বেশী। এবং সেই সম্পত্তির একমাত্র ওয়ারিশন হচ্ছে তার ভাগ্নে অনিরুদ্ধ ঘোষ।

কিন্তু সম্পত্তি প্রাপ্তির একটি শর্ত আছে।

অনিরুদ্ধ যদি শীলা রায়কে বিবাহ করে তবেই মৃত নরহরির সমস্ত সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব সে পাবে নচেৎ মাসে মাসে মাত্র তিনশত টাকা করে মাসহারা পাবে।

সেই মর্মেই মৃত নরহরির সলিসিটার প্রতাপ গুহ ওদের দুজনকে দুখানা চিঠি দিয়ে অবিলম্বে তাঁর সঙ্গে তাঁর কলকাতার অফিসে দেখা করবার জন্য নির্দেশ দেন।

তারপরই ঘটল বিচিত্র এক ঘটনা।

যতদূর জানা যায় একই ট্রেনে দুজনে একজন দিল্লী থেকে ও অন্যজন এলাহাবাদ থেকে কলকাতাভিমুখে রওনা হল—শীলা ও অনিরুদ্ধ।

সেদিন কিন্তু দুজনার একজনাও জানতে পারে নি যে একই ট্রেনে ওরা চলেছে যদিচ দৈবক্রমে একদিন পরস্পর পরস্পরের মধ্যে অদূর এক ভবিষ্যতে নিকটতম এক সম্পর্ক গড়ে উঠবে কথাটা না জানলেও পরিচয়ের সৌভাগ্য

হয়েছিল কোন এক সময়ে ইতিপূর্বেই একের সঙ্গে অন্যের, যে কথাটা অবিশ্যি পরে জানা গিয়েছিল।

যাহোক সে রাতটা ছিল আবার এক প্রচণ্ড দুর্যোগের রাত।

যেমনি ঝড় তেমনি মুষলধারায় বৃষ্টি।

সেই ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই ট্রেনটা মোগলসরাই ছাড়ল, কিন্তু বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে নি।

মাইল আষ্টেকের মধ্যেই প্রচণ্ড একটা ডিজাস্টারের সম্মুখীন হল।

বহু যাত্রী হতাহত হল সেই আকস্মিক ভয়াবহ দুর্ঘটনায়।

এবং অনিরুদ্ধ ও শীলা যে ওই গাড়িতেই আসছিল সলিসিটার মিঃ গুহ পূর্ব হতেই সেটা জানতেন অথচ তাদের আর কোন রকম সন্ধান না পাওয়ায় স্পষ্টই বোঝা গেল যে সব মৃতদেহকে ভাল করে সনাক্ত করা যায় নি পরে সেই লিস্টের মধ্যেই ওদের দুজনের নাম ছিল।

অনিরুদ্ধ ঘোষ ও শীলা রায়।

মিঃ গুহর দপ্তরে সম্পত্তির ব্যাপারটা অমীমাংসিতই পড়ে রইল।

তারপর অকস্মাৎ দীর্ঘ চার মাস বাদে একদিন সলিসিটার মিঃ গুহর অফিসে এসে হাজির হল অনিরুদ্ধ ঘোষ।

সে নাকি সে রাত্রের ট্রেন ডিজাস্টারে মরে নি। দৈবক্রমে দুর্ঘটনার মধ্যে পড়ে নিদারুণ আহত হয়েও কোন মতে বেঁচে গিয়েছে। তার ডান হাতটি অবশ্য কনুই থেকে সিরিয়াস কম্পাউণ্ড ফ্র্যাকচার হওয়ায় শেষ পর্যন্ত অ্যাংকাইলোসিস হয়ে একেবারেই অকর্মণ্য হয়ে গিয়েছে।

যাহোক অনিরুদ্ধর পরিচয় পেয়ে প্রতাপ গুহ তাকে মৃত নরহরির বরাহনগরের বিরাট ভবনে, একমাত্র ওয়ারিশন হিসাবে প্রবেশাধিকারও দিয়ে দিলেন।

ওই ঘটনার দেড় বৎসর পরে হঠাৎ একদিন সলিসিটার মিঃ গুহর লেখা চিঠিখানা নিয়ে শীলা রায় এসে তাঁর অফিসে দেখা করল।

শীলা রায়ের নামটাও ট্রেন ডিজাস্টারের পর মৃতের তালিকায় ছিল।

কিন্তু দেখা গেল, আশ্চর্য, সেও নাকি মরে নি।

নানা ভাবে প্রশ্ন করলেন শীলা রায়কে মিঃ গুহ সকলের সামনে এবং শীলা রায়ের জবাবে তার পরিচয় সম্পর্কে সন্তুষ্টই হলেন।

তাহলে এবারে আপনি কি করবেন? মিঃ গুহ প্রশ্ন করলেন।

যেমন আপনি বলবেন।

আমি অনিরুদ্ধবাবুকে ফোন করে দিচ্ছি—

মিঃ গুহর কথায় শীলা যেন কেমন একটু চমকেই ওঠে। বলে, তিনি মানে মিঃ ঘোষ বেঁচে আছেন নাকি ?

মৃদু হেসে মিঃ গুহ বললেন, হ্যাঁ, তিনিও আপনার মতই মিরাকুলাসলি বেঁচে গিয়েছেন। তবে—

তবে ?—

দুর্ঘটনাটা তার কাছ থেকে একটু বেশী রকমই আদায় করে নিয়েছে।

কি রকম ?

তার একটি হাত গিয়েছে—

সে কি ?

হ্যাঁ, একটি হাত আজ তার একেবারেই অকর্মণ্য।

অকর্মণ্য ?

তাই। দেখলেই সব বুঝতে পারবেন। যাক। তবু যে প্রাণে বেঁচেছেন—। দাঁড়ান, তাকে একটা টেলিফোন করে সংবাদটা দিই, কতদিন আক্ষেপ করেছেন একই ট্রেন এ্যাকসিডেণ্টে তিনি মরেও বেঁচে গেলেন যেমন তেমনি আপনিও যদি বেঁচে যেতেন কি আনন্দের ও সুখের ব্যাপারই না হত। তার মামার শেষ ইচ্ছাটাও পালিত হত।

বলতে বলতে মিঃ গুহ ফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে ডায়েল করলেন।

॥ ৩ ॥

বাড়ির ভৃত্য বোধ হয় ফোন ধরেছিল, সে জানাল, অনিরুদ্ধ কলকাতায় নেই, বাইরে গিয়েছে দিন চারেক হল।

কোথায় গিয়েছেন জান ?

আজ্ঞে না, যাবার সময় কিছু তো বলে যান নি। ফোনেই জবাব এল।

কবে ফিরবেন জান কিছু ?

না। পুনরায় ফোনে জবাব শোনা গেল।

ফোনটা রেখে এবারে মিঃ গুহ শীলার মুখের দিকে তাকালেন, তাহলে কি করবেন ? আপাততঃ কোন হোটেলে দু-চারদিন থেকে তারপর মিঃ ঘোষ এলে সেখানে গিয়ে উঠবেন, না—

যেমন আপনি বলবেন। শীলা বলে।

আপনি হোটেলে উঠেছেন শুনলে উনি যদি এসে আমার 'পরে অসন্তুষ্ট হন, না তার চাইতে চলুন বরং আপনি সেখানেই থাকবেন—বিশেষ আপনারা যখন পরস্পরের পূর্ব-পরিচিত ?

অতঃপর মিঃ গুহই তাঁর নিজের গাড়ি'তে করে শীলা রায়কে নিয়ে নরহরির বরাহনগরের বিরাট সরকার ভবনে পৌঁছে দিয়ে এলেন।

প্রায় এক বিঘে জায়গার উপরে বিরাট প্রাসাদোপম সেকেলে স্ট্রাকচারের দ্বিতল গৃহ।

বাড়ির পশ্চাতে বেশ প্রকাণ্ড একটা ফল-ফুলের বাগান, বর্তমানে অযত্নে ও অবহেলায় জঙ্গলে প্রায় পরিণত হয়ে এসেছে।

তারপরই গঙ্গা।

ডাইনে এবং বাঁয়েও আট নয় কাটা করে জায়গা জুড়ে ফুলের বাগান, বিরাট পাখীর খাঁচায় নানা জাতীয় পাখী, অর্কিড হাউস, গ্যারাজ, আঁস্তাবল, দাসদাসী মালী—সহিস-সোফার ড্রাইভার ইত্যাদিদের থাকবার ব্যবস্থা।

সত্যিকারের ধনী গৃহেরই জাঁকজমক ও ব্যবস্থা।

নরহরির আমলের ভৃত্যদের মধ্যে একমাত্র একজন পুরাতন ভৃত্য রামচরণ, মালী বংশী ছাড়া অনিরুদ্ধ আর সকলকেই বিদায় দিয়ে নতুন লোক সব ইতিমধ্যেই নিযুক্ত করেছিল।

রামচরণকেও হয়তো বিদায় করত কিন্তু উইলের নির্দেশে সেটা অনিরুদ্ধর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

দোতলা বাড়ির উপরে ও নীচে প্রায় খান কুড়িক নানা আকারের ঘর।

সেকেলে ধনী অতএব নাচঘর থেকে শুরু করে সব ব্যবস্থাই ছিল ওই বাড়িতে।

সেকেলে ধরণের সব ভারী মজবুত দামী দামী আসবাবপত্রে বিরাট সরকার ভবনের প্রতিটি ঘরই বলতে গেলে সেকেলে রুচি অনুযায়ী সাজানো গোছানো।

তিন চারজন নতুন ভৃত্যকে অনিরুদ্ধরও নিযুক্ত করতে হয়েছে সে সবকিছুর সর্বক্ষণ তদ্বির তদারক করতে।

দোতলার দক্ষিণ প্রান্তের খান দুই ঘর অনিরুদ্ধ আসবার পর অধিকার করেছিল, বাদবাকী সব তালাবন্ধই পড়েছিল পূর্বেকার মত।

মিঃ গুহ শীলাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে তার পরিচয় দিয়ে দোতলার

উত্তর প্রান্তের দুখানা ঘরে রামচরণকে দিয়ে তার থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়ে গেলেন।

রামচরণ তার কর্তার উইলের ব্যাপারটা জানত তাই শীলার পরিচয় পেয়ে তাকে সাদরেই গৃহে আহ্বান জানাল।

রামচরণের বয়স পঞ্চাশের উর্ধ্বেই হবে। জাতে সদ্‌গোপ।

ওই বাড়িতে তার প্রায় ত্রিশ বছরেরও অধিক কেটেছে।

ছোটখাটো বলিষ্ঠ গড়নের মানুষটি।

বিয়ে-থা করে নি, সংসারে আপনার জনও কেউ নেই।

লোকটা শান্ত, নির্বিরোধী ও মিতবাক প্রকৃতির।

শীলাকেও প্রথম পরিচয়েই যেমন রামচরণের পছন্দ হয়, শীলারও তেমনি রামচরণকে পছন্দ হয়।

অনিরুদ্ধকেও রামচরণের মোটামুটি পছন্দ হয়েছিল।

শীলা ওই বাড়িতে আসার দিন পনের আগে অনিরুদ্ধ এক সন্ধ্যা রাত্রে ফিরে এল।

এবং তার পরই বর্তমান নাটকের শুরু।

রামচণের মুখে ওই গৃহে শীলার আগমন সংবাদ ও পরিচয় পেয়ে প্রথমটায় অনিরুদ্ধ যেন থমকে গিয়েছিল, একটু যেন বিস্মিতই হয়েছিল।

কিন্তু রামচরণ যখন বললে, আপনি বিশ্বাস করছেন না ছোটবাবু, দিদি-মণিকে ডেকে আনব ?

না, না—তার দরকার নেই। চল, আমিই যাচ্ছি—

তারপর রীতিমত আগ্রহ নিয়েই এগিয়ে গিয়েছিল অনিরুদ্ধ। রামচরণ তাকে অনুসরণ করেছিল।

রামচরণই দেখিয়ে দেয় কোন ঘরে শীলা আছে।

দরজাটা ভেজানোই ছিল।

সরকার ভবনে আসা অবধি শীলা যতক্ষণ ঘরের মধ্যে থাকত ঘরের দরজা ভেজানোই থাকত। দিনের বেলা খুব ভোরে স্নানের জন্য বাথরুমে যাবার সময় ব্যতীত সারাটা দিন কখনো বড় একটা শীলাকে কেউ এ কয়দিন ঘরের বাইরে যেতে দেখে নি।

রামচরণ দু-একবার বলেছে, বাগানে রাত্রে যাবেন না দিদিমণি।

কেন বল তো ?

ও-দিককার বাগানটা অনেকদিন ধরে বড় একটা যত্ন নেওয়া হয় না। জঙ্গল আগাছায় ভরে আছে—দু-চার বার সাপও বের হয়েছে—

মৃদু হেসে শীলা বলেছে, সাপও তাদের ক্ষতি না করলে কখনো দংশায় না রামচরণ।

কিন্তু দিদিমণি—

ভয় নেই তোমার, ওরা আমাকে কিছু বলবে না।

রামচরণের নিষেধ শোনে নি শীলা।

ঘরের দরজাটা ভেজানো দেখে অনিরুদ্ধ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। রামচরণের মুখের দিকে তাকাতেই সে বললে, দরজা খোলাই আছে, আপনি যান ভিতরে।

কথাটা বলে রামচরণ আর দাঁড়াল না। কাজে অন্যত্র চলে গেল।

কিন্তু অনিরুদ্ধ সোজা ঘরে ঢুকলো না। মুহূর্তকাল যেন কি ভেবে ভেজানো দরজার গায়ে মৃদু টোকা দিল।

বার দুই টোকা পড়তেই ভিতর থেকে নারী কণ্ঠে প্রশ্ন এল, কে?

ভিতরে আসতে পারি?

আসুন—

ঘরের মধ্যে ঢুকে অনিরুদ্ধ দেখলো দরজার দিকে পিছন ফিরে একটা উঁচু ব্যাক রেস্ট্ দেওয়া আরাম কেদারায় বসে আছে শীলা। মাথা ও এলো খোঁপাটার খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে।

অনিরুদ্ধর পদশব্দ পেয়েই উঠে দাঁড়ায় শীলা। এবং দু'জোড়া চোখে চোখাচোখি হল।

বেশ কিছুক্ষণ একটা তারপরই স্তব্ধতা।

দু'জোড়া চোখের দৃষ্টি পরস্পরের প্রতি পরস্পর স্থির নিবদ্ধ কেবল। পলক পড়ে না দু'জোড়া চোখের।

আপনি মানে—তুমি—

অনিরুদ্ধ কথা বলতে গিয়েও বলতে পারে না। উচ্চারিত শব্দটাকে ততক্ষণে থামিয়ে দিয়ে মৃদু শান্ত কণ্ঠে বলে শীলা, নমস্কার, বস—

তুমি—মানে তুমি শীলা!

হ্যাঁ, বলতে পার এক প্রকার মৃত্যুর হাত থেকেই বেঁচে এসেছি—

কিন্তু—

তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বস।

কিন্তু তুমি তো—মানে হ্যাঁ, আপনি তো শীলা নন।

অনিরুদ্ধর স্পষ্ট তীক্ষ্ণ অস্বীকৃতিতেও কিন্তু এতটুকু কোন ভাবান্তরই দেখা গেল না শীলার মুখে। বরং মুহূর্ত পরে নির্মল হাসিতে মুখখানা তার স্নিগ্ধ, আরও সুন্দর হয়ে উঠল।

এবং পূর্ববৎ মৃদু কণ্ঠেই পুনরায় শীলা বললে, চিনতে পারলে না আমাকে?

চিনতে পারছি বৈকি! আপনি শীলা নন।

কি বলছ তুমি অনিরুদ্ধ—

ঠিকই বলছি।

ঠিকই বলছ?

হ্যাঁ, কারণ সত্যিই তুমি শীলা নও!

শীলা নই আমি?

না, আপনি শীলা নন।

আমিই শীলা অনিরুদ্ধ বাবু!

না,—না—না—

বলতে বলতে মুহূর্তকাল আর দাঁড়াল না অনিরুদ্ধ ঘরের মধ্যে, ঝড়ের মতই যেন দরজা ঠেলে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সোজা এসে ঢুকল নিজের ঘরে। তখুনি ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটে মিঃ গুহর অফিসে ফোন করল।

গুহ ওই সময় অফিসেই ছিলেন, ফোন ধরলেন।

মিঃ গুহ, আমি অনিরুদ্ধ ঘোষ, বরাহনগর থেকে কথা বলছি—

কি ব্যাপার মিঃ ঘোষ?

আপনার একটা মস্ত ভুল হয়েছে।

ভুল!

হ্যাঁ, শীলা রায় পরিচয়ে যাকে আপনি এখানে এনে কিছুদিন হল উঠিয়েছেন সে আদপেই আসল শীলা রায় নয়—

কি বলছেন আপনি?

হ্যাঁ—কোন ইম্পসটার—প্রতারক আপনার চোখে ধুলো দিয়েছে।

না,—না—এ আপনি কি বলছেন, ভাল করে সমস্ত পরিচয় নিয়ে দেখে শুনে স্যাটিস্ফাইড হয়েই তবে ওকে আমি—

না, না—ইউ হ্যাভ্ মেড এ মিসটেক—সি ইজ্ নট শীলা রায়। আপনি এখুনি একবার এখানে আসুন—

ফোন পাওয়ার আধঘণ্টার মধ্যেই মিঃ প্রতাপ গুহ তাঁর গাড়িতে চেপে চলে এলেন বরাহনগরে নরহরি ভবনে।

সোজা গিয়ে ঢুকলেন তারপর অনিরুদ্ধর ঘরে।

ঘরটা তাঁর চেনা ছিল ভালই কারণ ইতিপূর্বে অনিরুদ্ধর ওই গৃহে আসা অবধি গত দেড় বৎসরে অন্তত বার পাঁচ সাত তাঁকে ওই স্থানে আসতে হয়েছে।

কনুই থেকে প্রায় নিশ্চল অকর্মণ্য ডান হাতটি অসহায়ের মত বুকের কাছে ভাঁজ হয়ে স্থির হয়ে আছে। দ্বিতীয় হাতটি পরিধেয় প্যান্টের পকেটে প্রবিষ্ট।

অস্থির অশান্ত পায়ে অনিরুদ্ধ ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিল তখন।

মিঃ গুহর পদশব্দে ঘুরে দাঁড়াল অনিরুদ্ধ পায়চারি থামিয়ে, মিঃ গুহ—

হ্যাঁ, কি ব্যাপার, আপনি হঠাৎ—

এ আপনি কি করেছেন মিঃ গুহ, আমার সঙ্গে একটা পরামর্শ না করেই আমার অনুপস্থিতিতে ওই মেয়েটিকে এ বাড়িতে এনে ঢোকালেন কেন?

মিঃ গুহ অনিরুদ্ধর মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, আপনি ঠিক বলছেন, আপনি স্থির নিশ্চিত ওই মহিলাটি সত্যি সত্যিই আমাদের শীলা রায় নন?

আই এ্যাম্ ডেড্ সিওর সি ইজ নট্ শীলা রায়।

কিন্তু আমিও যে সর্বরকম ভাবে পরীক্ষা করে, যাচাই করে, সন্তুষ্ট হয়ে তবে—

না, না—মিঃ গুহ, আপনার ভুল হয়েছে। এটা বুঝতে পারছেন না কেন, আপনি তাকে জীবনে ইতিপূর্বে কখনো দেখেন নি একমাত্র ছবিতে ছাড়া কিন্তু আমি তাকে দেখেছি এবং মাস ছয়েক ঘনিষ্ঠভাবে মেলা মেশাও করেছি—

আপনার কথা যে সত্যি তা আমি অস্বীকার করছি না মিঃ ঘোষ, আপনার সঙ্গে পরিচয় ছিল তাও জানি কিন্তু সেও তো চার পাঁচ বছর আগেকার কথা। এই কয় বৎসরে তার চেহারার পরিবর্তনও তো হতে পারে! মিঃ গুহ পুনরায় বললেন।

হতে পারে স্বীকার করি। কিন্তু তাই বলে যার সঙ্গে এক সময় দীর্ঘ ছয়মাস মেলামেশা করেছি তাকে আজ চিনতে পারব না এও যে হতে পারে না।

কিন্তু কেন আপনার এ কথা মনে হচ্ছে বলুন তো মিঃ ঘোষ। এর চেহারা কি আপনার পূর্ব পরিচিত শীলা রায় থেকে অন্যরকম?

না, চেহারা অবিশ্যি হুবুহু এক। কিন্তু তবু—

তবু কি?

তবু, তবু—কি যেন নেই ওর মধ্যে কোথায় যেন একটা অসামঞ্জস্য, মানে আপনাকে ঠিক আমি বুঝিয়ে বলতে পারছি না মিঃ গুহ, চেহারা হয়তো হুবহু একই, তবু, তবু—আই এ্যাম্ সিওর—এ সেই শীলা রায় নয়।

একটা অস্থিরতা যেন অনিরুদ্ধর কথা ও ব্যবহারে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, বিশ্রী একটা অস্বোয়াস্তিতে যেন অনিরুদ্ধ ছট্‌ফট্ করছে মনে হল মিঃ গুহর।

আর কিছু আপনি ওর অন্যান্য পরিচয় যাচাই করে দেখেছেন? মিঃ গুহ আবার প্রশ্ন করলেন।

না, তা অবিশ্যি করি নি—

কেন করলেন না?

আঃ, আপনাকে আমি বোঝাতে পারছি না। আপনি কেন বুঝতে চাইছেন না, সে সবের কোন প্রয়োজনই বোধ করি নি বলেই—

মিঃ গুহ অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। বেশ চিন্তিত তিনি।

হুঁ! আপনি একথা তাকে বলেছেন? এক সময় আবার মিঃ গুহ প্রশ্ন করলেন।

নিশ্চয়ই, বলেছি বৈকি।

উনি কি বললেন?

কি আবার বলবে, বলবার আছেই বা কি।

কিন্তু—

এর মধ্যে কোন কিন্তুই নেই মিঃ গুহ। সি মাস্ট লিভ দিস হাউস ইমিডিয়েটলি। আর আপনি, হ্যাঁ—আপনি যদি সে ব্যবস্থা না করেন তো, ওয়েল—আমাকে পুলিসে ইনফর্ম করতেই হবে—

মিঃ গুহ এবারে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, বেশ। তবে তাই করুন আমি তার আইডেনটি সম্পর্কে ফুললি স্যাটিস্‌ফাইড্।

বেশ। তবে যা ব্যবস্থা করবার আমিই করছি—

অনিরুদ্ধ কথা শেষ করেই ফোনের দিকে দৃঢ়পদে এগিয়ে গেল পুলিসে সংবাদ দিতে। মিঃ গুহ ঘর থেকে বের হয়ে শীলার ঘরের দিকে চললেন।

বলাই বাহুল্য সেই দিনই দ্বিপ্রহরে থানা অফিসার অমিয় চক্রবর্তী এলেন সরেজমিন ব্যাপারটা তদন্ত করতে। অমিয় চক্রবর্তীও হালে পানি পেলেন না। তিনিও গিয়ে হেড কোয়ার্টারে ব্যাপারটা রিপোর্ট করলেন।

অবশেষে কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটা ভাল করে তদন্ত করবার জন্য পাঠালেন স্পেশাল ব্রাঞ্চের ইনস্পেক্টার শাশ্বত চৌধুরীকে।

শাশ্বত চৌধুরী অবশেষে এলো ব্যাপারটা তদন্ত করতে একদিন।

সলিসিটার মিঃ প্রতাপ গুহ রাজী না হওয়ায় এবং ব্যাপারটা তখনো পুলিসের তদন্ত সাপেক্ষ থাকায় শীলা ওই বাড়িতেই থেকে গেল।

অনিরুদ্ধ নানাভাবে চেষ্টা করেও শীলাকে বাড়ি থেকে বের করতে পারল না। ফলে ব্যাপারটা দাঁড়াল বিচিত্র।

এক বাড়িতে থাকায় মধ্যে মধ্যে দুজনার দেখা সাক্ষাৎও হতে লাগল; অনিরুদ্ধ দেখা হলেই মুখ ফিরিয়ে নেয় কিন্তু শীলা প্রসন্ন হাসিতে ব্যাপারটা উপেক্ষা করে।

এমন কি একদিন শীলা একথাও বলেছে, তুমি আমাকে সন্দেহ করছো কেন বুঝতে পারছি না অনিরুদ্ধ বাবু। তুমি বিশ্বাস কর সত্যিই আমি সেই শীলা! ছদ্মবেশী কোন প্রতারক সত্যিই আমি নই।

রূঢ়কণ্ঠে জবাব দিয়েছে অনিরুদ্ধ, আপনার সঙ্গে কথা বলতেও আমার ঘৃণা হয়। এমন কি আপনার মুখের দিকে তাকাতে পর্যন্ত আমার ঘৃণা হয়। দয়া করে যে কয়দিন আপনি এখানে আছেন আমার সামনে আসবেন না।

ওই ধরণের রূঢ় কথার পরও কিন্তু ব্যাপারটা শীলা প্রসন্ন ভাবেই গ্রহণ করেছে।

॥ ৪ ॥

শাশ্বত প্রথমে অনিরুদ্ধর ঘরেই প্রবেশ করে।

দুজনের মধ্যে শীলা সম্পর্কে নানা কথাবার্তাও হয়। যথাসাধ্য শাশ্বতকে বুঝাবার চেষ্টা করে অনিরুদ্ধ, ওই শীলা আসল শীলা নয়। নরহরির বিরাট সম্পত্তির লোভে কোন ছদ্মবেশী প্রতারক এসে জুটেছে।

মৃদু কণ্ঠে শাশ্বত বলে, সবই বুঝলাম মিঃ ঘোষ। কিন্তু যে সমস্ত প্রমাণ পেশ করেছেন উনি তাতে কারো তো ওধরণের কোন সন্দেহই টেঁকে না। ওঁর মায়ের সব পুরাতন চিঠিপত্র, নরহরি বাবুর যে বন্ধু শীলাকে সাহায্য করতেন তাঁর চিঠি, ওর চেহারার অবিকল মিল, ম্যাট্রিক ও ইণ্টারমিডিয়েটের সার্টিফিকেট, ট্রেনের সেদিনকার টিকিট এ সবকিছুই আপনারই মত তাহলে উনি যোগাড় করলেন কি করে?

ওসব যোগাড় করা কি এতই কঠিন! নিশ্চয়ই ওই মেয়েটির পিছনে কোন বড় একদল চক্রান্তকারী আছে যারা সে রাত্রে ট্রেনে পূর্ব হতেই ব্যাপারটা জেনে আসল শীলাকে অনুসরণ করেছিল, তারপর ট্রেন এ্যাকসিডেণ্টের সুযোগে—

শাশ্বত চৌধুরী চেয়ে থাকে অনিরুদ্ধর মুখের দিকে।

অনিরুদ্ধ তখনো উৎসাহের সঙ্গে বলে চলেছে, এ ধরণের প্রতারণার ব্যাপার যে ইতিপূর্বে কখনো ঘটে নি তাও তো নয়—

ঘটে নি যে তা অবিশ্যি আমি বলছি না, তবে—

তবে? তবে আপনাদের বিশ্বাস করতেই বা বাধাটা কোথায়?

তবু বাধা আছে বৈকি মিঃ ঘোষ। এ কথাটা তো ভুললে চলবে না উনি একজন নারী—একজন নারীর পক্ষে এ ধরণের রিস্ক নেওয়া—

ভুলবেন না মিঃ চৌধুরী, এ জগতে এমন মেয়েমানুষও আছে যারা স্বার্থের লোভে এর চাইতেও জঘন্য কাজে নামতে পারে।

কিন্তু আপনারও তো আপনাদের পরস্পরের মধ্যে প্রায় চার বৎসর পূর্বেকার ছয় মাসের পরিচয়ের যুক্তিটি ছাড়া ওকে অস্বীকার করবার অন্য রকম যুক্তিই আর নেই!

কিন্তু সেইটে কি যথেষ্ট নয়?

না, নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু আপনারও কি উচিৎ ছিল না তাকে আরো

নানাভাবে পরীক্ষা করে, যাচাই করে দেখা। সে সব কিছু আজ পর্যন্ত আপনি করেছেন কি?

কি বলতে চান আপনি মিঃ চৌধুরী?

আপনাদের এক সময় দীর্ঘ ছয়মাস ধরে পরিচয় ছিল পরস্পরের মধ্যে এটা তো আপনিই বলেছেন।

নিশ্চয়ই।

সেই ছয়মাস সময় হয়তো এমন কত কথা আপনাদের মধ্যে হয়েছে, এমন হয়তো কত ঘটনা ঘটেছে সে সব দিয়েও তো ইতিমধ্যে ওকে আপনি পরীক্ষা করে দেখতে পারতেন—

না, তা অবিশ্যি করি নি আমি। তবে এটা ঠিক যে সে শীলা ও নয়—

মিঃ ঘোষ, কেবলমাত্র আপনার ওই যুক্তিতেই আপনি শীলা দেবীকে এ গৃহ হতে বিতাড়িত করতে পারবেন না। আইনের সামনে যে সমস্ত প্রমাণ উনি মানে শীলা দেবী উপস্থাপিত করেছেন তার জোরেই তিনি এখানে থাকবার অধিকার তো পাবেনই। আপনিই বরং মৃত নরহরি বাবুর উইল অনুযায়ী ওকে বিবাহ না করা পর্যন্ত তাঁর সম্পত্তির এক কপর্দকও পাবেন না!

শাশ্বতর শেষের কথায় অনিরুদ্ধ সহসা চিৎকার করে ওঠে. গায়ের জোর নাকি?

গায়ের জোর নয়, আইন তাই বলবে, আমরাও তাই বলব।

তার মানে আইন অন্যায় ভাবে জুলুম করবে—

অন্যায় তো আপনি বলছেন, আইন তো তা বলছে না।

উঃ, অসহ্য এ জবরদস্তি আপনাদের।

শাশ্বত প্রত্যুত্তরে মৃদু হাসে মাত্র।

কিন্তু আমিও বলে রাখছি মিঃ চৌধুরী, ওকে এখান থেকে যেতে হবেই।

এবারেও শাশ্বত প্রত্যুত্তরে নিঃশব্দে মৃদু হাসল।

শাশ্বত অতঃপর অনিরুদ্ধর ঘর থেকে বের হয়ে শীলা রায়ের কক্ষে এসে প্রবেশ করল।

শীলা তার নির্দিষ্ট ঘরের মধ্যে আরাম কেদারাটার উপর বসে একটা টেবিল ক্লথে রঙিন সুতোর সাহায্যে গভীর মনোযোগ সহকারে ফুল তুলছিল।

নমস্কার, ভিতরে আসতে পারি মিস রয়—

কে! আসুন—। বলতে বলতে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায় শীলা।

শাশ্বত বললে, স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে আসছি, আমার নাম শাশ্বত চৌধুরী।

ও! নমস্কার, বসুন—

॥ ৫ ॥

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখছিল শাশ্বত মেয়েটিকে।

রোগা ছিপছিপে গড়ন। উজ্জ্বল শ্যাম গাত্রবর্ণ। কিছুটা লম্বাটে হলেও মুখের ডৌলটি সত্যিই ভারি চমৎকার। ছোট কপাল, ঈষৎ টানা ধনুকের মত বাঁকানো ভ্রূ। দীঘল নাসা।

সব কিছু মিলিয়ে সমস্ত মুখখানিতে যেন একটি আশ্চর্য কমনীয়তা মেয়েটির। শান্ত, স্নিগ্ধ—নিষ্পাপ, সরল মাধুর্য।

পরিধানে সাধারণ একটি সাদা ব্লাউজ ও অনুরূপ একটি সরু কালা পাড় মিলের পরিচ্ছন্ন শাড়ী। হাতে একগাছি করে মাত্র সরু সোনার বেঁকী রুলি। গলায় একটি সরু মপ্‌চেন। আর দেহের কোথাও অলঙ্কারের এতটুকু বাহুল্যও নেই।

বসুন—আবার শীলা রায় অনুরোধ জানাল শাশ্বত চৌধুরীকে।

সামনেই একটা খালি চেয়ার ছিল। শীলা রায়ের অনুরোধে শাশ্বত সেই চেয়ারটাতেই উপবেশন করে।

শাশ্বত কোনরূপ ভণিতা না করেই সোজাসুজিই কথা শুরু করে, এক সময়ে দিল্লীতে আপনার ও অনিরুদ্ধবাবুর সঙ্গে তো পরিচয় হয়েছিল মিস রয়, তাই না।

মৃদু হেসে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল শীলা রায়।

বেশ ঘনিষ্ঠতাই তো হয়েছিল সে সময় আপনাদের পরস্পরের সঙ্গে, তাই তো?

এবারও নিঃশব্দে মৃদু হেসে সম্মতি জ্ঞাপন করল শীলা।

উনি তো আপনাকে অস্বীকার করছেন, কিন্তু ওঁর সম্পর্কে আপনার মত কি?

এতক্ষণে মৃদুকণ্ঠে শীলা কথা বললে, আমাকে যে কেন উনি চিনতে পারছেন না বুঝতে পারছি না।

আপনি তাহলে ওকে ঠিক চিনতে পেরেছেন?

তা পেরেছি বইকি।

আপনার কোন দ্বিধাই নেই ওর সম্পর্কে?

কেন থাকবে বলুন তো?

প্রথম সেদিনকার সেই সাক্ষাতের পর আপনাদের পরস্পরের সঙ্গে আর কোন কথাবার্তাই হয় নি, তাই না?

উনি তো দেখলেই মুখ ঘুরিয়ে নেন, তা কথাবার্তা হবে কি?

আচ্ছা, একটা কথা মিস রয়?

বলুন।

ট্রেন এ্যাকসিডেণ্টের পর মাথায় আঘাত লেগে আপনার স্মৃতিভ্রংশ হয়েছিল শুনেছি, তাই তো?

হ্যাঁ।

পূর্বস্মৃতি যখন আপনি ফিরে পেলেন সব অতীতের কথাই কি সঙ্গে সঙ্গে আপনার স্পষ্ট মনে পড়েছিল?

সঙ্গে সঙ্গে না হলেও একটু একটু করে সব কথাই মনে পড়েছিল বইকি ক্রমশঃ।

এখন বোধ হয় সবই স্পষ্টভাবে মনের মধ্যে আবার সমস্ত অতীতটাই আপনার ফিরে এসেছে?

তা এসেছে।

আপনার অতীত জীবনের কতকগুলো কথা আমি স্পষ্টাপষ্টিভাবে জিজ্ঞাসা করতে চাই—মানে বুঝতেই পারছেন আপনার একান্ত ব্যক্তিগত কথা।

করুন, সাধ্যমত আমি জবাব দেবার চেষ্টা করব। তারপরই মৃদু হেসে শীলা বলল, বুঝতে পারছি অবিশ্যি কি কথা আপনি জিজ্ঞাসা করতে চান।

বুঝতে পেরেছেন?

তা পেরেছি বইকি!

কি বলুন তো? অনিরুদ্ধবাবুর কথা তো?

এতটুকু সংকোচ বা বিকারমাত্রও ছিল না বুঝি ওই সময় শীলার কণ্ঠস্বরে। ওই মুহূর্তে শাশ্বতর মনে হয়, মেয়েটির আগাগোড়া যদি সত্যি সত্যিই সব

কিছুই প্রতারণা হয়ে থাকে তো বলতে হবে, মেয়েটি শুধু চালাক চতুরই নয়, অসাধারণ নার্ভও আছে মেয়েটির।

এবং বুদ্ধিমতী তো বটেই। আর তাই বোধহয় কিছুক্ষণ প্রশংসার দৃষ্টিতে শীলার মুখের দিকে না চেয়ে থেকে পারে না শাশ্বত।

তারপর এক সময় মৃদু কণ্ঠে পুনরায় প্রশ্ন শুরু করে, কিন্তু বুঝলেন কি করে যে আমি ওই কথাই জিজ্ঞাসা করব? প্রশ্নটা করে মৃদু হাসল শাশ্বত।

আপনিই বলুন, ওই কথাটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক নয় কি? কিন্তু—

কিন্তু কী?

ঘটনাচক্রে আমাদের দুজনার মধ্যে এক সময় পরিচয় হয়েছিল মিঃ চৌধুরী সত্যিই এবং সে পরিচয়ের মধ্যে সেদিন কিছুটা যে ঘনিষ্ঠতাও গড়ে ওঠে নি তাও আমি অস্বীকার করব না। তবু—

বলতে বলতে যেন শীলা সহসা থেমে যায়।

থামলেন কেন, বলুন।

বলছিলাম প্রীতির সঙ্গে ভালবাসার যেন ভুল করবেন না।

কিন্তু—

হ্যাঁ, তাই—ঘনিষ্ঠতাই সেদিন প্রীতি পর্যন্তই পৌঁছেছিল ভালবাসা পর্যন্ত গড়ায় নি হয়তো।

শীলার ঐভাবে স্পষ্ট করে বলবার পর ঠিক কি ভাবে কোন কথাটি বলবে শাশ্বত যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি কয়েকটা মুহূর্ত, তাই কিছুটা সময় অতঃপর বুঝি সে চুপ করেই ছিল।

কিন্তু তারপরই সে আবার প্রশ্ন করল, আচ্ছা মিস রয়, নরহরিবাবুর উইলের সারমর্মটা নিশ্চয়ই আশা করি আপনি জানেন?

জানি। উইলের সব কথা লিখেই তো মিঃ গুহ আমাকে কলকাতায় আসবার জন্য লিখেছিলেন।

তার মানে? ও। তাহলে আপনি অনিরুদ্ধবাবুকে বিবাহ করতে রাজি আছেন?

মুহূর্তকাল। আবার যেন শাশ্বত শীলার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তার পর মৃদুকণ্ঠে বললে, কথাটা আমার না বুঝবার মত তো কিছু নেই মিস্ রয়।

না না, তা নয়! বলছিলাম আপনি ঠিক কি জানতে চান আপনার ওই প্রশ্নের দ্বারা আর একটু স্পষ্ট করে যদি বলেন—

বলছিলাম অনিরুদ্ধবাবুকে বিবাহ করতে রাজি ছিলেন বলেই তো আপনি সে রাত্রে কলকাতা অভিমুখে রওনা হয়েছিলেন ?

ঠিক তাই না বটে আবার কিছুটা তাই বইকি।

কি রকম ?

দেখুন মিঃ চৌধুরী, আমার কথাটা হয়তো আপনি পুরোপুরি বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু—

বলুন, থামলেন কেন ?

নরহরিবাবুর সঙ্গে আমার কোনদিন কোন সূত্রেই আলাপ পরিচয় ছিল না, এমন কি মিঃ গুহর চিঠিতে সব কথা জানবার পূর্বে ওই নামটাও কখনো আমি শুনি নি—বা শুনেছি বলেও আমার মনে পড়ে না।

আপনার মার মুখেও না ?

না। তাই মিঃ গুহর চিঠিতে সম্পূর্ণ অপরিচিত কোন একজন মানুষের হঠাৎ ওই ধরণের একটা বিচিত্র উইলের ও সেই উইলের ততোধিক বিচিত্র শর্তের কথাটা জেনে সত্যি কথা বলতে কি বিস্ময়ের চাইতে যেন একটু কৌতূহলই বোধ করছিলাম প্রথমটায়।

কৌতূহল ?

তাই। কারণ ওই ধরণের ব্যাপার গল্পে উপন্যাসেই সম্ভব নয় কি !

কেন ?

নয় কেন বলুন। কারণ পরে মিঃ গুহর মুখে যা শুনেছি অর্থাৎ আমার মাকে একদা কোন এক ধনী ব্যক্তি—নরহরি সরকার নাকি ভালবেসেছিলেন প্রথম যৌবনে। তা ভালবাসুন এবং সে ভালবাসার জন্য চির কৌমার্যও নাকি গ্রহণ করেছিলেন, ধরুন না হয় তা খুব একটা অসম্ভব ব্যাপার কিছু নয়। কারণ ওই ধরণের সিনিক মানুষ মাঝে মাঝে যে একেবারে দেখা যায় না তা নয়, কিন্তু—

সিনিক আপনি বলছেন কেন ?

তা ছাড়া আর কি বলব বলুন ? কোন একটি নারীকে পেলাম না বলে সারাটা জীবন বিয়েই করব না এর যাই যুক্তি থাক না কেন, আমার কাছে সেটা কিন্তু একটু দুর্বোধ্যই। যাক গে—সে তার ব্যাপার। কিন্তু তারপর সেই তারই মেয়েকে বিচিত্র এক বিবাহবন্ধনের স্বীকৃতির মধ্যে দিয়ে নিজের যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী করে যাওয়া ব্যাপারটা এ যুগে বিশেষ করে একটা নাটক ছাড়া আর কি বলা যায় বলুন ! তাই কতকটা

কৌতূহলবশবর্তী হয়েই সেদিন চিঠি পেয়েই কলকাতার উদ্দেশে রওনা হয়েছিলাম।

শুধু কি তাই?

সবটাই তাই বললে আপনিই বা বিশ্বাস করবেন কেন আর দুনিয়াটাই বা বিশ্বাস করবে কেন? বলতে বলতে হেসে ফেলে শীলা রায়, হ্যাঁ, সম্পত্তি প্রাপ্তির লোভটাও ছিল বইকি। এতবড় বিপুল বিরাট সম্পত্তি—এতবড় একটা অনায়াসলব্ধ প্রাপ্তি আমার মত সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের একটি মেয়ে কেমন করেই বা অস্বীকার করতে পারে বলুন! তবে এটা নিশ্চয়ই হলফ করে বলতে পারি, বিয়ের কথাটা তেমন ভাবি নি—

একটুও ভাবেন নি?

হ্যাঁ, ভেবেছিলাম বৈকি, যদি তেমন মনোমত হয় তবে ক্ষতিই বা কী!

তারপর এখানে এসে ওর সঙ্গে যখন দেখা হল?

তার পর থেকেই তো এ যুদ্ধ শুরু। মজা মন্দ নয়, উনিও জানেন আমাকে উনি বিয়ে না করলে এ সম্পত্তি পাবেন না, আমিও জানি ওকে বিয়ে না করলে কিছুই পাব না। অথচ দেখুন বিয়ে না করলে ক্ষতিটা হচ্ছে ওরই বেশী।

কেন?

নয়? উইলে যাই থাক, সত্যি বলতে গেলে তো উনিই ন্যায্যত অধিকারীই এ সবকিছুর—আমি তো এখানে কেউ নই—। তাই বলছিলাম ক্ষতি হলে ওরই, আমার আর কি।

তা আপনার এখন ইচ্ছাটা কী?

বিয়ে আমি ওকে কোন দিনই করব না ঠিকই—

সে কি?

হ্যাঁ, তবে ওর অন্যায় মিথ্যে জুলুমও মাথা পেতে স্বীকার করে নিয়ে এখান থেকে চলে যে যাব না এও নিশ্চিত।

অগত্যা ব্যাপারটা সত্যি সত্যিই শেষ পর্যন্ত ঘোরালো হয়ে দাঁড়াল।

অনিরুদ্ধ ঘোষও স্বীকার করে নেবে না 'ওই শীলা রায়ই আসল শীলা রায়।

শীলা রায়ও সে কথা মেনে নেবে না। আর মেনে নেবেই বা কেন? যত প্রকার প্রমাণ সম্ভব সব প্রমাণ সহই সে তার পরিচয়কে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অতএব সেই বা যাবে কেন?

॥ ৬ ॥

সবই তো বুঝলাম শাশ্বত, কিরীটী বলে, তা আমি তোমাকে এক্ষেত্রে কিভাবে সাহায্য করতে পারি ?

ব্যাপারটা তো বার দুই তোমাকে সব আমি বলেছি; আসল ব্যাপারটা কি তোমার মনে হয় কিরীটী সর্বাগ্রে সেইটুকুই তোমার কাছ থেকে আমি জানতে চাই।

সেদিন তো তোমাকে আমি বললাম, এর মধ্যে কোন তৃতীয় নারীর কোন অস্তিত্ব আছে কিনা সর্বাগ্রে খোঁজ করে দেখ—। যদি থাকে তুমি নিশ্চয়ই হয়তো তোমার পথ খুঁজে পাবে।

তুমি আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছ কিরীটী।

কিরীটী মৃদু হেসে বলে, এড়িয়ে ঠিক যাচ্ছি তা নয় শাশ্বত।

তবে ?

বরং নাটক যেমন জমে উঠেছে তাতে কিছুটা বেশ কৌতূহলই বোধ করছি, কিন্তু—

তবে আর কিন্তু নয়, তুমি একটু সাহায্য কর আমাকে।

বেসরকারী ভাবে না সরকারী ভাবে ? মৃদু হেসে কিরীটী পাল্টা প্রশ্ন করে।

যেমন তোমার অভিরুচি।

বেশ। তবে সেই কথাই রইল। দুটো দিন আমাকে একটু ভাববার সময় দাও। কারণ ব্যাপারটা একটা কৌতুকপূর্ণ নাটকে পরিণত হলেও আসলে ওদের মধ্যে দুজনের একজন যে প্রতারক সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ—

সত্যিই তাই তোমার ধারণা ?

তাই।

কিন্তু তা যদি হয়ই তাহলে আমি বলব—

দুজনেই মূর্খ। এই তো ?

হ্যাঁ, কারণ তোমার কথাই যদি সত্যি হত কিরীটী, সত্যিই ওরা বোকা। বেশ তো, ওরা দুজনে পরস্পর যদি পরস্পরকে সত্যিই না চায়, বিয়ে করে উইলের শর্তানুযায়ী সম্পত্তিটা বাগিয়ে নিয়ে একটা ভাগ বাঁটোয়ারা করে অনায়াসেই তো যে যার পথ দেখতে পারত। অন্তত আমি হলে তো তাই

করতাম। নরহরির সুবিপুল সম্পত্তির সামান্য অংশও তো কম হবে না নেহাৎ। অথচ এইভাবে পরস্পর ওরা রুখে দাঁড়ালে কারো ভাগ্যেই হয়তো শেষ পর্যন্ত কিছু জুটবে না।

কথাটা তুমি নেহাৎ মিথ্যে বা অযৌক্তিক কিছু বলো নি শাশ্বত কিন্তু তাঁর মধ্যেও একটা কিন্তু আছে—

কিন্তুটা আবার কি?

কিন্তুটা হচ্ছে তুমি যে ওই সুবিপুল সম্পত্তির কথা বললে সেটাই। কি জান ভাই লোভ বড় বিচিত্র বস্তু। ও যখন কাউকে গ্রাস করে জেনো পূর্ণ গ্রাসই করে সেই রাহুর মত। যাক, ইতিমধ্যে তোমাকে যা বললাম, একটু খোঁজ করে দেখ, ওই নাটকের মধ্যে তৃতীয় কোন নারী আছে কিনা।

বেশ। তাই হবে।

সেদিনকার মত শাশ্বত বিদায় নিল।

আরও দুটো দিন কিরীটী শীলা আর অনিরুদ্ধর ব্যাপারটা ভাবে।

ব্যাপারটা রহস্যপূর্ণ যতই হোক, রীতিমত যে কৌতুকপূর্ণ সে বিষয়ে অন্তত কোন সন্দেহ নেই।

অনিরুদ্ধর কথা শুনে যাই মনে হোক না কেন মেয়েটি—অর্থাৎ ওই শীলা রায় যে রীতিমত বুদ্ধিমতী সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

তাই ঠিক কি ভাবে, কোন পথে অগ্রসর হলে ওই রহস্যের মীমাংসায় পৌঁছতে পারবে কিরীটী ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারে না।

এবং তৃতীয় দিনে যখন পুনরায় শাশ্বত ওর ওখানে এল কিরীটী তার একটা ভবিষ্যতের কার্যসূচী মনে মনে ছকে ফেলেছে।

সোফার 'পরে বসতে বসতে শাশ্বত বললে, না কিরীটী, তোমার নির্দেশ মত এ দুদিন নানাভাবে চেষ্টা করেছি জানবার, কিন্তু—

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, কিন্তু কোন তৃতীয় নারীর কোন সন্ধান করতে পারলে না এই তো?

হ্যাঁ, আগে আগে নাকি অনিরুদ্ধ প্রায়ই বিকেলের দিকে বের হয়ে ফিরত রাত দশটা সাড়ে দশটায় কিন্তু ইদানীং শীলা রায় আসা অবধি ওই বাড়িতে ও নাকি একদিনও বাড়ি থেকে বের হয় নি।

বল কি?

তাই।

কেউ দেখা করতেও আসে না?

না।

তাহলে তুমি বলতে চাও শাশ্বত, গত তার এই দেড় বৎসর সময় কলকাতায় অবস্থানের মধ্যে তার কারও সঙ্গেই বড় একটা আলাপ পরিচয় বা হৃদ্যতা হয় নি?

সেই রকমই তো শোনা যাচ্ছে।

কিন্তু কথাটা তো বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না শাশ্বত। স্বাভাবিকও নয় ওর পক্ষে।

বাঃ, এর মধ্যে অবিশ্বাসেরই বা কি থাকতে পারে। আর অস্বাভাবিকই বা হতে যাবে কেন?

তা হচ্ছে বৎকি।

কি রকম?

প্রথমতঃ ভদ্রলোক বয়সে তরুণ, অবিবাহিত, এত বড় সম্পত্তির ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী, আর—

আর—

যে লোক মাত্র ছয় মাসের জন্য কার্যোপলক্ষ্যে দিল্লীতে গিয়ে কোন এক শীলা রায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়ে উঠতে পারে তার এই দেড় বৎসর সময়েও কলকাতায় এসে কারও সঙ্গে পরিচয় হয় নি কথাটা কি অবিশ্বাস্য ও অস্বাভাবিকই নয়? তা ছাড়া একটু আগেই তো তুমি বললে যে শীলা রায় ওখানে আসবার আগে প্রত্যহই প্রায় বিকালের দিকে বের হয়ে গিয়ে ফিরত সেই রাত দশটা সাড়ে দশটায়। কোথায় যেত সে! চার-পাঁচ ঘণ্টা সময় নিশ্চয়ই সে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত না বা তার মত অত বস্তুতান্ত্রিক লোক গঙ্গার ধারে বা গড়ের মাঠে গিয়ে বসে ঘণ্টা চার-পাঁচ ধরে প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করে আত্মসমাহিত থাকত না।

শাশ্বত কিরীটীর কথায় না হেসে পারে না। এবং হাসতে হাসতেই বলে, না, কথাটা তোমার উড়িয়ে দেবার মত নয়। যুক্তি আছে অবশ্যই।

সেই যুক্তি আর বিচারই যে তোমার বর্তমান রহস্য উদ্‌ঘাটনের একমাত্র সম্বল। কিন্তু যাক সে কথা, আমি ভেবেছি ওখানে মানে নরহরি ভবনে গিয়ে কিছুকাল থাকব।

থাকবে?

হ্যাঁ, কারণ পাশাপাশি থেকে কিছুদিন সর্বদা একটা বোঝাপড়া করতে চাই।

বেশ তো তাহ'লে শুভস্য শীঘ্রং। চল—কখন যাবে বল কালই এসে নিয়ে যাব।

সকালের দিকে এস। কিন্তু একটা কথা আছে—

বল।

আমার সত্যিকারের পরিচয়টা সেখানে তুমি দিতে পারবে না।

তবে কি পরিচয় দেবে?

তোমাদের বড় কর্তার সঙ্গে আমার ফোনে কথাবার্তা হয়ে গিয়েছে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, আমি যাব সেখানে সরকারের পক্ষ থেকেই তাদের নিযুক্ত প্রতিনিধি হিসাবে, ওই মানে কিছুদিন থেকে ব্যাপারটা মানে উভয়কে যথাসম্ভব স্টাডি করে বুঝবার জন্য।

সে তো খুব ভাল কথা। তাহলে তো কথাটা আমার পূর্বাহ্ণেই অনিরুদ্ধ বাবুকে জানান প্রয়োজন।

হ্যাঁ, সেটা আজই না হয় জানিয়ে দিও।

বেশ। তাই হবে।

বলা বাহুল্য সেই পরিকল্পনা মতই পরের দিন সকাল আটটা নাগাদ একটা সুটকেশে প্রয়োজনীয় জামা কাপড় ও নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র নিয়ে গিয়ে হাজির হল কিরীটী শাশ্বতের সঙ্গে বরাহনগরে নরহরির গৃহে।

আগের দিনে টেলিফোনে শাশ্বতের নির্দেশ অনুযায়ী অনিরুদ্ধ সব ব্যবস্থাই করে রেখেছিল কিরীটীর থাকবার এবং ভৃত্য রামচরণকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল ওরা এলে ওদের ব্যবস্থা করে দিতে।

রামচরণ বোধ হয় ওই গাড়ির সাড়া পেয়েই এগিয়ে এল।

কিরীটী ওখানে আসবার পূর্বে ইচ্ছা করেই নামের সঙ্গে নিজের চেহারাটারও কিছু অদল বদল করে এসেছিল।

পরিধানে পাজামা ও পাঞ্জাবী, মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। চোখে কালো কাচের চশমা।

নাম নিয়েছিল ধূর্জটি সিনহা।

কলকাতাবাসী বাঙালী নয় সে। ইউ, পির লোক। তবে দীর্ঘকাল

প্রায় বলতে গেলে শৈশব হতেই কলকাতায় থেবেছে ও মানুষ হয়েছে বলে বাঙলা ভাষাটা বেশ ভাল করেই রপ্ত করে নিয়েছে।

শাশ্বত রামচরণের পূর্ব পরিচিত, অতএব শাশ্বতকেই প্রশ্ন করে রামচরণ, ইনিই কি সিনহা সাহেব? -

হ্যাঁ, তোমার বাবু কোথায় অনিরুদ্ধবাবু?

বাবু লাইব্রেরী ঘরে আছেন। চলুন, আপনাকে ঘরটা আমি দেখিয়ে দিই—

চল—এসো হে সিনহা।

সুটকেশটা হাতে আগে আগে রামচরণ এগিয়ে চলে, পশ্চাতে অগ্রসর হয় ওরা দুজনে।

কিরীটী চশমার কালো কাচেব আড়াল থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল।

কলকাতা শহরের প্রথম আমলের ধনীর গৃহ।

যে সময় নব্য কালচার ক্রমশঃ শহরে এসে জাঁকিয়ে বসলেও মধ্যযুগের নবাবী কালচারও ও ঠাকঠকম একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি তখনও।

যাকে বলে বিরাট চক মিলান বাড়ি, তাই।

বড় বড় প্রকাণ্ড টানা বারান্দা, মোটা মোটা সে যুগের পাথরের কাজ করা থাম। ছাদের উচ্চতা প্রায় তের চৌদ্দ ফিট হবে।

বিরাট প্রাসাদোপম অট্টালিকা, যত্ন ও পর্যবেক্ষণের অভাবে কার্নিশের কোলে কোলে পায়রার নীড় ও তাদের ক্রমবংশবৃদ্ধি দৌরাত্ম্যে কালী, ঝুল ও চামচিকায় কেমন যেন মলিন, শ্রীহীন হয়ে পড়েছে।

বিরাট দুটি মহাল—বহির্মহাল ও অন্দরমহাল।

বড় বড় সব ঘরে, বিরাট বিরাট সব ভারী মেহগনী পালিশ করা সেগুন কাঠের দরজা। দরজাগুলো প্রায়ই বন্ধ, বড় বড় তালা ঝুলছে।

সংস্কারের অভাবে বহুস্থানে দেওয়ালেব চুণ বালী খসে খসে পড়ছে, ফাটল ধরেছে, মেঝের সানেও দীর্ঘ আঁকাবাঁকা সব ফাটল সর্পিল লালসায় যেন সময় তার চিহ্ন এঁকে দিয়েছে।

এখানে ওখানে ধুলো আর আবর্জনা।

কেমন যেন একটা ধূলোর, পুরাতন বাড়িব গন্ধ বাতাসে।

প্রশস্ত মারবেল পাথরের সিঁড়ি, শাদায় কালোয় যেন মনে হয় কার্পেট বিছান।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে কিরীটী শাশ্বতের সঙ্গে দ্বিতলে উঠে এল।

অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটা শাদা কালো মারবেল বাঁধান বারান্দা উত্তর থেকে দক্ষিণমুখী হয়ে চলে গিয়েছে পশ্চিমপ্রান্তে।

মনে হয় যেন একটা শাদা কালো দাবার ছক কেউ পেতে রেখেছে।

সেই বারান্দার গায়ে পর পর সব ঘর।

মধ্যে মধ্যে দেওয়ালে টাংগানো চওড়া কারুকার্যমণ্ডিত সোনালী ফ্রেমে বাঁধান বিলাতী ছবি।

রাজা রাজড়া থেকে শুরু করে স্নানরত উলঙ্গ মেম সাহেব, ঘোড়া, বিলাতী কুকুর, পুরাতন ফ্যাসনের সব ছবি। এক সময় ওই সব ছবির প্রচুর কদর ছিল কলকাতা শহরের ধনীদের গৃহে। শহরে বিলাতী সভ্যতা ও কালচারের অন্যতম নিদর্শন ছিল ওইগুলো।

আগে আগে রামচরণ ও তার পশ্চাতে শাশ্বত ও কিরীটী চলেছিল। অবশেষে একটা ঘরের খোলা দরজার সামনে এসে সকলে দাঁড়াল।

বাবু, এই ঘর আপনার জন্য ঠিক হয়েছে—রামচরণ বললে।

ওরা এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

বেশ প্রশস্ত আকারের ঘরখানি। ঘরের মধ্যে আসবাবও রয়েছে। বিরাট একটি পালঙ্কে শয্যা বিস্তৃত।

একধারে বড় একটি সেকেলে কাজ করা ভারী আলমারী। তারই একটি পাল্লায় প্রমাণ সাইজের আর্শী বসানো।

খান দুই চেয়ার, একটি টেবিল, একটি আলনা।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে প্রথমেই কিরীটী রামচরণকে নির্দেশ দিল ঘরের জানালাগুলো সব খুলে দিতে।

গরাদহীন বড় বড় জানালা। প্রত্যেকটি জানালায় দুই জোড়া করে পাল্লা। একটি রঙিন কাচের পাল্লা ও অন্যটি ঝিলমিলি পাল্লা।

পশ্চিমদিকের জানালা খুলতেই কিরীটীর নজর পড়ল, পশ্চাৎ ভাগের বাগান ও তারপরেই দূরে ওই গঙ্গা।

ঘরের জানালা-পথেই স্পষ্ট গঙ্গা চোখে পড়ে।

কিরীটি বেশ খুশিই হয়।

বাথরুম ও স্নানের ঘর কোথায় রামচরণ? কিরীটী প্রশ্ন করে।

এই ঘরের দুখানা ঘর পরেই বাথরুম স্নানের ঘর বাবু।

তাহলে একবার তোমার দিদিমণি আর অনিরুদ্ধবাবুকে সংবাদ দাও রামচরণ। ওর সঙ্গে তোমার দিদিমণি আর বাবুর আলাপ করিয়ে দিয়ে যাই। কথাটা বললে শাশ্বত।

আজ্ঞে, এখনি আমি খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি গিয়ে।

রামচরণ চলে গেল।

কেমন লাগছে জায়গাটা কিরীটি?

বেশ নিরিবিলি। শহরের গোলমাল নেই, কটা দিন মন্দ কাটবে না। তবে বাড়ি দেখেই বোঝা যায় নরহরির স্বর্গত পিতৃদেব রামহরি সরকার সত্যিকারের একজন ধনীই ছিলেন।

নিশ্চয়ই, যাকে বলে সত্যিকারের লক্ষপতি।

॥ ৭ ॥

মিনিট দশেকের মধ্যেই বাইরের বারান্দায় চপ্পলের শব্দ শোনা গেল। বোঝা গেল অনিরুদ্ধ আসছে।

অনিরুদ্ধই। সুশ্রী পুরুষ অনিরুদ্ধ। বলিষ্ঠ দেহের গঠন।

কিন্তু ডান হাতটি বিকল ও অকর্মণ্য হওয়ায় কনুই থেকে ভাঁজ হয়ে, দেহ সংলগ্ন থাকায়, সেই একটি মাত্র ত্রুটিতেই যেন প্রথম দর্শনেই মনে হয় অনিরুদ্ধ বুঝি অমন সুশ্রী বলিষ্ঠ দেহী হওয়া সত্ত্বেও কুৎসিত।

বিকলাঙ্গর এমনি অভিশাপ।

প্রথম শীতের মিষ্টি একটা ঠাণ্ডা পড়েছে। পরিধানে ধুতির সঙ্গে ভায়লার পাঞ্জাবী ও তদুপরি পাতলা কমলালেবু রঙের একটা শাল গায়।

পায়ে দামী রবার প্যাড্ দেওয়া চপ্পল।

প্রথম দৃষ্টিতেই কিরীটীর অনিরুদ্ধকে মনে হয় বিলাসের সঙ্গে একটা পরিচ্ছন্ন রুচির সংমিশ্রণও আছে লোকটার চরিত্রে।

মৃদু হেসে অনিরুদ্ধ ওদের অভ্যর্থনা জানাল।

মৃদু হাসির সঙ্গে সঙ্গে ঝক্‌ঝকে যেন মুক্তপংক্তির মত দু সারি দাঁত মুহূর্তের জন্য ঝিলিক দিয়েই মিলিয়ে গেল।

কিরীটীর মনে হল সঙ্গে সঙ্গে লোকটির মুখখানিই শুধু সুশ্রী নয় হাসিটিও সুন্দর।

সুন্দর মুখ হলেই সুন্দর হাসি ফোটে না। এমন অনেক মুখ আছে সুশ্রী আদপেই নয় অথচ সুন্দর হাসিটুকুর জন্যই যেন মুখখানা সুন্দর হয়ে ওঠে।

শাশ্বতই পরিচয় করিয়ে দিল, ইনিই ধূর্জটি সিনহা।

নমস্কার।

পূর্ববৎ মৃদু হেসে অনিরুদ্ধ নমস্কার জানাল।

বসুন মিঃ ঘোষ। কিরীটী এবারে বললে অনিরুদ্ধকে।

আমাকে এখানে কিজন্য পাঠান হয়েছে, কিরীটী বলতে লাগল, আপনি হয়ত গতকালই মিঃ চৌধুরীর মারফৎ শুনেছেন।

হ্যাঁ, উনি আমাকে সব কথাই ফোনে বলেছেন। কিন্তু এসবের প্রয়োজনই বা ছিল কি তাই এখনও বুঝে উঠতে পারছি না। অত্যন্ত সহজ, সরল একটা ব্যাপারকে এভাবে যে কেন ওরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘোরালো করে তুলছেন—

বলতে বলতে অনিরুদ্ধ অদূরে উপবিষ্ট শাশ্বতর দিকে তাকাল। শেষের দিকে তার কণ্ঠস্বরে একটা বিরক্তির ভাব যেন বেশ স্পষ্টই হয়ে ওঠে।

তা যদি বলেন তো জোরালো ব্যাপারটাকে তো আপনিই করে তুলেছেন অনিরুদ্ধ বাবু! সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় মৃদু হাস্যতরল কণ্ঠে কিরীটী কথাটা বলে ওঠে।

আমি! যেন একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই তাকায় সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অনিরুদ্ধ কিরীটীর মুখের দিকে।

তাই নয় কি! আপনিই তো ব্যাপারটার মধ্যে গোলমাল আছে বলে ওদের—অর্থাৎ থানায় সংবাদ দিয়েছিলেন।

কি আশ্চর্য মশাই! সংবাদ দেবো না! কোথাকার একটা cheat এসে জুড়ে বসলো তার একটা প্রতিকার চাওয়াটাও কি আমার পক্ষে অন্যায় হয়েছে বলতে চান! ঈষৎ উষ্মার সঙ্গে কথাগুলো বলে অনিরুদ্ধ।

অন্যায় নিশ্চয়ই করেন নি। কিন্তু আপনার কথাই ঠিক, শীলা দেবীর কথাটা মিথ্যে তারই বা প্রমাণ কি?

কি বলছেন আপনি মিঃ সিনহা। যে লোকের সঙ্গে ছয়মাস পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘটেছে তাকে আজ আমি চিনতে পারবো না এটাই বা আপনারা ভাবছেন কেন?

ভাবছি না আমরা কিছুই অনিরুদ্ধ বাবু। তবে কথা হচ্ছে কি জানেন?

কী?

আপনি বলছেন, উনি আসল শীলা দেবী নন অথচ উনি বলছেন উনিই আসল, আদি ও অকৃত্রিম শীলা দেবী তো বটেই—আপনিও নাকি আসল ও অকৃত্রিম অনিরুদ্ধ বাবু ওর মতে।

তা বলবেন না উনি, সেই কথা বলবার জন্যই তো এসেছেন। কোথাকার কে এক জোচ্চর দিব্যি জাঁকিয়ে বসে—

কথাটা অনিরুদ্ধর শেষ হলো না, হঠাৎ দরজার দিকে তাকিয়েই সে থেমে গেল।

ব্যাপারটা কিরীটীর নজর এড়ায় নি।

শীলা এসে ঘরে প্রবেশ করল।

কিরীটীর ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাসির একটা নিঃশব্দ চকিত বিদ্যুৎ যেন খেলে গেল মুহূর্তে।

আসুন মিস রয়. আলাপ করিয়ে দিই। ইনি মিঃ সিনহা।

নমস্কার।

দুটি হাত তুলে সুন্দর স্মিতহাস্যে শীলা নমস্কারের সঙ্গে সঙ্গে কিরীটীকে সাদর সম্ভাষণ জানাল—নমস্কার।

শীলাকে প্রত্যুত্তর দিল কিরীটী।

আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন মিঃ চৌধুরী? শীলা শাশ্বতর মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব বলে।

স্নান করছিলাম তাই আসতে একটু দেরি হয়ে গেল। পূর্ববৎ স্মিত হাস্যে জবাব দিল শীলা।

আমি তাহলে এবারে আসতে পারি?

অনিরুদ্ধর প্রশ্নে তার মুখের দিকে তাকিয়ে শাশ্বত বললে, হ্যাঁ, আসতে পারেন।

অনিরুদ্ধ যাবার জন্য ইতিমধ্যে পা বাড়িয়েছিল। হঠাৎ পশ্চাৎ থেকে কিরীটী বলে, আবার কখন দেখা হবে মিঃ ঘোষ?

বাড়িতেই তো সর্বক্ষণ প্রায় আছি! রামচরণকে বললেই সংবাদ পাব। কথাগুলো বলে অনিরুদ্ধ আর দাঁড়াল না।

একটু যেন দ্রুত পদেই ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কিরীটী এবারে শীলার দিকে তাকিয়ে বলে, দাঁড়িয়ে কেন শীলা দেবী, বসুন—

শীলা খালি সোফাটার উপর এগিয়ে গিয়ে বসল।

ভারী স্নিগ্ধ মেয়েটির চেহারা, প্রথম দৃষ্টিতেই কিরীটীর মনে হয়।

কালো রঙ্, ছিপছিপে গড়ন।

ঈষৎ লম্বাটে ধরনের মুখখানি। সমস্ত মুখ চোখ, নাক, কপাল, চিবুক সব কিছু মিলিয়ে সমগ্র মুখে যেন একটা দৃঢ় স্থির প্রতিজ্ঞার স্পষ্টতা।

শান্ত কমনীয়তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যেন মিশিয়ে আছে একটা কঠিন দৃঢ় অনমনীয়তা।

শ্যামলী ওই মেয়েটি অমন নিরীহ শান্ত দেখতে হলে কি হবে, সহজে যে কারও কাছে মাথা নীচু করে না সেটা ওর চোখে মুখেই প্রকাশ।

চলার মধ্যে বসবার ভঙ্গিটিতেও যেন একটা সংযত ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাচ্ছে।

পরিধানে সাধারণ একটি কালো পাড় সাদা তাঁতের ধুতি, গায়ে সাধারণ একটি ব্লু রংয়ের ব্লাউজ।

সদ্য স্নানের পর ভেজা চুলের রাশ পৃষ্ঠ ব্যেপে রয়েছে।

পায়ে একটি সাধারণ চপ্পল। দুহাতে একগাছি করে সরু তারের বালা। বা হাতের অঙ্গুষ্ঠে একটি রুবি পাথরের আংটি।

দেহের আর কোথাও কোন অলঙ্কার নেই।

শাশ্বতই শীলার কাছে কিরীটীর আগমনের হেতুটা যথাসম্ভব সংক্ষেপে বিবৃত করে গেল।

শাশ্বত যখন কিরীটি' আগমনের উদ্দেশ্যটা বিবৃত করছিল. তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল কিরীটী প্রায় সর্বক্ষণই শীলার মুখের দিকে।

কিন্তু এতটুকু কৌতূহল বা কোন প্রকার ভাববৈলক্ষণ্যই কিরীটী শীলার চোখে মুখে প্রকাশ পেতে দেখল না।

চুপ করে সব শুনে একবার মাত্র কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল। তারপরই আবার দৃষ্টি নামিয়ে নিল।

আচ্ছা মিস্ রয়?

কিরীটীর ডাকে শীলা মুখ তুলে তাকাল। বললে, বলুন।

অনিরুদ্ধবাবুকে তো দেখলাম আপনার প্রতি বিশেষ ভাবেই বিরূপ, আপনার বোধ হয় এখানে থাকতে একটু অসুবিধাই হচ্ছে?

হচ্ছে না বললে মিথ্যাই বলা হবে মিঃ সিনহা। আর বলবও না আমি তা।

কিন্তু আপনাদের পরস্পরের সঙ্গে তো এককালে চেনা পরিচয়ই ছিল শুনেছি। তাই নয় কি?

কিরীটীর প্রশ্নে হঠাৎ যেন কেমন একটু চমকে ওঠে শীলা। কিরীটীর নজরে সেটা এড়ায় না। কিন্তু পরমুহূর্তেই স্থির শান্তকণ্ঠে শীলা বলে, হ্যাঁ, ছিল

তবে আপনাকে ওঁর আজ না চিনতে পারার কি কারণ থাকতে পারে?

চিনতে যে উনি আমাকে পারেন নি তা নয় মিঃ সিনহা, তবে—

তবে?

কি জানি, আমি ঠিক ওঁকে বুঝতে পারছি না। কেন যে উনি আমার সম্পর্কে সন্দিহান—

আপনি বুঝতে পারছেন তাহলে যে উনি সন্দিহান আপনার সম্পর্কে?

তা না বুঝতে পারার তো কোন কারণ নেই।

খুব বিস্মিতই হয়েছেন বোধ হয় ব্যাপারটায়?

তা একটু হয়েছি।

আচ্ছা মিস রয়?

বলুন।

আপনি ওকে চিনতে পেরেছেন নিশ্চয়ই?

হ্যাঁ। আবার যেন একটু মুহূর্তের চমক। তারপরই সেটা সামলে নিয়ে বলে, হ্যাঁ।

আচ্ছা মিস রয়, আর আপনাকে এখন বিরক্ত করব না। অবিশ্যি এখন বিরক্ত না করলেও কাজের জন্য, মানে যে কাজের জন্য এসেছি, বুঝতেই পারছেন মধ্যে মধ্যে হয়তো বিরক্ত করতে হবে।

নিশ্চয়ই, আমি তো সর্বক্ষণই বাড়িতে আছি। এ বাড়িতে একমাত্র রামচরণ ছাড়া তো কেউ আমার সঙ্গে কথাই বলে না। বিরক্ত হব না বরং খুশীই হব। আচ্ছা, এখন তাহলে আসি।

কথাগুলো বলে শীলা আর অপেক্ষা করল না। ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

শীলা ঘর থেকে চলে যাবার পর শাশ্বত ওর মুখের দিকে তাকিয়ে এবারে শুধায়, কি মনে হল কিরীটী?

একটি তাতানো লোহা আর অন্যটি নিঃশব্দ চুম্বক।

না না—আমি তা জিজ্ঞাসা করি নি কিরীটী। তাড়াতাড়ি বলে শাশ্বত।

তবে কি ?

অনিরুদ্ধকে তোমার কি চেনা বলে মনে হল? মানে এই কি সেই যে অনিরুদ্ধ তোমার এক সময় কলেজের সহপাঠী ছিল?

অনেক দিনকার কথা তো শাশুত। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে মানুষের চেহারার কত অদলবদল হয়, তবে এটা ঠিকই মনের পাতায় আজও যে চেহারাটাকে স্মরণ করতে পারি তার সঙ্গে যথেষ্ট মিল একটা আছে বইকি এই অনিরুদ্ধবাবুর।

মিল আছে! আই মিন সিমিলারিটি আছে তাহলে?

তা আছে।

হুঁ। আর ওই শীলা দেবীকে?

মৃদু হেসে এবারে কিরীটী বললে, তার সম্পর্কে তো একটু আগেই বললাম হে।

কি বললে?

কেন? সত্যিকারের চুম্বক একটি।

যাক গে, মরুক গে। চুম্বকই হোক আর লোহাই হোক মোট কথা আমাদের বড়কর্তা চান ব্যাপারটার একটা ফায়শলা করতে। কারণ তারও মনে একটা ধারণা হয়ে গিয়েছে ওই ভদ্রমহিলা সত্যিই বোধ হয় জেনুইন নন।

কেন, কেন—তিনি তো যথেষ্ট প্রমাণ—

হ্যাঁ, প্রমাণ অনেক কিছুই আমরা পেয়েছি বটে। তবু—

তবু কী?

অনিরুদ্ধবাবুই বা তাকে এভাবে অস্বীকার করছেন কেন?

হয়তো কোন সত্যিই উদ্দেশ্য আছে বা হয়তো নেই, তাতানো লোহার মতই মানুষটা রাগী তো—সেই রাগের চোটেই হয়তো ঠিক ভদ্রমহিলাকে বরদাস্ত করতে পারছেন না। কিন্তু যাক্ সে কথা, এ বাড়িতে যখন এসে একবার ঢুকেছি তখন কে সত্য, কে মিথ্যা, সেটা হয়তো কিনারা করতে পারব।

তাহলে তোমার ধারণা সত্যি মিথ্যা একটা কিছু এর মধ্যে আছেই?

তা যে আছে সেটুকু অন্ততঃ আমি এখনই হলফ করে বলে দিতে পারি। এই গোলমালটা একেবারে নিছক অহৈতুক নয়।

আচ্ছা, তাহলে এবারে আজকের মত আমি বিদায় হই?

এসো। তবে একটা কথা—

কী ?

আমি নিজে থেকে না ডাকা পর্যন্ত তুমি বা তোমাদের দলের কেউ এ বাড়ির ত্রিসীমানাতেও পা দেবে না—এই প্রতিশ্রুতিটুকু আমি তোমাদের কাছ থেকে সর্বাগ্রে চাই।

ক্ষণকাল যেন কি ভেবে শাশ্বত বললে, বেশ। তাই হবে।

হ্যাঁ, সত্যিকারের শিকারের কানুনটা আমি এসব ক্ষেত্রে বিশেষ করেই একটু মেনে চলি ভাই।

কি রকম ?

শিকারের কানুন জানলে জানতে, সত্যিকারের বাঘের সঠিক সন্ধান পেতে হলে কোনরূপ সোরগোল না তুলে, কোন প্রকার ভিড় না করে সর্বাগ্রে তার চলাচলের রাস্তা ও তৃষ্ণা নিবারণের জায়গাটির খোঁজটা নিতে হয়।

বেশ বেশ। তাই হবে। মৃদু হেসে শাশ্বত আবার আশ্বাস দেয়।

হ্যাঁ, মনে থাকে যেন।

॥ ৮ ॥

বলাই বাহুল্য সেদিনকার মত শাশ্বত বিদায় নিল।

শাশ্বতও ঘর থেকে বের হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই কিরীটী বড় আরাম কেদারাটায় পরম নিশ্চিন্তে বসে, পাইপে তামুক ঠেসে তাতে অগ্নি সংযোগ করে আলস্যে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজল।

চোখের পাতা বোজা থাকলেও মন কিন্তু তার তখন অত্যন্ত সক্রিয়।

সদ্য দেখা দুখানি মুখ মনের সমস্তটা জুড়ে তখন বারংবার ভেসে ভেসে উঠছে, কখনও একের পর অন্য কখনও বা মাত্র একটিই, আবার কখনও বা দুটিই পাশাপাশি।

একটি রাগত, ক্রুদ্ধ, বিরক্তিতে বিক্ষুব্ধ চঞ্চল, অন্যটি স্থির, শান্ত অচঞ্চল।

একজন নিষ্ঠুরভাবে ব্যক্ত, অন্যজন অব্যক্ত।

অথচ এরা নাকি একদিন ঘনিষ্ঠভাবেই পরস্পরের সঙ্গে পরস্পর পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিল এবং হয়েছিলও।

তবে কি ব্যাপারটা একেবারেই মিথ্যা !

কিন্তু মিথ্যা বলে মেনে নিতে কিছুতেই যেন কিরীটীর মন সায় দেয় না।

তা ছাড়া ওইভাবে একটা মিথ্যা রচনার উদ্দেশ্যই বা কি থাকতে পারে !

আবার মনে হয়, দুজনাই জাল নয়তো!

শুধু ওই দিনটাই নয়, পরের দিনটাও কিরীটী চিন্তার মধ্যে ডুবে রইল।

পরের দিন রাত্রে।

রাত তখন নয়টা সাড়ে নয়টা হবে।

অন্যমনস্ক ভাবে কিরীটী বাড়ির পশ্চাৎ দিক্‌কার বাগানে অন্ধকারে বিরাট একটা চাঁপা গাছের তলায় শান বাঁধানো চওড়া বেদীটার উপর একাকী বসেছিল।

হঠাৎ একটা রূঢ় পুরুষ কণ্ঠস্বর কিরীটীর কানে আসতেই যেন ও চমকে ওঠে। কণ্ঠস্বরটা চিনতে ওর এতটুকুও দেরি হয় না। অনিরুদ্ধের রূঢ় বিরক্তিপূর্ণ কর্কশ কণ্ঠস্বর।

আমি জানতে চাই, কেন তুমি এভাবে আমার পিছনে লেগেছ?

জবাব দিল শীলা, আমি তোমার পিছনে লেগেছি মানে?

নয় তো কি?

কিন্তু তোমারই বা আমাকে না চিনতে পারবার, ভান করবার কি কারণ থাকতে পারে বলতে পার?

দেখ শীলা দেবী, এটা কি তোমার সত্যিই একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?

বাড়াবাড়ি!

নিশ্চয়ই।

অনিরুদ্ধ!

থাম, থাম—

আচ্ছা অনিরুদ্ধ, সত্যিই কি তোমার ধারণা আমি আসল শীলা নই?

না, কখনই না। তুমি আসল শীলা নও।

আচ্ছা অনিরুদ্ধ, কি হয়েছে তোমার সত্যি সত্যি বল, তো এ ভাবে মিথ্যা একটা প্রহসন শুরু করে দিয়েছ কেন?

থাম, ঢের হয়েছে—আর নেকামি করতে হবে না। উঃ, সত্যিই অসহ্য।

আমায় যে আজ তোমার অসহ্য মনে হচ্ছে সেকি আর আমি বুঝতে পারছি না। অথচ সেদিন কত জোর গলাতেই না বলেছিলে একশো বছর পরে দেখলেও তুমি আমাকে ঠিকই চিনতে পারবে।

চিনতে পারতাম বইকি। যদি সত্যি সেই শীলাই তুমি হতে।

আচ্ছা একটা কথা সত্যি করে বল তো কি হলে তুমি বিশ্বাস করবে যে সত্যিই সেই শীলা আমি! যে প্রমাণ তুমি চাও অনিরুদ্ধ আমি দিতে রাজি আছি। একটিবার তোমার খুশিমত আমাকে যাচাই করে দেখ না লক্ষ্মীটি।

না, যা জানি আমি অন্তর থেকে মিথ্যা বলে তার আবার যাচাই কি!

তবু তো দেখতে কোন ক্ষতি নেই।

বেশ। বল তো সেবারের পূর্ণিমার রাত্রে কুতুব মিনারের তলায় বসে কি তোমাকে আমি বলেছিলাম?

বলেছিলে তো অনেক কথাই। কিন্তু কোন বিশেষ কথাটিই তুমি জানতে চাও না বললে বলি কি করে। তবে—

তবে কি?

সেই দিনই—

কি? বল, থামলে কেন!

সেইদিনই প্রথম তুমি আমাকে চুমো খেয়েছিলে।

অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গেই যেন কথাটি উচ্চারণ করল শীলা।

অপর পক্ষ চুপ।

কিছুক্ষণ একেবারেই চুপ।

তারপরই আবার শীলার কণ্ঠে প্রশ্ন শোনা গেল, কি, চুপ করে আছ যে! এবারে বিশ্বাস হয়েছে তো?

না।

এখনও বিশ্বাস হয় নি?

না না না।

সত্যিই তুমি পাগল। আচ্ছা আরও বলব সে রাত্রের কথা।

শুনতে চাই না।

শুনতে তোমাকে হবেই। কারণ সেই রাত্রে যে রুবির আংটিটা, রুবি তোমার সব চাইতে প্রিয় স্টোন বলে আমার হাতের আঙুলে পরিয়ে দিয়েছিলে সেটা দেখ আজ এই আঙুলেই আমার আছে।

ও তুমি চুরি করে এনেছ।

অনিরুদ্ধ! একটা আর্তস্বর যেন বেরিয়ে এল শীলার কণ্ঠ থেকে, এত বড় কথাটা তুমি আজ আমাকে বলতে পারলে?

দোহাই তোমার, এখান থেকে চলে যাও।

আমি গেলে সত্যিই বলছ তুমি খুশি হবে?

হব।

কিছুক্ষণ অতঃপর আবার স্তব্ধতা।

তারপর আবার শীলার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, আচ্ছা এভাবে অনর্থক পীড়ন করে আমাকে কি তোমার লাভ হচ্ছে বলতে পার? কেন আমাকে তুমি চিনতে পারছ না, কি করেছি আমি তোমার? কি করেছি? বলতে বলতে কান্নায় যেন সহসা ভেঙে পড়ল শীলা।

কান্নাঝরা শীলার ওই কথাগুলোর পরেই কিরীটী শুনতে পেল দ্বিতীয় পক্ষ সেখান থেকে প্রস্থান করল।

তার চলে যাবার পায়ের শব্দ বাগানের ইতস্তত: ঝরা শুকনো পাতার উপর দিয়ে মচমচিয়ে যেন মিলিয়ে গেল।

তারপরেই একটা স্তব্ধতা।

কিরীটী কিন্তু নড়তে পারে না তার জায়গা থেকে, যেমন বসেছিল চাঁপাগাছটার তলায় সান বাঁধানো বেদীটার উপর তেমনি বসে রইল।

কতক্ষণ বসেছিল ওইভাবে কিরীটী তার নিজেরই যেন মনে নেই।

ধীরে ধীরে এক সময় আকাশে দেখা দেয় বাঁকা চাঁদ। বাগানের অন্ধকার গাছপালার উপর সেই চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ল যেন পাতলা মসলিনের একখানি চাদরের মত।

যা ছিল এতক্ষণ অন্ধকারে অস্পষ্ট, চাঁদের আলোয় তা বুঝি অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

রাতও অনেক হয়েছে।

কিরীটী বেদীর উপর থেকে উঠে পড়ল।

এবং অন্যমনস্কভাবেই যেন কিছুটা এগিয়ে চলল। কয়েক পা এগুতেই চাঁদের আলোয় নজরে পড়ল।

পশ্চিম দিকে একেবারে অদূরে গঙ্গার মুখোমুখি যে পাথরের বেঞ্চটা, সেই বেঞ্চের উপরে গঙ্গার দিকে মুখ করে কে একজন প্রস্তরমূর্তির মতই যেন বসে আছে।

মুহূর্তকাল সেই প্রস্তরমূর্তির মত নিঃশব্দে উপবিষ্টের দিকে চেয়ে থেকে নিঃশব্দেই পায়ে পায়ে সেই দিকে আরও একটু এগিয়ে গেল কিরীটী।

এবারে বুঝতে কষ্ট হয় না কিরীটীর—উপবিষ্টা একজন নারী।

আরও দুপা এগিয়ে গেল কিরীটী। এবং এবারে বুঝতে বা চিনতে কষ্ট হল না, সে শীলা।

শীলা তাহলে এখনও যায় নি ঘরে। বাগানেই রয়েছে, অনিরুদ্ধর সঙ্গে কিছুক্ষণ পূর্বে কথা কাটাকাটির পরও।

শীলাকে ডাকবে কি ডাকবে না ইতস্ততঃ করছে কিরীটী এমন সময় শীলা নিজেই হঠাৎ বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল এবং মুখ ফেরাতেই অদূরে চাঁদের আলোয় কিরীটীকে দণ্ডায়মান দেখে ভীত চকিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে, কে! কে ওখানে?

আমি। আমি শীলা দেবী—ভয় পাবেন না।

ওঃ, মিঃ সিনহা?

হুঁ, কিন্তু আপনি এ রাত্রে বাগানে!

না। এমনিই, মানে—ঘুম আসছিল না, তাই একটু—

জায়গাটা সত্যিই চমৎকার। তা আপনাকে একা দেখছি—মিঃ ঘোষ, অনিরুদ্ধবাবু কোথায় গেলেন?

অনিরুদ্ধ!

কতকটা যেন বিস্ময়ের সঙ্গেই কথাটা উচ্চারণ করে শীলা।

হ্যাঁ, অনিরুদ্ধবাবুও তো ছিলেন একটু আগে এখানে, গেলেন কখন? যাক্ সে কথা শীলা দেবী, আপনার যদি অসুবিধা না হয় তো কয়েকটা কথা ছিল আপনার সঙ্গে।

কথাটা বলে আহ্বানের কোন অপেক্ষা না রেখেই কিরীটী পাথরের বেঞ্চটার উপরে গিয়ে বসল এবং শীলার দিকে তাকিয়ে আহ্বান জানাল, বসুন মিস রয়।

মুহূর্তকাল শীলা যেন একটু ইতস্ততঃ করল তারপর ধীরে ধীরে বেঞ্চটার উপর পুনরায় কিরীটীর পাশেই কিছু দূরত্ব রেখে বসে পড়ল।

শীলা দেবী, আপনাকে আটকে রেখে আপনার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটালাম না তো?

না, না—আমি রাত বারটা সাড়ে বারটার আগে বড় একটা শুইই না।

যাক্ নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আচ্ছা, শীলা দেবী?

বলুন।

আমি আপনাকে কিছু আপনার অতীতের কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

অতীতের কথা!

হ্যাঁ, দেড় বৎসর আগে ট্রেন দুর্ঘটনার পর থেকে আপনার মনে যা আছে যদি যথাসম্ভব আমাকে একটু বলেন।

কিরীটীর প্রশ্নের জবাবে কিছুক্ষণ শীলা চুপ করেই বসে থাকে, কোন জবাব দেয় না। তারপর অত্যন্ত যেন ক্ষীণ কণ্ঠে প্রশ্ন করে, ট্রেন দুর্ঘটনার পরে?

হ্যাঁ, ট্রেন দুর্ঘটনার পর।

আমার—আমার তো ঠিক মনে নেই মিঃ সিনহা তেমন কিছুই।

কিছুই আপনার মনে নেই? যখন আপনি ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন, সে সময় আপনি কি ঠিক দেখলেন, আপনার আশেপাশে কে বা কারা ছিল—

॥ ৯ ॥

কেউ কোথায়ও তো ছিল না। শুধু অন্ধকার—না কেউ কোথাও ছিল না—হ্যাঁ, কিছুই তো আমার মনে নেই।

কেমন যেন বিভ্রান্তের মত কথাগুলো থেমে থেমে ভেবে ভেবে বলে শীলা।

কিছুই আপনার মনে নেই? একথাও মনে নেই যে আপনার ট্রেনে আপনি দিল্লী থেকে কলকাতায় আসছিলেন মিঃ গুহর জরুরী চিঠি পেয়ে? মোগলসরাই ছাড়বার পর হঠাৎ ট্রেনটা আপনার লাইনচ্যুত হয়ে—

সেটুকু মনে আছে। কিরীটীর কথাটা ধরে নিয়ে বলতে থাকে শীলা, ট্রেনে সেদিন খুব ভিড় ছিল। সেকেণ্ড ক্লাশের যে কম্পার্টমেণ্টে আমি আসছিলাম তার মধ্যেই আমরা প্রায় দশ বার জন যাত্রী ছিলাম।

কারো সঙ্গে সেদিন আপনার ট্রেনে পরিচয়, কোনরকম আলাপ বা কথাবার্তা হয় নি?

শীলা চুপ করে থাকে।

কিরীটী বুঝতে পারে মনের মধ্যে হাতড়াচ্ছে শীলা। অতীত স্মৃতির পৃষ্ঠাগুলো মনে মনে উল্টে পাল্টে পড়বার চেষ্টা করছে।

মনে করে দেখুন শীলাদেবী, সে রাত্রে ট্রেনে কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোক যাত্রী যে হয়তো আপনার খুব কাছে এপাশে ওপাশে বসেছিল কিম্বা সামনের বেঞ্চে মুখোমুখি ছিল, দীর্ঘ একটানা ট্রেন যাত্রায় বিশেষ করে কামরায় ভিড় থাকলে এমন তো কত জনের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় হয়।

শীলা পূর্ববৎ চুপ করেই বসে থাকে।

কিরীটী আবার বলে, মনে পড়ছে না, এমন কারো কথাই কি সে রাত্রের ট্রেন জার্নীতে আপনার মনে পড়ছে না—

একজন ইউ, পির ষ্টুডেন্টের সঙ্গে—ইউ, পির লোক হলেও অনেকদিন তিনি নাকি বাংলাদেশে ছিলেন—

বলুন, থামলেন কেন?

তার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলাম মনে পড়েছে যেন অনেকক্ষণ।

কি নাম তার মনে আছে?

নাম! নাম—ঠিক প্রমথ না কি যেন বলেছিলেন ঠিক মনে নেই।

কি ধরণের কথাবার্তা তার সঙ্গে সেদিন হয়েছিল?

তিনি অনেক কথা আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

কি রকম?

ছোটবেলায় আমি কোথায় ছিলাম, কোন স্কুল কলেজে পড়েছি। দিল্লীতে কতদিন আছি—আরো কত কথা।

আচ্ছা শীলাদেবী, আপনি কেন কলকাতায় আসছিলেন সে সম্পর্কে কোন আলোচনা করেছিলেন তার সঙ্গে?

না।

তারপর যখন ঠিক দুর্ঘটনাটা ঘটে তখন আপনি কি করছিলেন মনে আছে?

বোধ হয় গল্প করতে করতে কেমন একটু ঝিম এসেছিল আর ঠিক সময় হঠাৎ প্রচণ্ড একটা শব্দ আর ধাক্কা খেয়ে যেই পড়লাম, তারপর সব অন্ধকার।

তারপর?

তারপর আর কিছু মনে নেই। পরে শুনেছিলাম এক বছরেরও বেশি সময় আমার নাকি পূর্বস্মৃতি সব একেবারে মন থেকে মুছে গিয়েছিল। আমার পরিচয়, আমি কে, কি আমার নাম কিছুই নাকি বলতে পারি নি কাকাবাবুকে—

কাকাবাবু!

হ্যাঁ, জগৎবাবু, যার আশ্রয়ে আমি ওই একটা বছর কাশীতে ছিলাম। জগৎবাবুকেই আমি কাকাবাবু বলে ডাকতাম।

তাহলে ওই একটা বছর আপনি কাশীতেই ছিলেন?

হ্যাঁ।

কিন্তু জগৎবাবুর ওখানে আপনি গেলেন কি করে?

জগৎবাবু অর্থাৎ কাকাবাবু একজন ডাক্তার। সে সময় মোগলসরাই থেকে কয়েক মাইল দূরে যে সময় নাকি অ্যাকসিডেন্টটা হয় তার পরদিন কাছাকাছি একটা গ্রামে তিনি একজন রোগী দেখতে গিয়েছিলেন। বিকেলের দিকে গাড়িতে করে যখন ফিরছেন আমাকে একটা ঝোপের পাশে বসে থাকতে দেখতে পেয়ে সঙ্গে করে আমাকে তার কাশীর বাসায় নিয়ে আসেন।

ওঃ। তবে যে আমি শুনেছিলাম—

কি শুনেছিলেন?

আপনি নাকি কোন এক হাসপাতালে ছিলেন?

হাসপাতালে! কই না তো—

কিন্তু আপনি মিঃ গুহর কাছে তাই বলেছিলেন।

বলেছিলাম নাকি? আমার তো তা মনে নেই—

সত্যিই আপনি বলেছিলেন।

বলেছিলাম! তা হয়তো হবে মাঝে মাঝে কি যে আমি বলি, নিজেরই আমার মনে থাকে না। মনে করতে পারি না। কেমন যেন আমার মাঝে মাঝে সব কিছু গোলমাল হয়ে যায়।

কথাগুলো বলতে বলতে শীলা কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

কিরীটী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মৃদুকণ্ঠে বললে, মিস্ রয়, আর বাইরে থাকবেন না, অনেক রাত হল। চলুন, উঠুন।

শীলা অতঃপর বেঞ্চ থেকে উঠে ভিতরের দিকে চলে গেল।

•

ওই ঘটনার দিন দুই পরে।

সন্ধ্যার কিছু পরে।

অনেকদিন পরে সন্ধ্যার মুখে অনিরুদ্ধ বাড়ি থেকে বের হয়েছে।

দোতলার যে ঘরে ফোন ছিল কিরীটী সেই ঘরে এসে ঢুকল।

ফোন করে শাশ্বতকে ডাকল।

কে, শাশ্বত!

কথা বলছি—শাশ্বতর কণ্ঠস্বর ফোনে ভেসে এল।

তোমাকে একবার কালই কাশী যেতে হবে।

হঠাৎ কাশী কেন?

সেখানে গণেশ মহল্লায় জগৎ হাজরা নামে একজন ডাক্তার আছেন, তিনি শীলা সম্পর্কে কি জানেন সব জেনে এসে আমাকে তুমি জানাবে।

তথাস্তু।

শীলা সেখানে কতদিন ছিল, কি অবস্থায় ছিল, কি অবস্থায় শীলাকে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন প্রথম সব জানবে। আর তোমাকে যে বলেছিলাম দুজন ছেলেকে এ বাড়ির আশেপাশে সর্বদা পাহারায় রাখবে—

তোমার কথামত দুজন তো রাখছি। সুশীল আর রজত। তাদের বলাই আছে শীলা বা অনিরুদ্ধ কখনও বাড়ি থেকে বেরুলে একজন যেন তাদের follow করে—যাক্ শোন, একটু আগে আগে অনিরুদ্ধ বের হয়ে গিয়েছে।

তাই নাকি।

হুঁ।

তা তোমার রহস্য উদ্ঘাটনের ব্যাপার কতদূর অগ্রসর হল?

এখনও বিশেষ কিছু অগ্রসর হতে পারি নি—

তারপর সেইদিন রাত্রে।

রাত বোধ করি তখন বারটা হবে।

অনিরুদ্ধ তখনও ফেরে নি।

রাত নয়টা নাগাদ রামচরণ যখন কিরীটীকে ডিনার পরিবেশন করছিল, শীলার কথা জিজ্ঞাসা করেছিল কিরীটী রামচরণকে।

তোমার দিদিমণি খেয়েছেন রামচরণ?

না, তিনি কিছু খাবেন না বলেছেন। শরীরটা ভাল না। মাথার নাকি খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। মধ্যে মধ্যে ওরকম মাথার যন্ত্রণা তো হয় দিদিমণির

মধ্যে মধ্যে ওর মাথার যন্ত্রণা হয় বুঝি?

হ্যাঁ।

আচ্ছা রামচরণ, এ বাড়িতে আসার পর তোমার দিদিমণি কি কখনও বাড়ির বাইরে যান নি?

না। একদিনও যেতে কোথায়ও দেখি নি। ঘরের থেকেই তো বড় একটা বের হন না এক ওই রাত্রে বাগানে বেড়ানো ছাড়া।

তোমার দাদাবাবুর ঘরে কখনও ওকে যেতে দেখ নি?

না।

তোমার দাদাবাবু? তিনিও কখনও ওর ঘরে যান না?

না।

তাহ'লে তোমার দাদাবাবু ও দিদিমণির মুখো কখনও কথাবার্তাই হয় না বল!

কথাবার্তা হবে কি? মুখ দেখাদেখিই তো নেই দু'জনার মধ্যে। দাদাবাবু যে কেন এমনধারা ওর সঙ্গে ব্যবহার করছেন। অমন ভাল মেয়ে হয় না বাবু।

॥ ১০ ॥

সে রাত্রে শীলা বাগানেও আসে নি।

একা একাই কিরীটি বাগানের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আকাশে সে রাত্রির মতই এক ফালি চাঁদ। আর তারই ক্ষীণ আলো চারিদিককার গাছপালার উপর ছড়িয়ে পড়েছে।

বিরাট বাড়িটা যে নিশি রাতের ঘুমের ঘোরে স্তব্ধ।

কোথায়ও কোন আলো নেই।

অনিরুদ্ধ ফিরেছে কি না তাই বা কে জানে।

সহসা শুকনো পাতার উপর একটা মৃদু মুচ্ মুচ্ শব্দ কিরীটীর সতর্ক শ্রবণেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে।

অত্যন্ত সাবধানী লঘুপদে কে যেন হেঁটে চলেছে।

যত ক্ষীণতম লঘু পদশব্দই হোক না কেন এবং সে শব্দ মানুষের পায়ের হলে কিরীটীর বঝতে সেটা কষ্ট হয় না যে সেটা সত্যিই মানুষের পায়ের শব্দ।

আজও কিরীটীর সে শব্দ চিনতে ভুল হল না।

মানুষের পায়ের শব্দই। কিন্তু এত রাত্রে এই নির্জন বাগানে কে এল।

এ বাড়ির মধ্যে একমাত্র শীলাই আসে রাত্রে এই বাগানে। আর তো কিরীটী কয়েকদিন থেকে লক্ষ্য করছে দ্বিতীয় কোন প্রাণীই এ বাগানে পা দেয় না। তাও আবার এত রাত্রে।

শীলা। শীলা তো আজ অসুস্থ, ঘর থেকেই বের হয় নি। তবে কে? কার পায়ের শব্দ? নিঃশব্দে কিরীটী কান পেতে থাকে।

শব্দটা ক্রমশঃ যেন তারই দিকে এগিয়ে আসছে। মধ্যে মধ্যে থামছে। আবার এগিয়ে আসছে অত্যন্ত সাবধানী লঘু সতর্ক কারো পদবিক্ষেপ।

ধীরে ধীরে পদশব্দটা ঝরা পাতার পরে মুচ্ মুচ্ শব্দ তুলে কিরীটীর

পাশ কাটিয়ে ঠিক যেন বাগানের পূব দিককার কামিনী গাছগুলোর পশ্চাতে ক্রমশঃ মিলিয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে কিরীটীও এবার কামিনী গাছগুলোর গা ঘেঁষে ঘেঁষে সতর্ক পায়ে এগিয়ে চলল।

আট দশ গজ এগুবার পরই কামিনী গাছের ঝোপগুলো যেখানে শেষ হয়ে গেছে সেখানে এসে পৌঁছতেই এবারে কিরীটীর নজরে পড়ল, একটা কালো চাদরে আবৃত ছায়ামূর্তি সরু টর্চের আলো ফেলে ফেলে বাড়ির পশ্চাতের দিকে বাড়ি ও বাগানের মধ্যে যাতায়াতের যে দ্বার পথটি সেই দিকেই সন্তর্পণে এগিয়ে চলেছে।

কিরীটী আর অগ্রসর হতে পারে না কারণ আর অগ্রসর হলে একেবারে খোলা জায়গায় গিয়ে তাকে পড়তে হবে, যেখান থেকে অগ্রবর্তী ছায়ামূর্তি কোন মুহূর্তে ফিরে তাকালেই তাকে দেখতে পাবে।

কিন্তু কিরীটী নিজেকে ধরা দিতে ইচ্ছুক নয় বলেই যেখানে ছিল সেখানেই গাছের আড়ালে নিজেকে গোপন করে রেখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল।

দরজাটা খোলাই ছিল। সেই খোলা দরজা পথে ছায়ামূর্তি অদৃশ্য হল বাড়ির মধ্যে।

কিরীটী এবারে আর অপেক্ষা করে না। দরজার দিকে এগিয়ে গেল। বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে প্রথমেই দরজার কবাট দুটো বন্ধ করে ভিতর থেকে খিল তুলে দিল।

একটা অপ্রশস্ত অন্ধকার অলিন্দ পথ।

অলিন্দ অতিক্রম করলেই একটা বাঁধানো প্রশস্ত চত্বর। মধ্যরাত্রির মৃদু চাঁদের আলো ও অন্ধকারে চত্বরটায় যেন কেমন একটা আলোছায়ার রহস্য ঘনিয়ে উঠেছে।

চত্বরটার পাশ দিয়ে ঘোরা একটা নাতিপ্রশস্ত বারান্দা পূব দিক থেকে অর্ধচন্দ্রাকৃতি ভাবে ঘুরে পশ্চিম প্রান্তে একেবারে দোতলায় উঠবার সিঁড়ির সামনে শেষ হয়েছে।

সিঁড়ির মাঝামাঝি জায়গায় একটা কম পাওয়ারের বিদ্যুৎ বাতি জ্বলে।

সারাটা রাতই প্রায় আলোটা সিঁড়িতে জ্বলে কিরীটী পূর্বেই লক্ষ্য করেছিল। এবং সে আলোটা আজ যখন রাত দশটার সময় বাগানে গিয়েছিল কিরীটী তখনো জ্বলছিল।

কিন্তু ঐ সময় আলোটা আর জলছিল না। সমস্ত সিঁড়িটাই অন্ধকার।

মুহূর্তের জন্য বুঝি কিরীটী থমকে দাঁড়ায়। তারপর পকেটে তার টর্চ বাতি থাকা সত্ত্বেও টর্চের আলোর সাহায্য না নিয়েই অন্ধকারেই সিঁড়ির ধাপের দিকে পা বাড়ালো।

পরিচিত সিঁড়িটা কিরীটীর।

গত কয়রাত্রি ধরে ঐ সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামা করায় অন্ধকারেও সিঁড়ি অতিক্রম করতে কিরীটীর কোন কষ্ট বা অসুবিধা হয় না।

নিঃশব্দেই কিরীটী ধাপের পর ধাপ সিঁড়ি অতিক্রম করে দোতলার বারান্দায় এসে পৌঁছাল। উপরের বারান্দার আলোটাও নিভান।

সেটাও সারাটা রাত ধরেই জলে বরাবর।

কিন্তু তা হলেও কিরীটীর দেখতে কোন অসুবিধা হয় না। কারণ মৃদু চাঁদের আলোর যেটুকু এসে বারান্দায় পড়েছে, সেই আলোতেই কিরীটী সব কিছু দেখতে পায়।

স্তব্ধ নিঃঝুম যেন সমস্ত বাড়িটা। কোন সাড়া শব্দই কোথাও নেই।

বারান্দাটার মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে কিরীটী বারেকের জন্য দুদিকে দৃষ্টিপাত করে এধার ওধার যতদূর দৃষ্টি চলে দেখে নিল।

খাঁ খাঁ করছে শূন্য বারান্দাটা। জনপ্রাণীর চিহ্নও নেই।

কিরীটীকে একবার কিছুক্ষণের জন্য ভাবতে হয়, সামনের দিকে যাবে না পিছনের দিকে যাবে, বাড়িটার উপর ও নীচের তলায় যাবতীয় অংশই তার চেনা।

মনের মধ্যে একটা ছক কেটে নিয়েছিল কিরীটী বাড়িটার সর্বাগ্রে এখানে আসার পর দিনই ঘুরে ঘুরে রামচরণ ক নিয়ে সব দেখে।

পুরাতন ভৃত্য রামচরণ তাকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে সব দেখিয়ে চিনিয়ে দিয়েছিল বাড়িটার কোথায় কি আছে।

যাতায়াতের কোথায় কোন পথ, কোথায় কোন ঘর, কোন ঘরে কি আছে, দরজা কোথা দিয়ে কোথায় যাবার সব দেখিয়ে দিয়েছিল।

কিরীটী তাই বোধ হয় মনে মনে চকিতে বাড়ির দোতলাটা একবার ভেবে নেয়। আগে সে দোতলাটাই খোঁজ করে দেখবে, তারপর নীচে যাবে।

কিরীটী সর্বপ্রথম ঘুরে পেছনের দিকেই অগ্রসর হল। দক্ষিণ দিকে।

সিঁড়ির পরে খান দুই ঘর।

সে ঘর ছুটো সাধারণত বন্ধই থাকে। একটা তার মধ্যে যেটা বড়, সেটাই নাকি নরহরির শয়ন ঘর ছিল।

তার পরের ঘরটিতে আলিমারী ভরা সব নানা বই।

নরহরির প্রিয় বস্তু ছিল নাকি ঐ বইগুলো।

ধনীর একমাত্র পুত্র হিসাবে যে ধরণের বিলাস বা নেশা প্রায়শঃই দেখা যায় নরহরির তার কিছুই নাকি বড় একটা ছিল না।

তার নেশা ছিল বই পড়া ও দেশ বিদেশ ভ্রমণ।

প্রথম জীবনে দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছেন নরহরি আর সঙ্গে থেকেছে তাঁর বাক্স ভর্তি বই।

তাঁর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ওই বই পড়ার নেশাটাই নাকি হয়ে উঠেছিল ক্রমশঃ আরো প্রবল। দিবারাত্র বই নিয়েই পড়ে থাকতেন।

এবং সে বইও নানা দেশ বিদেশের যত ইতিহাস।

নরহরির মৃত্যুর পর থেকে আলমারী ভরা বইয়ের ঘরটি বন্ধই থাকে।

তারপরের ঘরটি অনিরুদ্ধর ঘর।

শুধু সেই ঘরটিই নয়, ওই ঘরের পরের ঘরটিও অনিরুদ্ধ অধিকার করেছে এ বাড়িতে আসা অবধি।

তার পরের ছুটি ঘর খালিই পড়ে আছে।

এতদিন তালা বন্ধই ছিল, বর্তমানে তারই একখানি কিরীটী দখল করেছে।

সর্বশেষের ছুখানি ঘর অধিকার করেছে শীলা।

অনিরুদ্ধর ঘরের দরজায় বাইরে থেকে তালা ঝুলছে।

অনিরুদ্ধ তাহলে ফেরে নি।

কিরীটী আরও এগিয়ে গেল।

এবং নিজের ঘর ও পরের খালি ঘরটা পার হয়ে শীলার ঘরের দরজার কাছাকাছি আসতেই শীলার ঘরের জানলার বন্ধ খড়খড়ির ফাঁকে নজরে পড়ল কিরীটীর ক্ষীণ একটা আলোর শিখা।

এ কি! এখনও শীলা ঘুময় নি!

ঠিক সেই মুহূর্তে শীলার চাপা কণ্ঠস্বর কানে এল কিরীটীর।

না, এভাবে আবার আসা তোমার খুব অন্যায় হয়েছে। যদি কেউ দেখে ফেলে তো—

দেখে ফেলবে কেমন করে। নিশ্চিন্ত থাক তুমি শীলা, কেউ আমাকে দেখে নি, দেখতে পাবেও না কেউ।

চাপা পুরুষ কণ্ঠ।

কিরীটী একেবারে যেন পাথর হয়ে গিয়েছে।

কে! কার সঙ্গে কথা বলছে শীলা!

ঘরের ভিতর থেকে আবার পুরুষ কণ্ঠ শোনা গেল, কি রকম বুঝছ তুমি বল?

কি আবার বুঝব, সেই পূর্ববৎ।

তোমাকে যে মেনে নেবে না, তা আমি জানতাম। বেশ দেখাই যাক আরও কিছুদিন, সে রকম বুঝলে শেষ পর্যন্ত মুখোমুখি দাঁড়াতেই হবে—

সে কি।

তা ছাড়া আর উপায় কি বল! এভাবে—

না, না—অমন কাজও করো না। তাতে করে জেন আরও জট পাকিয়ে উঠবে সব।

জট যদি পাকায়ই খুলতে হবে সে জট।

না, আমাকে আরও কিছুদিন সময় দাও।

বেশ।

কিন্তু আর তুমি এখানে থেক না।

যাচ্ছি, কিন্তু—

আর একটা কথা।

আমি না ডাকলে তুমি আর এসো না।

বেশ—

হ্যাঁ, যা বললাম মনে রেখ। যাও—না, না—ওদিক দিয়ে নয় এদিক দিয়ে এস—তারপরই শীলার ঘরের আলোটা নিভে গেল।

পরে . . . . .

কিরীটী তার নির্দিষ্ট ঘরের মধ্যে সোফার 'পরে বসে একটা বাংলা উপন্যাস পড়ছিল, শাশ্বত এসে ঘরে প্রবেশ করল।

কিরীটী পঠিত পুস্তক থেকে মুখ না তুলেই প্রশ্ন করলো, এসো শাশ্বত, মনে হচ্ছে নূতন কোন সংবাদ যেন আছে।

কিরীটীর মুখোমুখি অন্য সোফাটার উপর বসতে বসতে শাশ্বত বললে, তোমার কথাই ঠিক—

কি ? আর একটি নারী এর মধ্যে আছেন এই তো।

হ্যাঁ, সেই কথাটাই বলতে এসেছি। কিন্তু আশ্চর্য, বুঝলে কি করে ?

বইটা বন্ধ করে হাতের মধ্যে ধরে মৃদু হেসে কিরীটি শাশ্বতর মুখের দিকে তাকাল, নারীঘটিত সংবাদ না হলে কি নিজে স্বয়ং এই দুপুর রৌদ্রে এখানে চলে আসতে !

তা নয় হে। ফোনে সব কথা বলা উচিত হবে না। ভাবলাম তাই—

বেশ করেছ। বল এবারে শুনি, সেই ভদ্রমহিলাটির রূপ ও গুণের ব্যাখ্যান কর। দেখতে কেমন, বয়স কত, বাস কোথায়—

তুমি ঠাট্টা করছ কিরীটী।

হাস্—স—সঙ্গে সঙ্গে কিরীটী শাশ্বতকে সতর্ক করে দেয়, ক্ষেপে গেলে নাকি ? বল সিনহা—

য়্যাম সরি। সত্যি ভুল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু জান কি অনিরুদ্ধ কোথায় যায় ?

রেসের মাঠে যায় বলেই তো জানি।

গুড্ হেভেন ! জানলে কি করে সে কথা ?

তার ঘরের ড্রয়ারটা সেদিন তার অনুপস্থিতে হাতড়াতে গিয়ে রেসের বই একটা পেয়েছি। অতএব—ও তো পূর্বেই জেনেছিলাম। তারপর বোধ হয় সেই ভদ্রমহিলাটির ওখানে যায়।

না হে না।

তবে ?

প্রথমে বেলতলায় সেই ভদ্রমহিলাটির ওখানে যায় তারপর দু'জনে ট্যাক্সি করে বের হয়।

বুঝলাম, তা সেই ভদ্রমহিলাটি কে ? বর্তমান যুগের অন্যতমা অভিনেত্রী মন্দিরা চ্যাটার্জি তো !

॥ ১১ ॥

শাশ্বত সত্যিই এবারে যেন হাঁ করে কিরীটীর শেষ কথাটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কিরীটী পূর্ববৎ মৃদু হেসে বলে, হাঁ হয়ে গেলে কেন, ভোজবিদ্যা বা কোন যাদুবিদ্যা নয়। স্রেফ ডিডাকসন বাই কমনসেন্স্।

বলতে বলতে হাতের বইটার পাতা উল্টে তার ভিতর থেকে বর্তমানের সিনেমা স্টার মন্দিরা চ্যাটার্জীর একখানা ফটো বের করে বিহ্বল শাশ্বতর দৃষ্টির সামনে তুলে ধরতে ধরতে কথাটা শেষ করে কিরীটী তার, এই ছবিটিও অনিরুদ্ধর ঘরের ড্রয়ের মধ্যে আবিষ্কার করেছি। আর ইনি তো বর্তমানে কারও অপরিচিতা নন ফিল্ম পাবলিসিটির দৌলতে। কাগজ—মানে বর্তমানে পিতৃ অর্জিত মোটা ব্যাঙ্ক ব্যালন্সের দৌলতে কতকগুলো যৌন বিকৃতিতে ভরা সিনেমা ও সাহিত্যের জগাখিচুড়ী যে হামবড়িয়া কাগজ বেরুচ্ছে তার পাতায় পাতায়, এরা কখন কি করেন, কি খান, কতখানি হাতকাটা ব্লাউজ পরেন, কখন ঘুমন, কখন কাঁদেন, কখন হাসেন তার সব ছবি দেখে দেখে বেশীর ভাগ যৌন বিকৃতিতে যাঁরা ভুগছেন তাঁরা যেমন এঁদের চেনেন তেমনই এঁদের প্রেমেও পড়েন। কাজেই এই ফটোটি অনিরুদ্ধর ঘরের ড্রয়ে আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার কমনসেন্স্ ওই দিকেই আমাকে ইঙ্গিত দিয়েছিল। এখন বুঝতে পারছি অনুমান আমার মিথ্যে নয়। এবং মন্দিরা চ্যাটার্জীই হোক বা অন্য কোন নারীই হোক, কোন এক নারী যে এর মধ্যে আছে সেটাও এখানকার কাহিনী সে রাত্রে আমার বাড়িতে বসে তোমার মুখে শুনেই অনুমান করেছিলাম, কিন্তু যাক সে কথা, মন্দিরার চাইতেও আমাদের বেশী প্রয়োজন এখন—

কী!

কি ভাবে এবং ঠিক কতদিন ধরে ওদের পরস্পরের আলাপ সেটা সর্বপ্রথম জানবার চেষ্টা কর তো শাশ্বত।

সেটুকু জানতে বোধ হয় খুব বেশী কষ্ট পেতে হবে না। ওই অভিনেত্রীটির একজন গুণমুগ্ধ অন্ধ স্তাবক আছে বারীন—তার কাছ থেকেই সব জানতে পারব আশা করছি।

বেশ, তবে তো ভালই হল। তাহলে জগৎ ডাক্তার ও অভিনেত্রী মন্দিরার ব্যাপারটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে জেনে জানাবে কি বল।

জানাব।

কিরীটীর ঘরে কিরীটী ও শাশ্বত যখন পরামর্শ করছে অনিরুদ্ধ তখন সাজগোজ করছিল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে।

সাজগোজ করতে করতে অনিরুদ্ধ ভাবছিল।

টাকা। কিছু টাকার একান্ত দরকার।

কোন অসুবিধাই ছিল না টাকার। এখানে আসার মাস দুয়েকের মধ্যেই সলিসিটার মিঃ গুহ টাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ইচ্ছামতই খরচ করছিল অনিরুদ্ধ।

তারপর হঠাৎ যে মিঃ গুহর মতিগতি কি হলো মাস কয়েক আগে অনিরুদ্ধর নামে ব্যাংকে নির্দেশ দিয়ে দিল টাকাকড়ি এখন আর তোলা চলবে না।

অনিরুদ্ধ কারণটা জানতে চাইল কিন্তু মিঃ গুহ মৃদু হেসে কেবল বললেন, কারণ একটা আছে বৈকি মিঃ ঘোষ। সময় হলেই জানতে পারবেন।

ওই ব্যাপারেই মিঃ গুহর সঙ্গে কয়েকমাস ধরে অনিরুদ্ধর একটা মন কষাকষি চলছিল এবং সেটা শীলা এখানে আসবার পর থেকে যেন আরো পাকিয়ে উঠলো।

এবং এবারে মিঃ গুহ স্পষ্টাস্পষ্টিই অনিরুদ্ধকে জানিয়ে দিলেন, যে ব্যাপারটা একটা মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত সে নাকি তিনশত টাকা মাসিক খরচ ছাড়া একটা কপর্দকও বেশী পাবে না।

অথচ দু একদিনের মধ্যেই হাজার চারেক টাকার দরকার অন্তত অনিরুদ্ধর। মন্দিরাকে একটা নেকলেস দিতে হবে।

মন্দিরা গতকাল কিন্তু ঠিক কথাই বলেছিল। গত বার তের মাস ধরে হাতে যখন তার সর্বস্বর চাবিকাঠিটা একপ্রকার ছিল সে সময় মোটা মত কিছু যদি সে অন্যত্র সরিয়ে রেখে দিত।

কিন্তু বুঝবেই বা সে কি করে।

একদিন পরে যে হঠাৎ একটা এমন বিশ্রী বিভ্রাট বাধবে। এমন একটা জট পাকিয়ে উঠবে, স্বপ্নেই কি সে ভাবতে পেরেছিল!

শীলা!

হঠাৎ যেন চমকে ওঠে অনিরুদ্ধ।

দর্পণে শীলার ছায়া পড়ে।

শীলা যে ইতিমধ্যে কখন একসময় তার ঘরের দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছে ও টেরই পায় নি।

চকিতে ফিরে দাঁড়ায় অনিরুদ্ধ।

তুমি!

শীলা ধীরে ধীরে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে অনিরুদ্ধর একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে, হ্যাঁ আমি—তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল।

ভ্রু কুঞ্চিত করে ক্ষণকাল শীলার মুখের দিকে তাকিয়ে কঠিন শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করে অনিরুদ্ধ, কী কথা?

শীলা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে একটা খালি চেয়ারের 'পরে বসতে বসতে বলে, বসতে তো তুমি আমাকে বলবে না, তাই নিজেই বসলাম।

ভ্রু দুটো বিরক্তিতে কুঞ্চিত করেই ছিল অনিরুদ্ধ। মুহূর্তকাল শীলার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, আমি এখুনি বেরুব, তোমার বক্তব্যটা তাড়াতাড়ি একটু শেষ করলেই খুশি হব।

সেই অভ্যস্ত সুন্দর মিষ্টি হাসি হাসল শীলা।

সত্যিই সুন্দর হাসিটি শীলার। সুন্দর মিষ্টি হাসি।

তারপরই মিষ্টি কণ্ঠে বলে, আচ্ছা, তোমার না ল্যাভেণ্ডার মাথায় মাখা কোথাও বেরুবার আগে বহুদিনের অভ্যাস ছিল দিল্লীতে কতদিন আমাকে বলেছ, কিন্তু এবারে তো তোমাকে কখনও সেই মিষ্টি গন্ধ ল্যাভেণ্ডার মাথায় মাখতে দেখি না। মাখো না কেন সেই ল্যাভেণ্ডারটা, খুব ভালো লাগত আমার সে গন্ধটা।

দেখুন শীলা দেবী, জানি না অবিশ্যি সত্যি সত্যিই আপনার নাম শীলা কিনা, আমার একটা কথার সত্যি জবাব দেবেন?

দেব কি শুনি?

এ ভাবে সত্যিই আর চলছে না, তাই চাইতে—

কী?

উভয় পক্ষেরই পোষায় এমন একটা চুক্তিতে এলে বোধ হয় আমরা উভয়েই পরস্পরের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারি।

চুক্তি!

হ্যাঁ চুক্তি। কত টাকা পেলে আপনি আমাকে নিষ্কৃতি দিতে পারেন বলুন তো?

টাকা! কিসের টাকা?

ন্যাকামী রাখুন, বলুন কত টাকা পেলে এ বাড়ি থেকে আপনি চলে যাবেন?

কিন্তু আমি তো টাকা চাই না।

থামুন, থামুন—আর অভিনয় করবেন না।

অভিনয় যে আমি করছি না তা তুমি খুব ভালভাবেই জান। দোহাই তোমার, আমাকে না হয় একবার তোমার ইচ্ছামত পরীক্ষা করেই দেখ।

পরীক্ষা!

হ্যাঁ, পরীক্ষা করে দেখই না একবার যেভাবে খুশি। যে পরীক্ষা করবার ইচ্ছা কর, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি—পরীক্ষায় হারলে সেই মুহূর্তে এ বাড়ি ছেড়ে আমি চলে যাব।

শীলার শেষের কথায় সহসা অনিরুদ্ধর চোখের মণি দুটো যেন জ্বলে ওঠে একটা কঠিন প্রতিজ্ঞায়। ওষ্ঠ দৃঢ়বদ্ধ হয়।

এখুনি তুমি চুক্তির কথা বলছিলে, এই চুক্তিই না হয় হোক আমাদের মধ্যে।

বেশ। তাহলে এখুনি তোমাকে বেরুতে হবে।

তোমার সঙ্গে বেরুতে হবে?

হ্যাঁ।

কোথায়?

নাইবা শুনলে। চল দেখবে 'খন।

বেশ, তাহলে আমি প্রস্তুত হয়ে নিই—

হ্যাঁ, তাই এসো।

॥ ১২ ॥

মিনিট কুড়ির মধ্যেই শীলা প্রস্তুত হয়ে অনিরুদ্ধর ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল।

ফিকে আকাশ নীল রঙের পাতলা একটা শাড়ী, গায়ে গেরুয়া সিল্কের ব্লাউজ, বর্মিজ প্যাটার্ণে মাথায় কেশ রচিত হয়েছে। হাতে লং কোটটি।

অনিরুদ্ধ বুঝি মুহূর্তের জন্য নিজেকে ভুলেই চেয়ে থাকে শীলার মুখের দিকে।

সেই সুন্দর মিষ্টি হাসি জেগে ওঠে শীলার ওষ্ঠ প্রান্তে। বলে, কি দেখছ? মনে করে দেখ, ঠিক যে বেশে তুমি আমাকে দেখতে চাইতে ঠিক সেই বেশেই আজ আমি সেজে এসেছি।

অনিরুদ্ধ কোন কথা না বলে হাতঘড়ির দিকে তাকাল।

ঘড়িতে তখন সাড়ে চারটে বাজে।

শীতের ছোট বেলা ইতিমধ্যেই ঝিমিয়ে এসেছিল। আলোর তেজও কমতে শুরু করেছিল।

চল—

প্রথমে অনিরুদ্ধ ও তার পশ্চাতে শীলা ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দা পথে এগিয়ে চলল।

রামচরণ চায়ের ট্রে হাতে ঠিক ঐ সময় বারান্দা দিয়ে আসছিল, হঠাৎ সামনে ওদের দুজনকে দেখে যেন থেমে যায়।

বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ওদের দিকে।

ব্যাপারটা রামচরণের কাছে শুধু অভাবিতই নয় আশ্চর্যেরও।

যাদের মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত নেই, তারা সেজেগুজে পাশাপাশি চলেছে, কি ব্যাপার!

অনিরুদ্ধ রামচরণের বোবা দৃষ্টিতে বুঝি একটু অসোয়াস্তিই বোধ করে, তাড়াতাড়ি বলে, চা খাব না, বাইরে খাব। নিয়ে যা।

রামচরণকে কথাগুলো বলে অনিরুদ্ধ আর দাঁড়াল না।

একটু দ্রুতই যেন এগিয়ে গেল।

শীলা তাকে অনুসরণ করে।

কিরীটীও ঠিক ঐ সময় শাশ্বতকে বিদায় দেবার জন্য ঘরের দরজা পথে বারান্দায় বের হয়েছে।

তারও চোখে পড়ে যায় ওরা দুজন।

কিরীটীও রীতিমত বিস্মিত ও চমৎকৃত হয়।

শাশ্বত তো হয়ই।

কিন্তু শীলা বা অনিরুদ্ধ কেউই ওদের দিকে ফিরেও তাকায় না। কতকটা যেন অগ্রাহ্যই করে।

ওদের মোটে দেখতেই পায় নি এই ভাবে ওদের পাশ দিয়ে বারান্দা পথে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চলে যায়।

সিঁড়ি পথে অনিরুদ্ধ আর শীলা মিলিয়ে যেতেই কিরীটী চাপা কণ্ঠে শাশ্বতকে প্রশ্ন করে, সঙ্গে তোমার গাড়ি আছে শাশ্বত?

আছে।

পুলিশের জীপ না তোমার নিজের গাড়ি?

আমার নিজেরই গাড়ি।

ঠিক আছে। এক মিনিট দাঁড়াও, আমি এখনি আসছি—

কিরীটী চকিতে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

মিনিট চার পাঁচের মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে কিরীটী পুনরায় বের হয়ে এলো ঘর থেকে। চার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বেশ বদলে নিয়েছিল সে।

অ্যাশ কলারের গরম গ্রেট কোট গায়ে উঁচু কলারের এবং ফেলট ক্যাপ মাথায়। চোখের চশমাটা ঠিকই ছিল।

এসো।

শাশ্বতকে কোন কথা আর বলবার অবকাশ মাত্র না দিয়ে কিরীটী একটু ব্যস্তভাবেই তাকে নিয়ে সিঁড়ির দিকে যেন এগিয়ে গেল।

শাশ্বতর গাড়িতে উঠবার সময়েই কিরীটী লক্ষ্য করল, পথের এক পাশে একটা ষ্টেশনারী দোকানের সামনে তখনো শীলা আর অনিরুদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে। বোধ হয় ট্যাকসীরই অপেক্ষায়।

ওরা কেউ ওদের লক্ষ্য করে নি।

শাশ্বত গাড়িতে ষ্টার্ট দিয়ে বললে, কোন দিকে যাবো?

আপাততঃ বাজার পর্যন্ত তো তো চল।

বাজারের কাছ বরাবর আসতেই কিরীটী শাশ্বতকে বললে, ঐ রাস্তার বাঁয়ে গাড়িটা পার্ক করো।

কিরীটীর নির্দেশ মতো শাশ্বত গাড়িটা রাস্তার ধারে পার্ক করলো।

কিন্তু তুমি যে বলছিলে কোথায় যেতে হবে তাড়াতাড়ি? প্রশ্ন করে শাশ্বত।

কিরীটী তখন শাশ্বতর পাশে বসে টোবাকো পাউচ থেকে টোবাকো নিয়ে হস্তধৃত পাইপের গহ্বরে ঠাসতে ঠাসতে বললে, সেই জন্যই তো তাড়াতাড়ি এলাম।

শাশ্বত কিরীটীর শেষের কথাটা যেন ঠিক বুঝতে পারে না, তাই ওর মুখের দিকে তাকায়।

কিরীটী আবার বলে, আমি বলা মাত্রই গাড়িতে ষ্টার্ট দেবে, মনে থাকে যেন—

কিরীটীর কথা শেষ হল না। দেখা গেল একটা ট্যাকসী পশ্চাৎ দিক থেকে আসছে। তার ভিতরে বসে অনিরুদ্ধ ও শীলা পাশাপাশি।

ট্যাকসীটা কিছু ব্যবধানে পাশ দিয়ে কলকাতাভিমুখে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় কিরীটী বললে, চল শাশ্বত।

শাশ্বত প্রস্তুত হয়েই ছিল, গাড়ি ছেড়ে দিল।

ঐ যে WBT 678, ঐ ট্যাকসীটাকেই ফলো করে চল শাশ্বত। কিরীটী নির্দেশ দিল।

ট্যাকসীর মধ্যে।

শীলা প্রশ্ন করে, কোথায় যাচ্ছি আমরা?

চাপা বিরক্ত কণ্ঠে জবাব দেয় অনিরুদ্ধ, জাহান্নামে—

শীলা হাসে তার সেই সুন্দর মিষ্টি হাসি। তারপরই বলে, মনে পড়ে অনু, সেটা ছিল হোলির দিন।

অনিরুদ্ধ ওর মুখের দিকে তাকাল।

শীলা অনিরুদ্ধর পাশে একটু যেন আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বলতে থাকে, আগ্রায় বেড়াতে গিয়েছিলাম দুজনে, তাজের চত্বরে ঘুরতে ঘুরতে তুমি বলেছিলে, এই তাজের সামনে দাঁড়িয়ে আজ এই মুহূর্তটিতে তোমাকে পাশে নিয়ে কি মনে হচ্ছে জান শীলা?

অনিরুদ্ধ তাকিয়েই থাকে শীলার মুখের দিকে।

যাকে ভালবাসি তার হাত ধরে স্বর্গে প্রবেশের অধিকার নাই পাই জাহান্নামেই যেতে বুঝি এতটুকু দ্বিধাও হবে না। বলে শীলা।

অনিরুদ্ধ চুপ করে বসে থাকে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ নজরে পড়ল বিরাট একটা সোনার থালার মত পূর্ণিমার চাঁদ আমাদের দুজনার সামনে এসে যেন দাঁড়িয়েছে—

শ্যামবাজারের চৌমাথায় গাড়ি এসে তখন পৌঁছেছে।

ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করে, কোন দিকে যাব?

নয়া রাস্তা ধরে ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে চল। অনিরুদ্ধ বলে।

রেড সিগন্যালের জন্য গাড়ি দাঁড়িয়েছিল, আবার গ্রীন সিগন্যাল পেয়ে চলতে শুরু করেছে তখন।

উদ্দেশ্যহীন ভাবেই যেন অনিরুদ্ধ শীলাকে ট্যাকসীতে নিয়ে ষ্ট্র্যাণ্ড রোড ধরে এদিক থেকে ওদিক অনেকক্ষণ ধরে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াল।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে।

দূরে চৌরঙ্গী আলোর মালা দুলিয়ে যেন লাস্যময়ী হয়ে উঠেছে।

শীলা আবার একসময় প্রশ্ন করে, কোথায় যে যাবে যেন বলেছিলে?

হ্যাঁ যাবো, আর একটু রাত হোক।

॥ ১৩ ॥

ওদিকে আগের ট্যাকসীটাকে ফলো করতে করতে ক্লান্ত শাশ্বত একসময় পাশেই উপবিষ্ট কিরীটিকে বলে, কি ব্যাপার বল তো, ওরা যে তখন থেকে ট্যাকসী নিয়ে কেবল ঘুরছে আর ঘুরছেই—

কিরীটী মৃদুকণ্ঠে বলে, যাবে কোথাও নিশ্চয়ই, তারই প্রস্তুতি চলেছে।

আমরা যে ওদের ঘণ্টা দুই ধরে অনুসরণ করে চলেছি ওরা কি তা টের পেয়েছে কিরীটী?

সন্দেহ করবার যখন কোন কারণ নেই তখন নিশ্চয়ই এদিকে ওদের নজর নেই, স্টার্ট দাও।

গাড়ি ওদের আবার চলতে শুরু করেছে তখন।

সত্যিই কিছুক্ষণ ময়দানের ধারে ট্যাকসী গাড়িটা ওদের থেমে থাকবার পর আবার তখন চলতে শুরু করেছে।

শেষ পর্যন্ত অখ্যাতনামা একটা চীনা হোটেলের সামনে এসে ট্যাকসী থামিয়ে শীলা আর অনিরুদ্ধ নেমে ভাড়া মিটিয়ে দিল।

কিরীটী তাড়াতাড়ি শাশ্বতকে বলে, চট্ করে নেমে গিয়ে ঐ ট্যাকসী-ওয়ালাকে তোমার পরিচয় দিয়ে বলে এসো এইখানেই অপেক্ষা করতে যাতে ওরা হোটেল থেকে বেরিয়ে ওই ট্যাকসীটাই নেয়। আরো বলে দিও কাল যেন সকালে তোমার কাছে গিয়ে থানায় রিপোর্ট করে।

শাশ্বত তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে গেল কিরীটীর নির্দেশ মত।

উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে ঘুরে ট্যাকসীওয়ালা সেদিন ক্রমশই বিরক্ত হয়ে

উঠেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিটারের প্রাপ্য ছাড়াও বেশী কিছু পেয়ে মনটা তার শান্ত হয়।

টাকাগুলো বার দুই গুনে পকেটে রেখে সবে গাড়িতে স্টার্ট দিতে যাবে শাশ্বত এসে ট্যাকসীর দরজার সামনে দাঁড়াল।

চীনা হোটেলটা ঠিক বড় রাস্তার উপরে নয় চৌরঙ্গী অঞ্চলে হলেও একটু ভিতরের দিকে।

কিছুটা নিরিবিলি জায়গায় হোটেলটি হওয়ায় এবং সর্বপ্রকার ড্রিঙ্ক ও আহারের ব্যবস্থা থাকায় বিশেষ এক শ্রেণী নারী পুরুষের প্রতি সন্ধ্যা ও রাত্রিতেই হোটেলটায় ভিড় হয়।

বিশেষ করে রাত্রের দিকে ভিড়টা যেন বেশ জমে ওঠে।

বিরাট একটি হলঘর।

একধারে ডায়াসের উপরে বিলেতী গানের সঙ্গে অর্কেস্ট্রা চলেছে। তারই গা ঘেঁষে প্যানট্রির মধ্যে যাতায়াতের দরজা পথ।

এবং প্যানট্রির দরজার বাঁ দিকে ড্রিঙ্কের কাউন্টার ও ক্যাশ কাউন্টার।

সর্বপ্রকার ব্যবস্থাই আছে হোটেলটির মধ্যে।

নিরিবিলি কিউবিকলস চার পাঁচটি, তার মধ্যে প্রবেশ করলে সম্পূর্ণ নির্জন ও একক পরিবেশ।

সেই রকমই একটা কিউবিক্যালের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল শীলাকে নিয়ে অনিরুদ্ধ।

ওয়েটার এসে সামনে দাঁড়াল।

মেনু কার্ডটা নিয়ে শীলা সুন্দর মিষ্টি হাসি হেসে অনিরুদ্ধর দিকে তাকিয়ে বললে, আজকের ড্রিঙ্কটা আমি তোমার পছন্দ করে দিই অনু—

দাও।

জিন লাইম আর রাম—উইথ হট ওয়াটার। ওয়েটারের দিকে তাকিয়ে বললে শীলা।

তুমি খাবে না? অনিরুদ্ধ প্রশ্ন করে।

আমি কি ড্রিঙ্ক করি নাকি!

কর না?

না। সে এক রাত্রে হোটেলে তুমি একান্ত পীড়াপীড়ি করছিলে বলেই ছোট একটা কোল্ড বিয়ার খেয়েছিলাম। কিন্তু আজ আর নয়।

কেন, ক্ষতি কি! খাও না।

বেশ।

ওয়েটার নির্দেশ নিয়ে চলে গেল।

শীলা!

বল।

আগ্রায় যখন গিয়েছিলাম—রাত্রের সেই হোটেলের কথা মনে আছে তোমার?

কোন বিশেষ কথাটি বলতে চাইছো না বললে বুঝব কি করে?

সোডার বোতল খুলতে গিয়ে সে রাত্রে তোমার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা জখম হয়েছিল—

হ্যাঁ, সে দাগ এখনও মেলায় নি। দেখ,—বলতে বলতে শীলা তার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি অনিরুদ্ধর সামনে এগিয়ে ধরল।

অনিরুদ্ধ দেখল বুড়ো আঙুলের মাঝামাঝি ঠিক লম্বা একটি ক্ষত চিহ্ন শীলার।

শীলা তখন হাসছে অনিরুদ্ধর মুখের দিকে তাকিয়ে, সেই সুন্দর মিষ্টি হাসি।

॥ ১৪ ॥

পরে আদালতে জবানবন্দীর সময় অনিরুদ্ধ বলেছিল, ওর ওই সর্বনাশা হাসি, ওই হাসি যেন সত্যিই আমাকে পাগল করে দিত। ইচ্ছা করত ওর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে কামড়ে খিমচে ওর মুখ থেকে ওই হাসি মুছে দিই চিরদিনের জন্য। কতবার মনে হয়েছে ওকে আমি হত্যা করব, হত্যা করব কিন্তু পারি নি। পারি নি।

কিন্তু যাক সে কথা।

তবে হ্যাঁ, সে রাত্রেও হোটেলে কিউবিক্যালের ছোট্ট ঘনিষ্ঠ পরিবেশের মধ্যে অনিরুদ্ধর মনে হয়েছিল ওর গলাটা ও চেপে ধরে।

ইচ্ছা হচ্ছিল চিৎকার করে বলে, বন্ধ কর, বন্ধ কর তোমার ও হাসি।

কিন্তু পারে নি তা অনিরুদ্ধ।

কেবল সুন্দর হাস্যোদ্দীপ্ত শীলার সুন্দর মুখখানির দিকে ও ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়েই রইল।

ওয়েটার ট্রেতে করে নির্দিষ্ট পানীয় ও কাচের জাগে ঈষোদুষ্ণ গরম জল নিয়ে এল এবং সঙ্গে প্লেটে কিছু সলটেড নাটস্।

ওয়েটার টেবিলের 'পরে পানীয় ইত্যাদি নামিয়ে দিয়ে কিউবিক্যাল থেকে বের হয়ে গেল।

অনিরুদ্ধ গ্লাসের পানীয়ে ইচ্ছামত গরম জল মিশিয়ে চুমুক দেয়।

শীলা কিন্তু বাঁ হাতে গ্লাসটা ধরে প্লেট থেকে একটা একটা করে বাদাম তুলে মুখে দিতে থাকে নিশ্চিন্ত আলস্যে।

কই, খাচ্ছো না যে? অনিরুদ্ধ আড় চোখে শীলার দিকে তাকিয়ে তাকে তাগিদ দেয়।

হ্যাঁ খাবো। আচ্ছা অনি, সেবারে এলাহাবাদে ফিরে গিয়ে আমার জন্মদিনে তুমি যে প্রেজেন্টটি আমাকে পাঠিয়েছিলে নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে?

অনিরুদ্ধ শীলার মুখের দিকে তাকাল।

তুমি লিখেছিলে সেদিন, তুচ্ছ হতেও তুচ্ছতম যা আছে, পাঠাচ্ছি তোমায়—কারণ যতই তুচ্ছ হোক না কেন জগতের চোখে তবু পাঠাতে পারলাম এই ভরসাতেই যে ভালবাসা পরস্পর পরস্পরের কাছে পেয়েছি এর মূল্য জানি সেই নির্ধারণ করে দেবে। সত্যি, সেদিনকার প্রেরিত তোমার সেই ছোট্ট চন্দন কাঠের কিউপিডের মূর্তিটি আজো আমার কাছে অমূল্য হয়েই রয়েছে। দেখবে, সেটা আমি একমুহূর্তের জন্য কাছছাড়া করি না, এখনও আমার সঙ্গে এই বটুয়াতেই রয়েছে—

বলতে বলতে পাশের চেয়ারের উপর থেকে ক্ষণপূর্বে রক্ষিত বটুয়াটা তুলতে উদ্যত হতেই অনিরুদ্ধ তাকে বাধা দিল, থাক। কই, খাচ্ছো না কেন শীলা? খাও—

অনিরুদ্ধর সে কথার জবাব না দিয়ে শীলা বলে, দীর্ঘকাল পরে সেদিন আমাদের প্রথম সাক্ষাতের পর আমার মুখের দিকে তাকিয়েই যে মুহূর্তে তুমি মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আমাকে অস্বীকার করেছিলে সেদিন সত্যিই আমার যেন বুক ফেটে কান্না এসেছিল।

সত্যি নাকি?

হ্যাঁ, কিন্তু আমার তো সেদিন দীর্ঘ ব্যবধানের পরও তোমাকে দেখা

মাত্রই চিনে নিতে কোন কষ্টই হয় নি। তবে তুমি পারলে না কেন আমাকে চিনতে? অ্যাটর্নীর চিঠিতে তোমার পরিচয় ও উইলের নির্দেশ জেনে কি আনন্দই যে সেদিন হয়েছিল আমার। ভেবেছিলাম, এ নিশ্চয়ই সেই প্রেমের দেবতারই ইঙ্গিত।

কই, খাচ্ছ না তো তুমি? আবার তাগিদ জানায় অনিরুদ্ধ।

এবং নিজের গ্লাস ইতিমধ্যে শূন্য হয়ে যাওয়ায় ওয়েটারকে ডেকে আর এক পাত্র নিয়েছিল। সেই দ্বিতীয় পাত্রে চুমুক দিতে দিতে শীলার মুখের দিকে তাকায় অনিরুদ্ধ।

শীলা তখন বলছে, তুমি বলেছিলে দারিদ্র্যকে তুমি ঘৃণা কর, অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত আমাদের বিয়ের কথা তুমি ভাবতেই পার না। তাই তো মিঃ গুহর চিঠি পেয়ে সেদিন মনে হয়েছিল, প্রেমের দেবতা বুঝি এমনি করে ইতিপূর্বে কাউকেই আশীর্বাদ করেন নি।

তারপর?

কত আশা নিয়ে যে সেদিন রওনা হয়েছিলাম—

প্রেমের দেবতার আশীর্বাদই বটে, নচেৎ অমন অকস্মাৎ পথে ট্রেন দুর্ঘটনায় সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়।

অনিরুদ্ধর কণ্ঠস্বরে যেন একটা চাপা ব্যঙ্গের স্বর।

কিন্তু শীলা সেদিকে কোন নজরই দেয় না যেন।

সে বলতে থাকে, দুর্ঘটনা বলে দুর্ঘটনা, এক বছরেরও বেশী একেবারে বেঁচেও মরে রইলাম। অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে সব একেবারে অন্ধকার। কোথায় আমি, কে আমি, কিছুই মনে রইল না। ভাগ্যে সে দিনগুলো স্মৃতির পৃষ্ঠায় ঝাপসা হয়ে গিয়েছে, নচেৎ সত্যিই বোধ হয় পাগল হয়ে যেতাম। তারপর যদিও বা আবার সুস্থ হয়ে এখানে এলাম—তুমি আমার দিক থেকে নিলে মুখ ফিরিয়ে।

কিন্তু এসব কথা কেন বলছ, বলতে পার?

বলব না? ভাব তো এই দেড়টা মাস এখানে আসা অবধি তুমি আমার সঙ্গে কি ব্যবহারটাই না করছ। উঃ, সত্যি, আজ যেন আমার আবার নতুন করে জন্ম হল মনে হচ্ছে।

নতুন করে জন্ম হল? তির্যক্ দৃষ্টিতে তাকাল গ্লাসটা হাতে ধরে অনিরুদ্ধ শীলার দিকে যেন।

নয়? আজ নিশ্চয়ই তোমার সংশয়ের শেষ হয়েছে।

না।

অকস্মাৎ যেন বজ্রপাত হল।

অনিরুদ্ধ—

হ্যাঁ, এতটুকুও নয়। এখনও আমার স্থির বিশ্বাস, আমি যে শীলাকে জানতাম, তুমি সে শীলা নও।

অনিরুদ্ধ! চাপা আর্ত কণ্ঠে ডেকে ওঠে শীলা আবার।

হ্যাঁ, তুমি সে শীলা নও—নও। কথাগুলো শান্ত ধীর কণ্ঠে বলে হাতের গ্লাসটা সামনের টেবিলের 'পরে নামিয়ে রাখল, যেন কিছুই হয় নি এমনি ভাবেই পরমুহূর্তে অনিরুদ্ধ অনুচ্চ কণ্ঠে ডাকল, বোয়—

শীলা যেন কেমন বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে অনিরুদ্ধর মুখের দিকে।

মুখে তার আর সত্যিই যেন কোন কথা জোগায় না।

ওয়েটার এসে কিউবিক্যালের মধ্যে ঢুকল—বিল।

ওয়েটার চলে গেল এবং অদ্ভুত একটা যেন শ্বাসরোধকারী স্তব্ধতার মধ্যে দু'জনে মুখোমুখি বসে রইল।

অতঃ কিম্!

বেয়ারা একটা কাচের প্লেটে বিল এনে রাখল টেবিলের 'পরে নামিয়ে।

পকেট থেকে পার্স বের করে বিলটা চুকিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল অনিরুদ্ধ, তাহলে আমি চললাম।

শীলা কোন জবাবই দিল না সে কথার।

অনিরুদ্ধ সত্যি সত্যিই পরমুহূর্তেই কিউবিক্যালের সুইং ডোর ঠেলে বের হয়ে গেল।

শীলা যেমন বসে ছিল তেমনিই বসে রইল।

কতক্ষণ ঐ কিউবিক্যালের মধ্যে স্থাণুর মত বসে ছিল শীলা নিজেরই তা মনে নেই। হঠাৎ চমক ভাঙল কিরীটীর মৃদু সম্বোধনে।

মিস্ রয়, শীলা দেবী—

কে! মিঃ সিনহা!

ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে শীলা কিরীটীর মুখের দিকে।

ব্যাপারটা যেন তার সমস্ত উপলব্ধি ও বোধগম্যের বাইরে।

চলুন, উঠুন—এখানে আর এভাবে বসে থেকে কি করবেন?

যাব ! কোথায় ?

কেন, বাড়ি !

কিন্তু—

উঠুন। আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

শীলা উঠে দাঁড়াল।

শাশ্বতকে আগেই বিদায় করে দিয়েছিল কিরীটী।

তার উপরে নির্দেশ দিয়েছিল কিরীটী অনিরুদ্ধ বের হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন সে হোটেল থেকে তাকে অনুসরণ করে।

হোটেলের সামনে থেকে একটা খালি ট্যাকসী ডেকে শীলাকে সঙ্গে করে উঠে বসল কিরীটী।

কোথায় যাব ? ট্যাকসী ড্রাইভার শুধায়।

বরাহনগর।

ট্যাকসী থেকে নেমে কিরীটী শীলাকে সঙ্গে করে সোজা এসে তার ঘরে প্রবেশ করল।

বসুন শীলা দেবী।

পথে ট্যাকসীতে এতক্ষণ সমস্ত পথ দুজনার মধ্যে একটি কথাও হয় নি।

শীলা যেন হঠাৎ কেমন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। একেবারে যেন মূক।

পকেট থেকে পাইপটা বের করে তাতে টোবাকো ভরে, অগ্নি সংযোগ করে কিরীটী পুনরায় তাকাল শীলার মুখের দিকে।

প্রস্তরমূর্তির মতই যেন নিঃশব্দে বসে আছে শীলা খোলা জানালা-পথে বাইরের অন্ধকারের দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে।

ঐ মুহূর্তে শীলা যেন ঐ জগতে আর নেই। দূরে, অনেক দূরে তার মন।

॥ ১৫ ॥

কিরীটী আবার ডাকল।

শীলা দেবী !

কোন সাড়া না দিয়ে নিঃশব্দে কেবল মুখটা ঘুরিয়ে তাকাল শীলা তার ডাকে ওর মুখের দিকে।

একটা কথার জবাব দেবেন ?

কি ?

কেন আপনি এখনও মিথ্যে আলেয়ার পিছনে পিছনে ছুটছেন ?

আলেয়া !

কথাটা বলে কেমন কতকটা যেন থতমত খেয়েই শীলা এবারে তাকাল কিরীটীর মুখের দিকে।

নয় ! কেন এখনও আপনি বুঝতে পারছেন না, অতীতে কোন একদিন আপনাকে ঘিরে ওর কোন মোহ বা ভালবাসা থাকলেও—

মিঃ সিনহা—

হ্যাঁ, আজ আর তার কিছুমাত্রও অবশিষ্ট নেই। কিন্তু যাকগে সে কথা। সত্যিই আপনার ভুল হয় নি তো ?

এবার আর কোন জবাব দেয় না শীলা, কেবল ওর দুটি চক্ষু জলে টলটল করে ওঠে।

হুঁ। আপনি তাহলে স্থির নিশ্চিৎ যে উনি আপনার সেই পরিচিত অনিরুদ্ধ বাবুই সত্যি ?

এবারেও শীলা কোন জবাব দেয় না।

আবার বলছি ভাল করে ভেবে দেখুন, ছয় মাস সময়টা বড় কম সময় নয়। পরিণত বুদ্ধি ও মনের ছয় মাসের পরিচয়টা সারা জীবন একজনকে আর একজনের মনে রাখার পক্ষে যথেষ্ট। সত্যিই উনি আপনার সেই অনিরুদ্ধ বাবুই তো ? কোন রকম ভুল হয় নি আপনার ?

তথাপি শীলা নিশ্চুপ।

বেশ। তাই যদি হয় তো উনিই বা আপনাকে চিনতে চাইছেন না কেন ? কেন স্বীকার করছেন না আপনাকে ? কিম্বা আপনাকে স্বীকার না করার পক্ষে ওর কি কোন কারণ বা স্বার্থ থাকতে পারে ?

স্বার্থ !

এতক্ষণে আবার মুখ খুললো শীলা।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাল কিরীটীর মুখের দিকে।

আমার তো মনে হয় সত্যিই যদি আপনাকে উনি চিনতে পেরেছেন অথচ স্বীকার করছেন না তার পিছনে তাহলে নিশ্চয়ই ওর কোন স্বার্থ আছে।

কি স্বার্থ থাকতে পারে ?

সেটা জানতে পারলে তো গোলমালই মিটে যায়। কিন্তু যাক সে কথা,

সুস্থ হবার পরও চার পাঁচ মাস সময় প্রায় আপনি কাশীতে জগৎ বাবুর ওখানেই ছিলেন তাই না ?

হ্যাঁ হ্যাঁ—তা—তা ছিলাম।

কিন্তু কেন বলুন তো ! সুস্থ হয়ে অতীত সব মনে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই কেন সোজা এখানে চলে এলেন না ?

আসি নি—

তাই তো জিজ্ঞাসা করছি কেন আসেন নি ?

আসতে ইচ্ছা হয় নি।

কেন ?

খবরের কাগজে দেখেছিলাম সেই দুর্ঘটনায় নাকি ওর মৃত্যু হয়েছে।

তারপর মৃত্যু যে হয় নি জানলেন কি করে ?

জেনেছিলাম।

কেমন করে জেনেছিলেন ?

একজন আমাকে সংবাদটা দেয়।

কে সে ?

ক্ষমা করবেন মিঃ সিনহা, তার নাম—তার নাম আরার পক্ষে করা সম্ভব নয়।

বেশ। তা যেন হল কিন্তু অনিরুদ্ধবাবু বেঁচে আছেন জানবার পরই বা তার কাছে সর্বাগ্রে চিঠি দিলেন না কেন আপনার সব সংবাদ দিয়ে ?

আমি, মানে আমি তখনও জানতাম না—

কি জানতেন না ?

যে আমার পরিচিত অনিরুদ্ধ আর এই অনিরুদ্ধ একই ব্যক্তি।

জানলেন কবে ?

কলকাতায় এসে মিঃ গুহর অফিসে দেখা করবার পর তার কাছে অনিরুদ্ধর ফটো দেখে।

হুঁ। আচ্ছা শীলা দেবী, নীচের হলঘরে নরহরিবাবুর বোন শৈলবালার যে ফটোটা আছে দেখেছেন ?

না তো !

দেখেন নি ?

না।

কাল একবার ভাল করে দেখবেন।

দেখব।

আর একটা কথা—

বলুন।

অনিরুদ্ধবাবুকে যতটা পারবেন এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করবেন।

এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করব ?

হ্যাঁ, তাতে করে জানবেন আপনার মঙ্গলই হবে। আচ্ছা এবারে আপনি যেতে পারেন।

শীলা ঘর থেকে বের হয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরই রামচরণ এসে ঘরে ঢুকল : বাবু, আপনার ফোন—

কে ফোন করছেন বললে কিছু ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, গুহবাবু—অ্যাটর্নী—

কিরীটী একটু অবাকই হয়, গুহ হঠাৎ এই রাত্রে কি কারণে ফোন করছেন !

ফোন ধরে কিরীটী বলে, সিনহা কথা বলছি। কি ব্যাপার মিঃ গুহ, এত রাত্রে ?

একটা ব্যাপার আপনাকে জানান উচিত ছিল আমার এতদিন।

কি বলুন তো ?

নরহরির ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স ও স্থাবর সম্পত্তি ছাড়াও কিছু মূল্যবান জহরৎ, জুয়েলস্ আছে—

জহরৎ ?

হ্যাঁ, সেগুলো আসলে রামহরির স্ত্রীর সম্পত্তি অর্থাৎ নরহরির মায়ের— হরসুন্দরী দেবীর নিজস্ব সম্পত্তি।

তা সে জহরৎগুলোর কথা নরহরির উইলের মধ্যে কি mention করা নেই ?

না, তাঁর ইচ্ছা ছিল জহরৎগুলোর কথা নূতন আর একটা উইল করে তার মধ্যে বলে যাবেন।

নূতন উইল !

হ্যাঁ, কথাটা অবিশ্যি আমি আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের মুখ থেকেই সর্বপ্রথম একদিন শুনেছিলাম নরহরির মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই যে নরহরিবাবুর নাকি নতুন করে আর একটা উইল করবার ইচ্ছা তার মৃত্যুর মাস কয়েক পূর্বেই হয়েছিল।

তারপর ?

তারপর শেষ পর্যন্ত অবিশ্যি সে উইল করবার আর সময় হয়ে ওঠে নি তাঁর।

আপনার পিতৃদেব কবে স্বর্গত হন ?

নরহরির মৃত্যুর দিন পনেরোর মধ্যেই।

তা এ সব কথা তো আপনি এতদিন আমাকে বলেন নি ?

না, বলি নি, কারণ ঐ প্রসঙ্গের এ ব্যাপারের কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি নি বলেই বলি নি।

তাহলে আজই বা জানাচ্ছেন কেন ?

আমার পার্টনার আপনাকে জানাতে বলেন আজ—

তাই বলছেন ?

তাই।

Thanks! তা যে জহরৎগুলোর কথা বলছিলেন সে জহরৎগুলো কোথায় ? ব্যাঙ্কে কি ?

তা বলতে পারি না। তবে ব্যাঙ্কে যে নেই সেটা জানি।

কোথায় আছে অনুমান করেন ?

খুব সম্ভবত ওই বাড়িরই কোন সিন্দুক বা কিছুতে আছে বলেই আমার ধারণা।

নরহরির মৃত্যুর পর সিন্দুক খোলা হয়েছিল ?

হ্যাঁ, কিন্তু খোঁজ করে দেখি নি তখন, তা ছাড়া খোঁজ করবার কথা সে সময়ে মনেও হয় নি। অনিরুদ্ধ বাবুর সামনেই সিন্দুক থেকে উইলটাই শুধু বের করে নিয়ে সিন্দুকে আবার তালা দিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

সে সিন্দুকটা কোন ঘরে আছে ?

নরহরির শয়ন ঘরে।

সিন্দুকের চাবি কার কাছে ?

নরহরির উইল সংক্রান্ত ব্যাপার ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত আমাদের কাছেই থাকবে।

আচ্ছা নরহরির উইলটা কে লিখেছিলেন ? আপনার বাবা না আপনি ?

বাবাই লিখেছিলেন, তার সঙ্গে অবিশ্যি আমিও ছিলাম।

হুঁ। নরহরির দ্বিতীয়বার উইল করবার কথাটা আপনি জানতেন না ?

না, বাবার মুখেই শুনেছিলাম।

আচ্ছা মিঃ গুহ, কেন নরহরিবাবু উইল বদলাতে চেয়েছিলেন বা দ্বিতীয়বারের উইলের সারমর্ম সম্পর্কে আপনি আপনার বাবার কাছে কোন কথা শুনেছিলেন কি ?

শুনেছিলাম তিনি বলেছিলেন ওই জহরৎগুলো নাকি তিনি শীলাকে দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন সেইজন্যই দ্বিতীয়বার উইল করতে চেয়েছিলেন।

কি রকম ? কথাটা একটু পরিষ্কার করে বলুন।

বিবাহ না হলে অনিরুদ্ধ ও শীলা সম্পত্তি পাবে না বটে তবে অনিরুদ্ধ পাবে মাসিক তিন শত করে টাকা মাসহারা আর শীলার বিবাহ হোক বা না হোক ওই জহরৎগুলো পাবে।

বিচিত্র প্রেম তো !

কী বললেন ?

বলছিলাম নরহরির বিমলার প্রতি প্রেমটা সত্যিই বিচিত্র সন্দেহ নেই।

ফোনের ওপাশ থেকে একটা মৃদু হাসির অস্ফুট শব্দ ভেসে এলো।

এই কথাটা বলবার জন্যই কি ফোন করেছিলেন ?

হ্যাঁ।

ধন্যবাদ।

॥ ১৬ ॥

ঘরে ফিরে এসে সোফাটার 'পরে গা এলিয়ে দিয়ে কিরীটী ভাবছিল, শীলা কি জহরৎগুলোর কথা জানে ? কথাটা জিজ্ঞাসা করার কথা কিরীটীর মিঃ গুহকে কেন মনে পড়ল না !

কথাটা কালই একবার ফোনে গুহকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। কথাটা জানা দারকার।

শীলা।

বিমলার কন্যা শীলা। যে বিমলাকে একদিন নরহরি সরকার ভালবেসেছিল সমস্ত অন্তর দিয়ে সত্যিকারের। এবং যে ভালবাসার সম্মান দিতে গিয়ে সারাটা জীবন সে কৌমার্য রক্ষা করে গিয়েছে।

যদিচ বিমলা তাঁর সেই ভালবাসার সম্মান রক্ষা করে নি।

অক্লেশেই আর একজনের গলায় মালা দিয়েছিল।

তথাপি আশ্চর্য বিমলার প্রতি নরহরির সেই ভালবাসার কোন তারতম্য

ঘটে নি। সারাটা জীবন অবিবাহিত তো থেকেই গিয়েছে, তারপর নিজের সম্পত্তিই নয় শুধু, নিজের হাতে সেই বিমলারই কন্যার অধিকারটাকে কায়েমী করবার জন্য একমাত্র ভাগ্নের বধূ তাকেই নির্বাচন করে রেখে গিয়েছে।

এবং কেবলমাত্র নির্বাচনই নয়, এমন ভাবে তাঁর সমস্ত সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা করে রেখে গিয়েছে, যার ফলে তার সেই সুবিপুল সম্পত্তির লোভকে এড়িয়ে গিয়ে তাঁর নির্বাচনকে অস্বীকার করাও একপ্রকার সাধারণ মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য।

কিন্তু বিমলার কন্যা শীলা কি সত্যিই সেই সৌভাগ্যের ন্যায্য অধিকারিণী?

প্রশ্নটা কিরীটীর মনের মধ্যে বার বারই আনাগোনা করতে লাগল।

শীলার চরিত্র ও ব্যবহার দুর্বোধ্য নিঃসন্দেহে।

প্রথমত সে রাত্রের সেই কালো চাদরে আবৃত রহস্যময় পুরুষটি কে যে সে রাত্রে নিঃশব্দে চোরেরই মত লুকিয়ে শীলার শয়ন ঘরে গিয়ে প্রবেশ করেছিল!

যার সঙ্গে কথাবার্তায় স্পষ্টই বুঝা যায় যে সেই রহস্যময় পুরুষের যে পরিচয়ই থাক, শীলার তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে।

তারপর অনিরুদ্ধ।

অনিরুদ্ধর সঙ্গে একদা শীলার ঘনিষ্ঠতা ছিল, এমন কি বিবাহের কথা-বার্তাও হয়েছিল উভয়ের মধ্যে, অথচ আজ অনিরুদ্ধ শীলাকে স্বীকৃতি দিচ্ছে না।

কেন?

বাইরে পদশব্দ শোনা গেল বারান্দায়।

মুহূর্তকাল কান পেতে থেকেই কিরীটী বুঝতে পারে সে পদশব্দ কার

অনিরুদ্ধর পদশব্দ।

তাড়াতাড়ি কিরীটী ঘর থেকে বের হয়ে আসে বারান্দায়।

বারান্দার আলোয় দেখতে পায় অনিরুদ্ধই এগিয়ে আসছে।

অনিরুদ্ধও কিরীটীকে তার ঘরের দরজায় দেখতে পেয়েছিল।

সেই প্রথমে কথা বলে, মিঃ সিনহা—

অনিরুদ্ধবাবু, আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিল, যদি অনুগ্রহ করে আমার ঘরে একটু আসতেন।

মুহূর্তকাল যেন দাঁড়িয়ে অনিরুদ্ধ কি ভাবল। তারপর মৃদু কণ্ঠে বললে, বেশ চলুন।

দুজনে এসে ঘরে প্রবেশ করতেই কিরীটী বলে, বসুন—

অনিরুদ্ধ একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

আপনাকে কয়েকটা পুরানো প্রশ্ন আবার করতে চাই অনিরুদ্ধবাবু।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল অনিরুদ্ধ কিরীটীর মুখের দিকে, কি প্রশ্ন?

শীলা দেবী সম্পর্কে।

ভ্রু-দুটো কুঞ্চিত হল অনিরুদ্ধর।

আচ্ছা অনিরুদ্ধবাবু, আপনি স্থির নিশ্চিৎ যে উনি সত্যিকারের শীলা দেবী নন?

নিশ্চয়ই। সে কথা তো অন্তত হাজারবার আপনাদের সকলকে বলেছি কিন্তু আমার সে কথা তো আপনারা বিশ্বাসই করছেন না।

কিরীটী মৃদু হেসে বলে, দেখুন কথাটা তাহলে আপনাকে খুলেই বলি অনিরুদ্ধবাবু, আপনার কথাটা বিশ্বাস যে একেবারে করি না তা নয়, তবে—

সত্যি সত্যি আপনার তাহলে বিশ্বাস হয়েছে এতদিনে যে ও আসল শীলা নয়? উৎফুল্ল আগ্রহে প্রশ্নটা করে কিরীটীকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অনিরুদ্ধ।

তা কিছুটা করেছি যে না—অস্বীকার করলে সেটা মিথ্যাই বলা হবে কিন্তু শুধু বিশ্বাস এখন করলেই তো হবে না, প্রমাণ করতে হবে তো ব্যাপারটা।

প্রমাণ!

হ্যাঁ, প্রমাণ করতে হবে।

কিন্তু এর মধ্যে প্রমাণ করাকরির কি আছে বলতে পারেন?

তা বললে কি হয়, আপনি যে interested party—

মানে? এতে আমার interestটা কোথায় মশাই। বরং না বিয়ে করলে সত্যিকারের ক্ষতিগ্রস্ত তো আমিই হব, ও নয়।

তা ঠিকই বলেছেন, তবে—

তবে আবার কি?

তা একটু আছে বইকি।

কী রকম?

আপনি আজ বিবাহ ওকে না করলেও তেমন কি খুব একটা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন আপনি?

কী বলছেন ?

ঠিকই বলছি কারণ আপনি তো ইতিপূর্বেই প্রায় দুই লক্ষাধিক টাকার শেয়ার কিনে বসে আছেন দুই তিনটি প্রফিটেবেল কনসার্নের—যার থেকে বছরে ত্রিশ হাজার টাকা ডিভিডেণ্ট অনায়াসেই আপনি পাবেন। তার উপরে ফাউ হিসাবে মাসে তিনশো টাকা করে—

কিরীটীর কথায় মুহূর্তের জন্য যেন অনিরুদ্ধর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরমুহূর্তেই সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, মামার যে সম্পত্তির পরিমাণ তার কাছে ওই সোয়া দু লক্ষ টাকা তো সমুদ্রের কাছে গোষ্পদ, অতএব—

মৃদু হেসে শান্ত কণ্ঠে কিরীটী বলে, না, এর মধ্যে কোন অতএবই নেই অনিরুদ্ধবাবু, মাত্র তিনশো টাকার মাহিনার যে চাকরি করছে এতদিন তার কাছে ওই টাকা তো বলতে পারেন রাজার সম্পত্তি।

রাজার সম্পত্তি !

তা বইকি।

আপনি দেখছি পাগল।

পাগল আমি নই অনিরুদ্ধবাবু, পাগল আপনিই কারণ আপনি যে আকাশকুসুমের স্বপ্ন দেখছেন জানবেন সেটা একটা দুঃস্বপ্ন ব্যতীত কিছুই নয়।

আকাশকুসুমের স্বপ্ন দেখছি ?

হ্যাঁ।

কি বলছেন ! আপনার কথাটা তো ঠিক বুঝতে পারলাম না।

না বুঝতে পারার মত তো কিছু নেই। শুনুন মিঃ ঘোষ, চিত্রাভিনেত্রী মন্দিরা চ্যাটার্জী আজ আপনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন আপনার রূপের মোহে নয়, নরহরির সুবিপুল সম্পত্তির একমাত্র ওয়ারিশন আপনি সেই আশাতেই—বা বলতে পারেন সেই সম্পত্তিরই মোহে, কিন্তু তিনি কি আপনার মামা নরহরিবাবুর উইলের শর্তগুলো জানেন ?

কে—কে বললে আপনাকে এসব গল্প-কথা !

আপনার কথাতেই জবাব দিই কারণ শেষ পর্যন্ত হয়তো আপনার পক্ষে সবটা গল্প-ব্যাখ্যাতেই দাঁড়াবে। তাকে বিয়ে করে তার সম্পত্তি আপনি যে আপনার টাকার সঙ্গে যোগ দেবেন কল্পনা করে রেখেছেন—সে মেয়ে এত বোকা নয় জানবেন। সে আসল এবং জাত অভিনেত্রী। তার কাছে প্রেমের চাইতে রূপচাঁদের মূল্য ঢের বেশী।

হঠাৎ যেন স্থান কাল পাত্র ভুলে কিরীটীর শেষের কথায় চিৎকার করে ওঠে অনিরুদ্ধ, সে যে আমাকে কথা দিয়েছে—

কি কথা দিয়েছে? বিয়ে করবে আপনাকে?

হ্যাঁ।

কিন্তু কবে?

এ ব্যাপারের একটা মীমাংসা হয়ে গেলেই—

ঠিক বলেছেন, মীমাংসা একটা হয়ে গেলেই? তাহলেই বুঝতে পারছেন আপনি নিজে থেকে না বললেও তিনি উইলের শর্তের সংবাদ পেয়েছেন এবং রাখেনও। কিন্তু যাক সে কথা, বিয়ে করেন তিনি আপনাকে ভালই, কিন্তু একটা কথা হয়তো এখনও আপনি জানেন না—

কি? কি কথা?

শীলা দেবী কাল বলেছেন—

॥ ১৭ ॥

কী? কী বলেছেন?

আপনার Identity সম্পর্কে আজ তিনিও সন্দিহান।

কী! কী বললেন?

তাই তিনি বলেছেন—

মিথ্যা কথা। তা ছাড়া বললেই অমনি হল? তার কথা বিশ্বাস করছে কে?

আপনার কথাও তো পুলিস বিশ্বাস করছে না। থাক্, আপনাকে আর বেশীক্ষণ আটকে রাখব না। আর কেবল একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

কী?

আপনি যখন প্রেসিডেন্সীতে পড়তেন আপনার একজন সহপাঠী ছিলেন।

কে?

কিরীটী রায়।

কে! কি নাম বললেন!

কিরীটী রায়। মনে পড়ছে নিশ্চয় আপনার সেই বন্ধু সহপাঠীর কথা।

হ্যাঁ, মনে পড়ছে বইকি।

তা তো মনে থাকবারই কথা। তা তিনি যে আজ সন্ধ্যায় আপনার খোঁজে এখানে এসেছিলেন।

আমার! আমার খোঁজে!

হ্যাঁ, এবং বলে গেছেন কাল সন্ধ্যার সময় আবার তিনি আসবেন।

ও! তা—

আচ্ছা, আর আপনাকে ধরে রাখব না। আপনি এবারে যেতে পারেন।

ঠিক সঙ্গেই সঙ্গেই নয়, একটু পরে যেন ক্লান্ত শ্লথ পদবিক্ষেপে অনিরুদ্ধ ঘর থেকে বের হয়ে গেল। তারপর অনিরুদ্ধর জুতোর শব্দটাও ক্রমশঃ এক সময় বাইরের বারান্দায় মিলিয়ে গেল।

কিরীটী এবারে নিঃশব্দে উঠে তার নিজের ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল।

কুটিল সন্দেহকে মনের গভীর থেকে টেনে এনে হিংস্র বীভৎস মূর্তিতে সে চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

অতএব আজকের এই রাতটার জন্য কিরীটী অনিরুদ্ধ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত।

ঘরের আলো নিভিয়ে দিল।

সত্যিই অতঃপর নিশ্চিন্তে কিরীটী এসে শয্যায় আশ্রয় নিল।

শয্যায় শুয়ে রেডিয়াম ডায়েল দেওয়া হাত ঘড়িটার দিকে একবার তাকাল। রাত্রি সোয়া বারোটা।

মধ্যরাত্রি।

নিশ্চিন্ত হয়ে শয্যায় শুয়েছিল বটে কিরীটী কিন্তু শেষ পর্যন্ত শুয়ে থাকা তার হলো না। হঠাৎ একটা কথা—একটা সম্ভাবনা মনের মধ্যে জাগ্রত হওয়ায় আরো মিনিট পনের পরেই নিঃশব্দে কিরীটী শয্যা থেকে নামল। এবং নিঃশব্দেই ঘরের দরজা খুলে বারান্দায় বের হয়ে গেল।

বারান্দায় বের হয়ে সর্বাগ্রে কিরীটী বারান্দার আলোটা সুইচ টিপে নিভিয়ে দিল।

অন্ধকার।

কিছুক্ষণ কান পেতে তারপর দাঁড়িয়ে রইলো কোন শব্দ কোথায়ও থেকে আসছে কিনা শোনবার জন্য। না। কোন শব্দ নেই।

এবারে নিঃশব্দে পা টিপে টিপে কিরীটী অগ্রসর হলো অনিরুদ্ধর ঘরের দিকে।

অনিরুদ্ধর ঘরের দরজা বন্ধ। কান পেতে দরজার গায়ে কোন শব্দ ঘরের মধ্যে শুনতে পাওয়া যায় কিনা শোনবার চেষ্টা করলো।

কোন শব্দ নেই। অগ্রসর হলো এবারে কিরীটী শীলার ঘরের দিকে।

শীলার ঘরের দরজা বরাবর আসতেই অনিরুদ্ধর চাপা কণ্ঠস্বর কানে এলো কিরীটীর ভিতর থেকে।

কিরীটী মনে মনে না হেসে পারল না, বিচিত্র মানুষের ঈর্ষা বস্তুটা, এত তাড়াতাড়ি সেটা কাজ করেছে তাহলে, কান পাতল কিরীটী বন্ধ দরজার গায়।

অনিরুদ্ধ বলছে, যেতে তোমাকে হবেই। তুমি যত টাকা চাও শীলা, তোমাকে আমি দেবো।

টাকা!

হ্যাঁ, দশ হাজার, পনের হাজার, বিশ হাজার—যা চাও—

টাকা তো আমি চাই না। শান্ত নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব এলো।

টাকা চাও না!

না।

তবে কিসের আশায় এখানে পড়ে আছ শুনি?

মৃদু কণ্ঠস্বর শোনা গেল শীলার আবার, সে তুমি বুঝবে না অনিরুদ্ধ। না না—তুমি আমাকে এখান থেকে যেতে অনুরোধ করো না। যেতে আমি পারবো না।

যেতে তোমাকে হবেই।

না না না।

শোন শীলা, এই শেষবারের মতো তোমাকে আমি বলছি, যেতে তোমাকে হবেই—

না, কিছুতেই না।

তুমি যাবে না?

অনিরুদ্ধবাবু প্লিজ—শোন—

কাকুতি ঝরে পড়ে শীলার কণ্ঠ থেকে।

না, না—

শোন, কেন তুমি বুঝতে পারছে না সব।

শীলা।

তুমি, তুমি অন্ধ!

কান্নায় গলার স্বর বুজে আসে শীলার।

শোন, ন্যাকামী রাখো। আটচল্লিশ ঘণ্টা তোমাকে আমি সময় দিচ্ছি, এর মধ্যে তোমাকে এখান থেকে জেনো চলে যেতে হবে। যদি না যাও—

কী? থামলে কেন বল?

যাতে তুমি যেতে বাধ্য হও সেই ব্যবস্থাই জেনো আমি করবো। শোন, কাল আবার এই সময় আমি আসবো তোমার জবাব শুনতে।

কিরীটী আর দাঁড়ায় না; দরজায় গোড়ায় চকিতে বারান্দার অপর প্রান্তে সরে যায়।

একটু পরেই দরজা খোলার শব্দ কানে এলো।

॥ ১৮ ॥

পরের দিন বেলা দশটা নাগাদ শাশ্বত এসে কিরীটীর ঘরে ঢুকল।

কিরীটী এক জোড়া তাস নিয়ে পেসেন্স খেলছিল।

মুখ না তুলে তাস খেলতে খেলতেই বললে, এসো শাশ্বত, কি খবর?

এলাহাবাদের পুলিশ রিপোর্ট এসেছে।

এসেছে? কি লিখছে ওরা?

কিছু Interesting ব্যাপার আছে রিপোর্টের মধ্যে।

তাই নাকি!

হ্যাঁ।

কি রকম?

আজ থেকে প্রায় আঠার মাস আগে এই অনিরুদ্ধ ঘোষ—

সঙ্গে সঙ্গে কিরীটী শাশ্বতর মুখের দিকে উৎসুক, সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়, কী?

'জুয়েল অফ্ ইণ্ডিয়া' ইনসিওরেন্স কোম্পানীর একজন এজেণ্ট ছিল অনিরুদ্ধ জান তো?

তা তো জানি—

একজন মৃত্যুপথযাত্রী টি. বি. রোগীর নামে এক লক্ষ টাকার একটা কেস করে অনিরুদ্ধ। এবং প্রথম প্রিমিয়াম দেওয়ার পর দ্বিতীয় প্রিমিয়াম due হবার দিন ২০ আগেই লোকটা মরে যায়।

হুঁ। তারপর? লাইফ ইনসিওরেন্সের টাকাটা realised হয়েছিল?

হয়েছিল। যদিচ কোম্পানী সন্দেহ করে যথাসাধ্য investigation করে। কিন্তু কোন কিছুরই কিনারা করতে পারে নি সে ব্যাপারের আজ পর্যন্ত।

তারপর

ব্যাপারটা আপনা থেকেই শেষ পর্যন্ত চাপা পড়ে যায়। কিন্তু মাস চারেক আগে অনুরূপ আর একটি life case হলো কোম্পানীর—

এবারেও অনিরুদ্ধই করেছিল বোধ হয় ?

হ্যাঁ—

কোথায় ?

এবারে আর এলাহাবাদে নয়, কোলকাতায়।

বল কি, তাহলে এখানে আসার পরও অনিরুদ্ধবাবু ইনসিওরেন্সের চাকরিটা চালিয়ে যাচ্ছিল বলতে চাও!

তাই তো দেখছি।

Funny ! তারপর ?

এবারে দুটো premium দেবার পর গত মাসে ভদ্রলোক Railway accident-এ মারা গিয়েছেন।

Railway accident-এ ?

হ্যাঁ, কিন্তু এবারেও investigation চলেছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন কিনারাই করতে পারে নি—বলে ব্যাপারটা আমাদের হাতে এসেছে গতকাল মাত্র।

কথাগুলো বলে শাশ্বত কিরীটীর দিকে তাকাল।

॥ ১৯ ॥

কিরীটী তখন চেয়ার থেকে উঠে ঘরের মধ্যে নিঃশব্দে পায়চারি করছিল।

বর্তমান রহস্যের মধ্যে যে হারানো সূত্রটি কিছুতেই কিরীটী খুঁজে পাচ্ছিল না সেই সূত্রটিই যেন কিরীটীর মনের মধ্যে ওই মুহূর্তে উঁকি দেয়।

কি জানি আজ সকালে হঠাৎ মনে হল ব্যাপারটা তোমাকে জানান দরকার। তাই চলে এলাম।

ভালই করেছ। It is important কিরীটী মৃদু কণ্ঠে কথাটা বলে পুনরায় পায়চারি করতে লাগল।

তোমাকে যেন একটু চিন্তিত মনে হচ্ছে কিরীটী ?

শাশ্বতর প্রশ্নের কোন জবাব দিল না কিরীটী, যেমন পায়চারি করছিল তেমনিই পায়চারি করতে লাগল।

প্রায় মিনিট কুড়ি বাদে কিরীটী শাশ্বতর মুখের দিকে তাকিয়ে ডাকল, চৌধুরী—

বল।

তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।

বল।

এখনি 'জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া'র অফিসে একবার যেতে হবে।

'জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া'র অফিসে!

হ্যাঁ, সেখানে গিয়ে জেনারেল ম্যানেজারকে বলবে আজই বেলা ৩টা থেকে ৩॥•টার মধ্যে যেন অতি অবিশ্যি অনিরুদ্ধকে অফিসে তিনি ডেকে পাঠান জরুরী অফিসের কাজের কথা বলে।

কিন্তু—

আঃ, যা বলছি যাও এখুনি গিয়ে কর। আর দেরি করো না। হ্যাঁ, তুমি যাবে সেখানে ঠিক আড়াইটায়।

বশ।

যাও, আমিও ঠিক আড়াইটায় যাচ্ছি সেখানে—যাও, আর দেরি কর না। ওঠ।

শাশ্বতকে যেন একপ্রকার ঠেলেই কিরীটী ঘর থেকে বের করে দিল।

সেই দিনই ঠিক বেলা দুটোয় গিয়ে হাজির হল কিরীটী 'জুয়েল অফ্ ইণ্ডিয়া' ইনসিওরেন্স অফিসের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ আয়ারের ঘরে।

মিঃ আয়ার ঘরেই ছিলেন। কিরীটী মিঃ আয়ারের কাছে ডি, সির একটি পরিচয় পত্র তার সম্পর্ক নিয়ে এসেছিল সঙ্গে করে সেটি পেশ করল।

মিঃ আয়ার কিরীটীকে বসতে বলে চিঠিটা খুলে পড়লেন।

আপনিই মিঃ রায়?

হ্যাঁ—

বলুন কি ভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি। ডি. সি লিখেছেন আপনি আমাদের কেসটা সম্পর্কে তদন্ত করতেই এসেছেন—

হ্যাঁ। আপনি অনিরুদ্ধবাবুকে আসবার জন্য ফোন করেছিলেন।

হ্যাঁ, হোটেলে তখন তিনি ছিলেন না অবিশ্যি—

হোটেলে! অনিরুদ্ধবাবু কি হোটেলে থাকেন নাকি!

হ্যাঁ, সিটাডেল হোটেলেই তো তিনি এলাহাবাদ থেকে আসা অবধি গত দেড় বৎসর আছেন।

I see ?

কিরীটীর বুঝতে আর কিছুই বাকী থাকে না। অনিরুদ্ধর উইল সংক্রান্ত ব্যাপারটা তাহলে মিঃ আয়ার কিছুই জানেন না।

কিন্তু চোখ মুখের কোন রকম হাবে ভাবে কিছুই কিরীটীর প্রকাশ পায় না। সে কেবল বলে, তাহলে কি মিঃ ঘোষের সঙ্গে contact করতে পারেন নি ?

পেরেছি।

পেরেছেন ?

হ্যাঁ, হোটেলের ম্যানেজারকে আমি মেসেজটা মিঃ ঘোষকে দিয়ে দিতে বলেছিলাম, তিনি দিয়েছেন এবং একটু আগেই মিঃ ঘোষ ফোনে আমাকে জানিয়েছেন তিনি আসছেন।

তাহলে আসছেন তিনি!

হ্যাঁ।

কিরীটী যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়।

কিরীটী এবারে নিশ্চিন্ত মনে তার প্ল্যানটা বুঝিয়ে দিল মিঃ আয়ারকে কি করতে হবে না হবে অতঃপর।

ইতিমধ্যে ঘড়িতে আড়াইটা বাজতেই শাশ্বত এসে ঘরে ঢুকল।

শাশ্বতর সঙ্গে মিঃ আয়ারের ওই দিনেই পূর্বে আলাপ হয়েছিল। তিনি শাশ্বতকে সাদরে আহ্বান জানালেন, বসুন মিঃ চৌধুরী—

শাশ্বত বসতেই কিরীটী তাকে বলল, তোমাকে যেমন যেমন বলে এসেছিলাম সব ব্যবস্থাই করেছ তো ?

করেছি।

মিঃ আয়ার—

বলুন।

আজ তো শনিবার আপনাদের, অফিস কটায় বন্ধ হচ্ছে ? কিরীটী প্রশ্ন করে।

আড়াইটায়।

এমন সময় বেয়ারা এসে ঘরে ঢুকল। হাতে একটা স্লিপ নিয়ে।

স্লিপটার দিকে দৃষ্টি দিয়েই মিঃ আয়ার কিরীটীকে বললেন, অনিরুদ্ধবাবু এসেছেন—

এসেছে! ঠিক আছে। আমরা তাহলে আপনার অ্যান্টিরুমে চললাম, যেমন যেমন আপনাকে বলেছি আপনি করবেন।

ঠিক আছে—

এস শাশ্বত। ওকে তাহলে ডেকে পাঠান।

শাশ্বতকে নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করল কিরীটী।

অ্যান্টিরুম ও অফিস রুমের মধ্যবর্তী দরজার গায়ে একটা চৌকো কাচ বসান।

কিরীটী পাশের ঘরে এসে দরজার সেই কাচ পথে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল।

মিনিট দুয়েকের মধ্যেই অনিরুদ্ধ এসে মিঃ আয়ারের ঘরে ঢুকল।

আমাকে ডেকেছিলেন কেন মিঃ আয়ার?

অনিরুদ্ধর কণ্ঠস্বরে একটা ঔৎসুক্যই নয়—উত্তেজনাও ছিল বুঝি।

বসুন মিঃ ঘোষ—হ্যাঁ, ভাল কথা। আপনি একটা গুড্ নিউজ তো এতদিন আমাকে দেন নি।

গুড নিউজ! বিস্মিত অনিরুদ্ধ ম্যানেজারের মুখের দিকে তাকাল।

হ্যাঁ, you are going to be very soon a multimillionaire—লাখপতি!

লাখপতি! কি বলছেন মিঃ আয়ার?

নিশ্চয়ই। You have inhereted a fortune!

ও। হ্যাঁ, খবরটা অবিশ্যি জানাতামই আপনাকে একদিন—ব্যাপারটার মধ্যে একটা গোলমাল আছে তাই—

গোলমাল! কিসের গোলমাল?

সবই একদিন আপনাকে আমি বলব মিঃ আয়ার। তবে—

অনিরুদ্ধর কথাটা শেষ হল না, পাশের ঘরের দরজাটা ঠেলে কিরীটী এসে আয়ারের ঘরে ঢুকল অকস্মাৎ।

অনিরুদ্ধ!

কে? চকিতে মুখ ফেরায় কিরীটীর দিকে অনিরুদ্ধ।

আপনি, আপনাকে তো আমি—

আপনি নয়। বল তুমি, চিনতে পারছ না আমাকে তুমি কিন্তু আমি তোমাকে দেখেই চিনেছিলাম—প্রেসিডেন্সীতে এক সঙ্গে আমরা পড়েছিলাম। আমার নাম কিরীটী রায়।

কিরীটী!

হ্যাঁ, কিরীটী। তোমার বাঁ হাতের কব্জীর নীচে ভিতরের দিকে একটা কাটা দাগ আছে, দেখ। যেবার আমাদের ইউনিভারসিটিতে চন্দ্রগুপ্ত প্লে হয় সেবারে স্টেজে বেরুবার সময় উইংসের একটা পেরেকে খোঁচা লেগে গভীর একটা ক্ষত হয়েছিল।

মন্ত্রমুগ্ধের মতই যেন কিরীটীর কথায় অনিরুদ্ধ নিজের বাঁ হাতটা তুলে দেখল, সত্যি দাগটা আছে। একটা দেড় ইঞ্চি পরিমাণ ক্ষত চিহ্ন।

কিন্তু অনিরুদ্ধ, তোমার ডান হাতে কি হল? ডান হাতটা তোমার অকর্মণ্য হল কি করে? ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টে তাই না?

হ্যাঁ।

ঠিক ওই সময় বন্ধ দরজাটা খুলে গেল।

বেয়ারা এসে ঘরে ঢুকল। হাতে তার একটা শ্লিপ।

শ্লিপটা দেখে কিরীটীর দিকে এগিয়ে দিলেন মিঃ আয়ার।

কিরীটী শ্লিপটার উপর চোখ বুলিয়ে অনুচ্চকণ্ঠে ডাকল, মিঃ চৌধুরী, বের হয়ে আসুন, সার্জেন্ট স্মিথ এসেছে।

শাশ্বত পাশের ঘর থেকে বের হয়ে এল।

শাশ্বতর হাতে শ্লিপটা তুলে দিল কিরীটী।

শ্লিপটা দেখে শাশ্বত বলল, কি করব? এ ঘরেই নিয়ে আসব তো?

হ্যাঁ, নিয়ে এস।

শাশ্বত ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কিরীটী আবার উপবিষ্ট অনিরুদ্ধর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, তাহলে ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টেই তোমার ডান হাতটা জখম হয়েছে?

হ্যাঁ—

কিন্তু সেদিন তো তুমি সে ট্রেনে আদপেই আস নি অনিরুদ্ধ?

কি বললে?

বলছিলাম সেই ট্রেনে তুমি চেপেছিলে বটে, তবে—

তবে ?

মোগলসরাইতে নেমে গিয়েছিলে।

মিথ্যা কথা।

না। মিথ্যা নয়। নিষ্ঠুর সত্য। আর—

কিরীটীর কথা শেষ হল না। প্রথমে শাশ্বত ও তার পশ্চাতে যে এসে ঘরে প্রবেশ করল তাকে দেখে মিঃ আয়ার ও অনিরুদ্ধ যেন দুজনাই চমকে ওঠে।

মিঃ আয়ার বলে ওঠেন, what this ! এ কি ব্যাপার মিঃ রায় !

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, দুজনকেই হুবহু একই রকম দেখতে তো। হ্যাঁ—তাই। এবং এদের মধ্যে একজন আসল, আদিম ও অকৃত্রিম অনিরুদ্ধ, অন্যজন ছদ্মবেশী অনিরুদ্ধ—আসল নাম তরুণ বসু।

তরুণ বসু ! মিঃ আয়ারের বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটে নি বুঝি।

হ্যাঁ, তরুণ বসু। উনি একজন শিল্পী। মানে নাট্যকার, নট ও নাট্য পরিচালক।

আসল ও নকল দুই অনিরুদ্ধ—অর্থাৎ অনিরুদ্ধ ও তরুণ বসু তখন দুজনে দুজনের দিকে নিঃশব্দে ফ্যাল ফ্যাল করে বোকার মতই চেয়ে আছে।

আর শুধু তাই নয় দুজনারই ডান হাতের ব্যাপারটা ভেক্।

ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে আবার বলে কিরীটী।

ভেক্ ! এবারে কথা বললে শাশ্বত।

তাই শাশ্বত—ভেক্। অভিনয়—কারোরই হাত ভাঙা নয়। আসল অনিরুদ্ধ এককালে অভিনয় করত—তাই বোধ হয় তার পক্ষে ঐ ভাবে অভিনয় করাটা তেমন একটা কিছু দুঃসাধ্য হয় নি। তবে আমাদের ঐ ছদ্মবেশী অর্থাৎ নকল অনিরুদ্ধ—

কিরীটীর মুখের কথা শেষ হল না, হঠাৎ যেন বাঘের মতই অনিরুদ্ধ তরুণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, You scoundrel ! তুমি, তুমিই সব ফাঁস করে দিয়েছ ; I—I will kill you.

॥ ২১ ॥

দুজনে দুজনকে জাপটে ধরে মেঝের উপর গড়িয়ে পড়ল।

ঘটনার আকস্মিকতায় কিরীটী বুঝি ক্ষণেকের জন্য বিহ্বল বিমূঢ় হয়ে

গিয়েছিল, কিন্তু ওরা জড়াজড়ি করে গড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় কিরীটী সার্জেণ্ট স্মিথের সাহায্যে ওদের পরস্পরকে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দুজনকে টেনে তুলে দুটো চেয়ার বসিয়ে দিল।

তারপর শাশ্বতর দিকে তাকিয়ে কিরীটী বল্লে, শাশ্বত, এবারে তোমার গাড়ি থেকে শীলাকে নিয়ে এস এঘরে।

শাশ্বত ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

তরুণ আর অনিরুদ্ধ তখন পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রুদ্ধ বিষ সর্পের মতই ভিতরে ভিতরে যেন ফুঁসছে।

কিরীটী মৃদু হেসে তরুণের দিকে তাকিয়ে বললে, তরুণবাবু, আপনিও আমাদের অনিরুদ্ধর মত ভাল একজন অভিনেতা কি না জানি না বটে তবে একথাটা নিশ্চয়ই স্বীকার করব—You also done your job perfectly well! হ্যাঁ, আপনার অনিরুদ্ধর অভিনয়ও সত্যিই চমৎকার হয়েছে কিন্তু আপনি সকলের চোখে ধুলো দিতে পারলেও আমার চোখে ধুলো দিতে পারেন নি কারণ আপনি হয়তো জানেন না, দুর্ভাগ্যই বলুন আর সৌভাগ্যই বলুন আসল অনিরুদ্ধ ছিল এককালে আমার ছাত্র-জীবনে সহপাঠী। এবং আমি কিছু দিন একবার কাউকে দেখলে জীবনে কখনও তাকে চিনতে ভুল করি না। হ্যাঁ, প্রথম দিনেই বুঝেছিলাম তাই, আপনি আসল অনিরুদ্ধ নন। শুধু আমি কেন, তা ছাড়া শাশ্বত, তোমারও ব্যাপারটা বুঝতে হয়তো কষ্ট হত না যদি একটু চোখ মেলে তুমি থাকতে।

শাশ্বত সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

কিরীটী বলতে লাগল, তাই। নরহরি বাবুর বাড়িতে তার শয়ন ঘরে একটা ফটো আছে। নরহরিবাবু তার বোন শৈলবালা দেবী—ওদের বাবা ও মার। সেই ফটোয় শৈলবালা দেবীর যে চেহারা আছে সেটা ভাল করে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারতে—ফটোর সেই শৈলবালার মুখের সঙ্গে আমাদের নকল অনিরুদ্ধ বাবুর মুখের সামঞ্জস্য নেই।

সত্যি নাকি! প্রশ্ন করে শাশ্বত।

হ্যাঁ, তরুণ বাবু ও অনিরুদ্ধ বাবুর চেহারার সঙ্গে যতই মিল থাক সে মিলের মধ্যেও সত্য ও মিথ্যার মত কিছু গরমিলও আছে বৈকি।

কা বল তো?

উভয়ের কপাল, নাক ও চিবুকের গঠন। অনিরুদ্ধ বাবুর মুখের গঠন

অবিকল তার মায়ের মত। অর্থাৎ শৈলবালা দেবীর মত। ছোট কপাল, ছড়ান নাক ও ধারাল চিবুক। আর বিশেষ ও অনন্য যে মিলটি মা ও ছেলের মুখের সঙ্গে সেটা হচ্ছে একটি কালো তিল মা ও ছেলের উভয়েরই নাকের ডান পাশে। চেয়ে দেখ অনিরুদ্ধ বাবুর মুখে অবিকল তেমনি একটি তিল আছে কিন্তু তরুণবাবুর মুখে নেই। জন্মগত ছোট একটি তিল—ব্যাপারটা যেমন সকলের নজরে পড়বে না তেমনি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণও বটে ঐ তিলটির কথা কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমার মনে ছিল বিশেষ একটি কারণে।

সকলেই কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে।

কিরীটী বলতে লাগল, ওই তিলটির উল্লেখ করলেই অনিরুদ্ধ বরাবর আমাদের বলেছে, ওটা নাকি ওর জন্মগত। ওর মায়ের নাকের পাশে নাকি অমনি একটি তিল আছে, এবং কথাটা বহু বার হয়েছে, বহু বার ও বলেছে। তাই অনিরুদ্ধর কথায় আমার প্রথম দিনই ওই তিলটির কথা মনে পড়েছিল এবং তরুণবাবুর মুখে ওই তিলটি না দেখতে পেয়ে আমি ওর identity সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হয়েছিলাম।

কথাটা বলেই কিরীটী অনিরুদ্ধর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, অনিরুদ্ধ, সবই করেছিলে তুমি কিন্তু তিলটির কথা তোমার মনে হয় নি একবারও। একেই বলে ভগবানের মার—

শাশ্বত কিরীটীর কথায় অনিরুদ্ধ ও তরুণের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে কথাটা মিথ্যা নয়।

কিরীটী আবার বলে, কিন্তু সামান্য ও তুচ্ছ ওই তিলের পার্থক্য অনিরুদ্ধর দুর্ভাগ্যক্রমে ও ঘটনাচক্রে আমি এখানে না এসে পড়লে হয়তো কারোর দৃষ্টিই আকর্ষণ করত না ও তরুণ যে আসল অনিরুদ্ধ নয় সে কথাও এত সহজে হয়তো কেউ জানতে পারত না মাত্র একজন ছাড়া—

একজন ছাড়া? শাশ্বতই পুনরায় প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, আমাদের শীলা দেবী। কারণ তার চোখে ব্যাপারটা ধুলো দেওয়া সম্ভবপর ছিল না। আর সম্ভবপরও হয় নি।

শীলা—শীলা দেবী তাহলে ব্যাপারটা জানতেন!

মৃদু হেসে কিরীটী বলে, জানতেন, কিন্তু তোমার প্রশ্ন হচ্ছে শাশ্বত জেনেও তবে শীলা দেবী ব্যাপারটা disclose করেন নি কেন, তাই না?

হ্যাঁ। মানে—

সেটাই তো শীলা দেবীর সব চাইতে বড় tragedy।

Tragedy!

হ্যাঁ। অবিশ্যি ও ছাড়া আর বোধ হয় শীলা দেবীর দ্বিতীয় পথও ছিল না এ ক্ষেত্রে—

কেন?

কারণ মানুষ যখন মাঝ দরিয়ায় পড়ে এবং সাঁতার যদি না জানা থাকে তাহলে হাতের কাছে যে কুটোটা পায় তাকেই আঁকড়ে ধরে বাঁচবার চেষ্টা করে স্বাভাবিক জৈবিক ধর্মে। শীলা দেবীও তাই করেছিলেন, কিন্তু যাক সে কথা, আজকের এই মর্মান্তিক দৃশ্যের মধ্যে আমার শীলা দেবীকে টেনে আনবার আদৌ কোন ইচ্ছা ছিল না কিন্তু এখন দেখছি তা আর বুঝি হবার উপায় নেই।

বাইরে এই সময় এক জোড়া পদশব্দ শোনা গেল।

কিরীটী বলে, Now here she is coming।

ঠিক ঐ মুহূর্তে দরজা খুলে গেল, শাশ্বতর সঙ্গে শীলা এসে ঘরে প্রবেশ করল।

কিন্তু প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের মধ্যে দৃষ্টিপাত করে যেন ভূত দেখার মতই থমকে দাঁড়িয়ে গেল শীলা। নির্বাক, স্তব্ধ—যেন পাথর।

আসুন শীলা দেবী, আপনাকে এ ভাবে কষ্ট দিতে হল বলে আমরা দুঃখিত। বসুন, ওই চেয়ারটায় বসুন—

কিন্তু কিরীটী বলা সত্ত্বেও শীলা বসে না। যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনই দাঁড়িয়ে রইল পূর্ববৎ স্তব্ধ হয়েই যেন।

দেখুন তো মিস রয়, এদের মধ্যে আসল ও সত্যিকারের অনিরুদ্ধটি কে?

চমৎকার এক নাটকীয় মুহূর্ত যেন।

নিঃশব্দে শীলা তাকিয়ে রয়েছে অদূরে দুটি চেয়ারে কিছু ব্যবধানে উপবিষ্ট প্রায় একই চেহারায় দুই ব্যক্তি অনিরুদ্ধ ও তরুণের দিকে, আর অনিরুদ্ধ ও তরুণও দুজনে নির্নিমেষে তাকিয়ে রয়েছে শীলার মুখের দিকে।

তিন জোড়া চক্ষু পরস্পর পরস্পরকে যেন সাপের দৃষ্টিতে নিঃশব্দে পর্যবেক্ষণ করছে।

কি মিস রয়, চিনতে পারছেন না আপনি এখনও আসল সত্যিকারের আপনার পূর্ব-পরিচিত অনিরুদ্ধকে? কিরীটী আবার প্রশ্ন করল।

শীলা নির্বাক।

কিরীটী মুহূর্তকাল তারপর চুপ করে থেকে পুনরায় প্রশ্ন আরম্ভ করল।

এবারে বলবেন কি শীলা দেবী, কিরীটী পুনরায় প্রশ্ন করল, সে রাত্রে আপনার ঘরে কালো চাদরে নিজেকে আবৃত করে কে গিয়েছিল?

শীলা তথাপি নির্বাক।

বুঝতেই পারছেন মুখ বন্ধ করে রেখে আর কোন লাভ হবে না। Cat is already out of the bag।

হঠাৎ যেন উন্মাদিনীর মতই একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠে দু হাতে মুখ ঢাকল শীলা, না না না—আমি কিছু জানি না, আমি কিছু জানি না—

কথাগুলো বলতে বলতে টলে শীলা পড়ে যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে কিরীটী শীলাকে ধরে ফেলল এবং একটা চেয়ারের উপর বসিয়ে দিল।

চেয়ারের উপর বসতেই অসহায়ভাবে শীলার মাথাটা টলে পড়ল।

শাশ্বত তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসে এবং বলে, ফেইণ্ট হয়ে গিয়েছেন দেখছি কিরীটী।

কিরীটী মৃদু হাসল।

কিন্তু—

এখুনি উনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। ভয় নেই শাশ্বত।

হলোও তাই; কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই পুনরায় শীলা চোখ মেলে তাকাল।

বাড়ি যাবেন শীলা দেবী? কিরীটীই প্রশ্ন করে।

বাড়ি!

হ্যাঁ—যান তো পাঠাবার এখুনি ব্যবস্থা করতে পারি।

যাব।

কিরীটীর নির্দেশে তখুনি পুলিশের জীপে করেই সার্জেণ্ট স্মিথের সঙ্গে শীলাকে বরাহনগরের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

শীলা যাবার সময় অনিরুদ্ধ বা তরুণ কারোর মুখের দিকেই আর তাকাল না। নিঃশব্দে মাথাটা নীচু করে ঘর থেকে শ্লথ মন্থর পদে বের হয়ে গেল। ঘরের মধ্যে সকলেই স্তব্ধ। কেবল কিরীটীর মৃদু কণ্ঠোচ্চারিত একটি কথা শোনা গেল, Poor girl!

॥ ২২ ॥

মুহূর্তকাল পরে কিরীটী পুনরায় মুহ্যমানের মত উপবিষ্ট অনিরুদ্ধর দিকে তাকিয়ে ডাকল, অনিরুদ্ধ—

বোবা দৃষ্টিতে সে ডাকে অনিরুদ্ধ মুখ তুলে তাকাল কিরীটীর মুখের দিকে।

আজকে শীলার ওই অবস্থার জন্য যদি কেউ দায়ী থাক তো তুমিই—

অনিরুদ্ধ নির্বাক।

যদিও পুওর শীলা তার স্বর্গতা জননী বিমলা দেবীরই দুঃখময় ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করেছে তবু এ নাটকে তোমার হৃদয়হীনতাও কম ছিল না। যদি জানতেই ওকে কোন দিন বিয়ে করতে পারবে না কেন তবে ওকে নিয়ে দিল্লীতে সেদিন ভালবাসার খেলা খেলেছিলে? এক হতভাগিনী নারীর মনে স্বামী, ঘর বাড়ির প্রলোভন জাগিয়ে তুলেছিলে? কেন তুমি ওকে সেদিন জানতে দাও নি বা জানাও নি যে তুমি বিবাহিত—

বা, চমৎকার! আমি বিবাহিত এ খবরটা কোথায় পেলে জানতে পারি কি?

তোমার স্ত্রী রুমা দেবী এখনও বেঁচে আছেন, তিনিই তার সত্যতা প্রমাণ করবেন।

শাশ্বতই এবারে কথা বলে, সে কি!

হ্যাঁ শাশ্বত, এই দেখ রুমা দেবীর চিঠি—রুমা দেবী ও অনিরুদ্ধর যুগলে ফটো—বলতে বলতে কিরীটী তার পকেট থেকে একখানা চিঠি ও একটা ফটো বের করে শাশ্বতর হাতে তুলে দিল।

সকলেই দেখল কথাটা মিথ্যা নয়।

এই রুমা দেবী হচ্ছে ওই তরুণ বাবুরও আপন ভগ্নী—সহোদরা। কি তরুণবাবু তাই ঠিক না?

তরুণ কোন জবাব দিল না কিরীটীর সে প্রশ্নের।

এখন বুঝতে পারছ অনিরুদ্ধ, এলাহাবাদ থেকে তোমার সমস্ত অতীত কাহিনীই আমি উদ্ধার করেছি। আর এও এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ তোমার সব পরিকল্পনাই ভেঙে গিয়েছে। তোমার কল্পনার বালুর প্রাসাদ ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছে—

অনিরুদ্ধ নির্বাক।

তরুণও নির্বাক।

কিরীটী আবার বলতে লাগল, আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে অনিরুদ্ধ, পাপ আর পারা কখনও নাকি চাপা থাকে না, চাপা দেওয়া যায় না। তোমার সমস্ত পাপ অন্যায় আর দুষ্কৃতি তোমাকে আজ শত বাহু মেলে গ্রাস করেছে। You are doomed! তোমার প্রতি যে গুরুতর অভিযোগের দণ্ডকে এড়িয়ে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে তুমি যে ভেবেছিলে মৃত নরহরির তোমার মামার সমস্ত সম্পত্তিকে গ্রাস করে নিঃশব্দে একদিন সকলের নাগালের বাইরে সরে পড়বে তোমার তিনটি মারাত্মক ভুলের জন্য তুমি নিজেই তা ভেস্তে দিয়েছ। প্রথম ভুল তোমারই পরিচয়ে তরুণকে—তোমার শ্যালককে এখানে পাঠান। দ্বিতীয় ভুল তোমার শীলাকে প্রতারণা করা। অবিশ্যি তরুণকে যদি তুমি এখানে তোমারই পরিচয় না পাঠাতে সেই সঙ্গে সঙ্গেই সম্পত্তির লোভে এখানে না এসে হাজির হতে তা হলে হয়তো আমারও এখানে আসার প্রয়োজন হত না আর তুমিও এত তাড়াতাড়ি exposed হতে না। কিন্তু তা না হলেও তোমার তৃতীয় মারাত্মক ভুলের জন্যই অবিশ্যি তুমি শেষ পর্যন্ত ধরা পড়তেই। এখন বোধ হয় বুঝতে পারছো তোমার তৃতীয় ও শেষ মারাত্মক ভুলটা কি। অবিশ্যি এও বলবো প্রচণ্ড লোভই তোমাকে তোমার তৃতীয় মারাত্মক ভুলের পথে অন্ধ নিয়তির মতই টেনে নিয়ে গিয়েছিল। আর সেই শেষ ও চরম ভুলটির জন্য You have been caught red handed! বাঘে ছুঁলে যেমন আঠার ঘা তেমনি লোভে থাবা বসালেও আঠার ঘা। একবার তুমি এলাহাবাদে ইনসিওরেন্স কোম্পানীকে ফাঁকি দিয়ে বেঁচে ভেবেছিলে এবারে এখানকার কেসটাতে বুঝি বেঁচে যাবে। কিন্তু দেখছো, তা হলো না। তোমার প্রচণ্ড অর্থলোভই তোমাকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিল। আমার মনে হয় Railway accidentয়ে লোকটা মরে নি—তুমিই তাকে হত্যা করেছো।

মিঃ আয়ার এবারে কথা বললেন, সত্যি বলছেন মিঃ রায়?

সত্যি মিথ্যা একমাত্র আপনার ঐ এজেন্ট মিঃ ঘোষই বলতে পারে তবে আমার অনুমান তাই।

মোটেই তা নয়। বিজনবাবু স্বাভাবিক ভাবেই রেলওয়ে অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছেন। তার প্রমাণ আছে—অনিরুদ্ধ এক্ষণে বলে।

সে দায়িত্ব আমার নয় অনিরুদ্ধ। পুলিশের প্রয়োজনে পুলিশই তা প্রমাণ করবে। কিন্তু আর নয় রাত সাড়ে আটটা প্রায় বাজে। ঐ দৃশ্যের এখানেই আমি ইতি করতে চাই। তোমাকে শাশ্বতর হাতেই তুলে দিচ্ছি, শাশ্বতই

তোমার ব্যবস্থা করবে। আর তরুণ বাবু, আপনাকে আর কি বলবো, I just pity you!

অনিরুদ্ধকে নিয়ে পুলিশের ভ্যান চলে গেল।

তরুণকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিরীটী মুক্তিই দিল।

তরুণ চলে যাবার পর শাশ্বত বললে, ও লোকটাকে ছেড়ে দেওয়া কি উচিত হল কিরীটী?

ভয় নেই তোমার শাশ্বত, প্রয়োজন বোধেই আপাতত ছেড়ে দিলাম।

কিন্তু—

এই জটিল মামলায় শীলা দেবীর ব্যাপারটা এখনও সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার হয় নি—

তার মানে?

শীলা অনিরুদ্ধ ও তরুণের রহস্যের মধ্যে এখনও একটি ব্যাপার অনুদ্‌ঘাটিতই আছে।

সে কি!

হ্যাঁ, শুধু শীলা, অনিরুদ্ধ ও তরুণই নয়, আর একটি অদৃশ্য কালো হাত এ ব্যাপারে আছে। ভুলে যাচ্ছ কেন, মৃত নরহরির সম্পত্তিটা তুচ্ছ ও সামান্য ব্যাপার নয়।

মানে তুমি—

হ্যাঁ, ভাগাড়ে গরু পড়লে যেমন অনেক শকুন উড়ে এসে বসে এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল এবং যতক্ষণ না সেই দৃশ্যে—অর্থাৎ এই নাটকের শেষ দৃশ্যে আমরা পৌঁছচ্ছি ততক্ষণ একটা ব্যাপার যে দুর্বোধ্যই থেকে যাবে।

কোন ব্যাপার?

শীলা সব জেনে শুনেও এ গহ্বরে পা বাড়িয়েছিল কেন শেষ পর্যন্ত।

শীলা!

হ্যাঁ শীলা। কিন্তু আর নয়, সুব্রত সত্যিই অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে আমাদের, এবারে আমাদের উঠতে হবে, চল।

অতঃপর মিঃ আয়ারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাকে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়ে কিরীটী তার ঘর থেকে বের হয়ে এল।

গাড়িতে উঠে বসে শাশ্বত বলে, কোন দিকে যাব?

আমি যাব বরাহনগরেই।

বরাহনগরে!

হ্যাঁ—

কিন্তু কেন?

কারণ আশা করছি আজ রাত্রে বা কাল রাত্রেই বর্তমান এই রহস্য নাটকের শেষ দৃশ্যে আমরা উপনীত হতে পারব।

শেষ দৃশ্যে!

হ্যাঁ, শেষ দৃশ্যে।

অগত্যা কিরীটীর নির্দেশমত শাশ্বত রাত নয়টা নাগাদ কিরীটীকে নরহরি ভবনেই বরাহনগরে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।

এবং যাবার আগে অতঃপর শাশ্বতর যা করণীয় তাকে তা বলে দিয়ে গেল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কিরীটী।

॥ ২৩ ॥

সেই রাত্রেই :

নরহরির বিরাট বাড়িটা ইতিমধ্যেই নিঝুম হয়ে গিয়েছে।

কিরীটী বাড়িতে ফিরে এসে নিজের ঘরে ঢুকতেই রামচরণ এসে ঘরে ঢুকল—বাবু, খাবার কি আপনার এই ঘরেই দেব?

না রামচরণ, আজ রাতে আর কিছু খাব না। তুমি বরং যদি এক কাপ চা করে দিতে পার।

কেন পারব না বাবু, এখুনি এনে দিচ্ছি।

রামরচরণ বের হয়ে যাচ্ছিল ঘর থেকে, পশ্চাৎ থেকে কিরীটী ডাকল, রামচরণ—

কিছু বলছিলেন বাবু?

তোমার দিদিমণি আর দাদাবাবুর খাওয়া হয়েছে?

দাদাবাবু তো এখনও ফেরেন নি।

দাদাবাবু ফেরেন নি!

না। আর দিদিমণি ফিরে এসে সেই যে ঘরে খিল দিয়েছেন, ডাকাডাকি করেও আর তার সাড়া পাই নি।

ও আচ্ছা, তুমি যাও।

রামচরণ চলে গেল।

তরুণ রায় তাহলে ফেরে নি!

তার কি চালে ভুল হল তরুণ রায়কে যেতে দিয়ে!

কিন্তু কিরীটীর মন সাড়া দেয় না কথাটায়।

ফিরতেই হবে তরুণ রায়কে। আজ হোক কাল হোক পরশু হোক ফিরে একবার সে আসবেই নিশ্চয় সে এ বাড়িতে।

এতবড় হতাশাকে সে এত সহজে মেনে নেবে না।

অনিরুদ্ধ তরুণ রায়কে তার পরিচয়ে এখানে পাঠিয়েছিল তার স্বার্থেই।

আর সে স্বার্থটাও রুমা সংবাদ পাওয়ার পর তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

রুমা—তরুণের বোনকে সে বছর তিনেক পূর্বে বিবাহ করেছিল, আর সে বিবাহ নাকি ভালবেসেই।

কাজেই নরহরির উইল মত তার পক্ষে আর শীলাকে দ্বিতীয়বার স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে সম্পত্তি লাভ সম্ভব ছিল না।

এবং সে ক্ষেত্রে সে মাত্র তিনশত টাকা করে মাসহারা পেত।

কিন্তু অনিরুদ্ধর মত এক অর্থ পিশাচের পক্ষে অতবড় সম্পত্তির প্রলোভনটা এড়ান সম্ভবপর ছিল না। তাই সে নিশ্চয়ই কৌশলে তরুণকে অনিরুদ্ধ সাজিয়ে তার সঙ্গে শীলার বিবাহটা দিয়ে সম্পত্তিটা বাগাবার পরিকল্পনা করেছিল। এবং সেই কারণেই নিশ্চয় অনিরুদ্ধর সঙ্গে একটা প্যাকট্ বা চুক্তি হয়েছিল।

সে চুক্তিটা কী?

সাধারণ চুক্তি নিশ্চয়ই নয় কারণ তাহলে তরুণ এতবড় risk নিত না।

উভয়ের মধ্যে কি চুক্তি হয়েছিল সেটা জানতে হবেই কিরীটীকে।

কিরীটী ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে সেই চিন্তাটাই করতে থাকে।

রামচরণ চা নিয়ে এল।

চায়ের কাপটা রামচরণ কিরীটীর হাতে দিয়ে ওর মুখের দিকে তাকায়।

কিছু বলবে রামচরণ?

দিদিমণির ঘরের পাশ দিয়ে আসছিলাম—

কী?

মনে হল ঘরের মধ্যে যেন দিদিমণি কাঁদছেন।

রামচরণ?

বলুন।

আচ্ছা দিদিমণি ফিরবার পর কেউ তার সঙ্গে কি দেখা করতে এসেছিল ?

না তো। তবে—

কী ?

দিদিমণির একটা ফোন এসেছিল।

ফোন !

হ্যাঁ—

কখন ?

আপনি আসার কিছুক্ষণ আগে।

দিদিমণি ফোন ধরেছিলেন ?

হ্যাঁ।

কী কথা তিনি ফোনে বলেছেন শুনেছ কিছু ?

না। আমি ডেকে দিয়েই নীচে চলে গিয়েছিলাম।

ও, আচ্ছা তুমি যেতে পার

রামচরণ চলে গেল। কিরীটী তার পূর্ব পরিকল্পনা মত পশ্চাতের বাগানের দ্বারপথেই বাড়ির মধ্যে এসে প্রবেশ করে তার নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকেছে। এবং ঘরে ঢুকে নিঃশব্দে ঘরের দরজায় খিল তুলে দিয়েছে।

কিরীটীকে যখন নরহরি ভবনে শাশ্বত নামিয়ে দিয়ে যায়, কিরীটী তখন তাকে নির্দেশ দিয়েছিল রাত এগারটা নাগাদ যেন সে নরহরি ভবনে পিছন দিয়ে এসে প্রবেশ করে বাগানের মধ্যে নিজেকে আত্মগোপন করে রাখে।

শাশ্বত কিরীটীর সেই নির্দেশ মত রাত এগারটার কিছু পূর্বেই নরহরি ভবনের পশ্চাতের দ্বারপথে এসে প্রবেশ করেছিল।

শাশ্বতকে যেমন বাড়ির পিছনের বাগানে আত্মগোপন করে থাকতে বলেছিল কিরীটী, সে তেমনিই রয়েছে তখন।

কিরীটী শাশ্বতকে কেবল বাগানের মধ্যে একটি জায়গার কথা বলে সেইখানেই অপেক্ষা করতে বলেছিল।

চোখ সজাগ রেখে এইখানেই থাকো শাশ্বত, কেবল একটু সতর্ক থেকো।

রামচরণ চলে গেলে কিরীটী বাগানে গেল এবং নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে মৃদুকণ্ঠে ডাকল, শাশ্বত, আছ ?

হ্যাঁ, এই যে—

শাশ্বত এগিয়ে এলে কিরীটী বললে, ঠিক আছে, এইখানেই থাক আমার সংকেত না পাওয়া পর্যন্ত। কথাটা বলেই কিরীটী ফিরতে উদ্যত হয়।

কিন্তু তুমি চললে কোথায়? শাশ্বত শুধায়।

কাজ আছে। ঠিক সময় আসব।

কিরীটী চলে যাবার পর থেকে শাশ্বত একা একাই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে বাগানের মধ্যে।

শীতের অন্ধকার রাত। গঙ্গার বুক থেকে হাওয়া আসছে যেন কনকনে। হাড় কাঁপানো হাওয়া।

ক্রমশঃ রাত সাড়ে এগারটা বাজল।

তারপর আরও পনের মিনিট অতিবাহিত হল।

কিরীটী তখনও ঘরের মধ্যে অধীর অপেক্ষায় যেন উদ্গ্রীব হয়ে আছে।

তবে কি আজ সে এল না! তার অনুমান কি ভুল হল!

ধীরে ধীরে কিরীটী দরজাটা খুলল।

নিঃশব্দে, অতি সাবধানে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই বারান্দার ওদিক থেকে কানে এল মৃদু সাবধানী একটা পদশব্দ।

কয়েকটা মুহূর্ত কিরীটী সেই মৃদু সাবধানী পদশব্দটা কান পেতে শোনবার চেষ্টা করল।

হ্যাঁ, তার শুনতে ভুল হয় নি। সাবধানী পদশব্দই বটে।

এই দিকেই আসছে পদশব্দটা এগিয়ে।

অন্ধকারে কিরীটী একেবারে দেওয়ালের সঙ্গে নিজেকে যেন মিশিয়ে দিল।

সমস্ত ইন্দ্রিয় তার তীক্ষ্ণ সজাগ।

পদশব্দটা ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে।

॥ ২৪ ॥

বেড়ালের মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে কিরীটী অন্ধকারে।

পাশ দিয়েই যেন অতি মৃদু, অতীব সাবধানী পদবিক্ষেপে কে একজন চলে গেল। পায়ের শব্দটা ক্রমশঃ মিলিয়ে গেল।

কিরীটী এবারে অগ্রসর হল যে দিকে ক্ষণপূর্বে পদশব্দটা মিলিয়ে গিয়েছে সেই দিকেই।

অগ্রগামী পদশব্দটা শোনা যায় আবার।

বারান্দা অতিক্রম করে সিঁড়ি। সিঁড়ির আলোও নিবানো।

সহসা সেই অন্ধকারে দেখা দেয় অগ্রবর্তী একটা টর্চের সরু আলোর রশ্মি।

আলোর রশ্মিটা এগিয়ে চলেছে ধাপের পর ধাপ।

সিঁড়ি শেষ করে অপ্রশস্ত অলিন্দ অতিক্রম করে অগ্রবর্তী মনুষ্য মূর্তি চত্বরে গিয়ে পড়ল।

তারপরেই বাগান। কিরীটী অনুসরণ করে চলে।

ওদিকে বাগানের মধ্যে শাশ্বতও শুনতে পেয়েছে কিসের যেন একটা মৃদু খস্ খস্ শব্দ। সমস্ত শ্রবণেন্দ্রিয় সঙ্গে সঙ্গে শাশ্বতর তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

এতক্ষণ মশার কামড়ে অস্থির হয়ে উঠেছিল শাশ্বত, সেই মৃদু খস্ খস্ শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সব কিছু যেন সে ভুলে যায়।

প্রথমটায় ঠিক বুঝে উঠতে পারে না শাশ্বত যে শব্দটা কিসের।

মুচ্ মুচ্ শুকনো ঝরা পাতার উপর যেন একটা সাবধানী সতর্ক পদশব্দ পরে মনে হল।

শীতের কৃষ্ণপক্ষের রাত হলেও আকাশ পরিষ্কার ঝকঝকে ছিল তারার আলোয়।

কিরীটীর অগ্রবর্তী ছায়ামূর্তি চলতে চলতে এসে দাঁড়াল সেই পাথরের বেঞ্চটার সামনে।

ঝিঁঝি পোকার একটানা ঝিঁঝি শব্দ রাত্রির অন্ধকারে কেবল শোনা যাচ্ছে। আর মধ্যে মধ্যে রাত্রির চোরা হাওয়ায় পাতার একটা মৃদু ক্ষীণ সিপ্ সিপ্ শব্দ।

কিরীটীর হাত পাঁচ ছয় ব্যবধানে দাঁড়িয়ে সেই ছায়ামূর্তি তখন। দুজনের মধ্যে আড়াল করে রেখেছে পরস্পর থেকে পরস্পরকে কতকগুলো বনতুলসীর ঝোপ। বাতাসে বনতুলসীর তীব্র গন্ধটা ছড়িয়ে যাচ্ছে।

ঝোপের আড়াল থেকে মৃদু তারার আলোয় অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সামান্য ব্যবধানে দণ্ডায়মান ছায়ামূর্তিকে কিরীটী ও শাশ্বত দুজনেই।

অকস্মাৎ যেন প্রথম ছায়ামূর্তির সামনে অন্ধকার ভেদ করে দ্বিতীয় এক ছায়ামূর্তির আবির্ভাব ঘটল।

শীলা! চাপা পুরুষ কণ্ঠস্বর।

কে?

অনিরুদ্ধ ফিরেছে ? মানে আমি তরুণের কথা বলছি।

জানি না।

জান না মানে ? ফিরেছে কি না জান না ?

না। কিন্তু এবারে আমাকে রেহাই দাও।

কি হল আবার তোমার ?

কিছু হয় নি, কিছু হয় নি—শুধু তুমি আমাকে এবারে রেহাই দাও—

কিন্তু রেহাই চাইলেই তো আজ আর রেহাই তোমার মিলবে না শীলা। আজ যেখানে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি সেখানে জেনো আমাদের সামনে একটি মাত্র পথই খোলা আছে। এখান থেকে সরে পড়া সকলের অজ্ঞাতে নিঃশব্দে—

তাই—তাই আমি চাই। আমাকে তুমি যেতে দাও।

যাবই তো কিন্তু শূন্য হাতে ফিরে যাব বলে তো এতদূর এগিয়ে আসি নি—

এখনও—এখনও তুমি ভাঁওতা দেবে ?

ভাঁওতা নয়। আর সেই কথাটা বলবার জন্যই এসেছি। শোন—

না, না—আর আমি তোমার কোন কথাই শুনতে চাই না।

বোকামি করো না শীলা, শোন—

না, না—তুমি মিথ্যাবাদী, শঠ, প্রতারক।

হাঁপাতে থাকে শীলা যেন একটা অবরুদ্ধ আক্রোশে আর যন্ত্রণায়।

শোন শীলা, যা আমি বলছি।

শুনবো না, শুনবো না—তোমার কোন কথাই আমি আর শুনবো না।

শুনবে না ?

না, না—

শুনতে তোমাকে হবেই নচেৎ জেনো কাল সকালেই তোমার সব সত্য কথা আমি প্রকাশ করে দেব।

দাও, দাও—যা খুশি তোমার কর।

শীলা! গর্জন করে ওঠে যেন সেই পুরুষ কণ্ঠ এবার।

কেন, কেন তুমি আমাকে এভাবে যন্ত্রণা দিচ্ছ ? কি করেছি তোমার আমি ?

কি করেছ তুমি জান না ? নরহরিবাবুকে তুমি হত্যা করো নি ?

তীক্ষ্ণ অথচ চাপা একটা আর্তনাদ ফুটে বেরোয় শীলার অবরুদ্ধপ্রায় কণ্ঠ থেকে, না না—তাকে আমি হত্যা করি নি। ঈশ্বর জানেন—

ঈশ্বর! ঈশ্বর তোমাকে আদালতের আইন থেকে বাঁচাতে পারবে না।

মিথ্যা, সব মিথ্যা—সব তোমার বানানো।

নার্স মালতী দেবীর পরিচয়টা নিশ্চয়ই মিথ্যা নয়। সব, সব—আমি প্রকাশ করে দেব।

শীলা সত্যি সত্যিই এবারে কান্নায় যেন ভেঙে পড়ে।

শীলা কাঁদছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

তার চাইতে আমি যা বলছি শোন—তুমি যা চাও সব পাবে।

কিছু আমি চাই না আর, কিছু আমি চাই না।

চাও তুমি, সব চাও। শোন, এই নাও চাবি। নরহরির শয়ন ঘরের মধ্যে যে বড় সিন্দুকটা আছে, নিশ্চয়ই তারই মধ্যে জহরতগুলো আছে, চাবি দিয়ে সিন্দুকটা খুলে সেইগুলো নিয়ে সোজা বের হয়ে এসো রাস্তায়। রাস্তায় আমি অপেক্ষা করছি আমার গাড়ি নিয়ে—

না, না—ওসব আমি পারব না।

শীলা!

না, না—পারব না।

পারবে না?

না, না—

পারতে তোমাকে হবেই।

না, না—পারব না, আমি কিছুতেই পারব না। ক্ষমা করো তুমি আমাকে, ক্ষমা করো—

কান্নায় শীলা যেন ভেঙে পড়ে আবার।

কিরীটী শাশ্বতর কাঁধে চাপ দিয়ে এবারে ইঙ্গিত করে।

সঙ্গে সঙ্গে শাশ্বত শীলার সামনে আবছা আলো-আঁধারে দণ্ডায়মান ছায়ামূর্তির পশ্চাতে গিয়ে পিস্তল হাতে কঠিন নির্দেশের স্বরে বলে ওঠে, পালাবার চেষ্টা করবেন না মিঃ গুহ, আমার হাতের পিস্তলের ছয়টি চেম্বারই গুলি ভর্তি।

এবং সেই মুহূর্তেই কিরীটির হাতের হান্টিং টর্চের জোরালো আলো গিয়ে পড়ল মিঃ গুহর মুখের উপরে।

শীলা বিদীর্ণ কণ্ঠে একটা আর্ত চিৎকার করে উঠে ঐখানেই লুটিয়ে পড়ল।

পরক্ষণেই শাশ্বত হুইসেল বাজাতেই আশপাশের অন্ধকার থেকে চার-পাঁচজন লাল পাগড়ীর আবির্ভাব ঘটল।

প্রতাপ গুহকে গ্রেপ্তার করে সঙ্গে সঙ্গে তার হাতে লৌহবলয় পরিয়ে দেওয়া হল।

শীলাকেও স্থানান্তরিত করবার ব্যবস্থা হল বাড়ির মধ্যে তার ঘরে।

এবং কিরীটী সকলকে এবারে বললে, চলুন, ভিতরে যাওয়া যাক।

॥ ২৫ ॥

মিঃ প্রতাপ গুহ।

সলিসিটার প্রতাপ গুহ।

শাশ্বত যেন একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছিল ঘটনার আকস্মিকতায়।

কিরীটী মৃদু কণ্ঠে বলে, হ্যাঁ, মিঃ গুহই শাশ্বত। প্রথম রাত্রে শীলা দেবীর ঘরের মধ্যে প্রতাপবাবুর কণ্ঠস্বর শুনেই কেমন যেন আমার চেনা চেনা মনে হয়েছিল গলাটা। হ্যাঁ, মনে হয়েছিল কণ্ঠস্বরটা যেন আমার চেনা চেনা। কিন্তু মনের মধ্যে তখন আমার সম্পূর্ণ অন্য চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে, তাই চিনেও চিনতে পারি নি সঠিকভাবে সে রাত্রে ওর কণ্ঠস্বরটা। কিন্তু সমস্ত সংশয় আমার মিটে গেল ফোনে সেদিন ওর সঙ্গে কথা বলবার সময়। দুঃসাহসী উনি বলব নিঃসন্দেহে। তবু বলতে আমার দ্বিধা নেই সে রাত্রে জুয়েলগুলোর কথা আমাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যদি না উনি বলতেন তবে হয়তো এত তাড়াতাড়ি সন্দেহটা ওর উপরে গিয়ে একেবারে নিশ্চিতভাবে পড়ত কিনা আমার সন্দেহ।

লোকটা অসাধারণ চতুর তো! শাশ্বত বলে।

নিঃসন্দেহে।

কিন্তু ওর উপরে সন্দেহ তোমার কি করে এলো প্রথমে?

জগৎবাবুর চিঠি পড়ে—

জগৎবাবু!

হ্যাঁ, কাশীর ডাঃ জগৎ হাজরা। তাকে আমি লিখেছিলাম সুস্থ হবার পরও মাস দু-তিন দেরি করে কেন শীলা দেবী কলকাতায় এসেছিলেন সে কথাটা আমাকে লিখে জানাবার জন্য। তার জবাবে তিনি জানান, মিঃ গুহর পরামর্শ মতই নাকি তিনি দেরি করে কলকাতায় আসেন।

বল কি!

হ্যাঁ, এবং সুস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ হাজরার পরামর্শ মত মিঃ গুহকে উনি চিঠি দেন।

তারপর?

সেই চিঠি পেয়েই মিঃ গুহ কাশী যান, এবং শুধু সেইবারই নয় তারপর থেকে ঘন ঘন মিঃ গুহ কাশীতে ডাঃ হাজরার ওখানে যেতে শুরু করেন, যার ফলে ক্রমশঃ দুজনার মধ্যে একটা ভালবাসা বল ভালবাসা, প্রীতি বল প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এবং তখন তারই পরামর্শ মতই নিশ্চয় কলকাতা আসার ব্যাপারে শীলা বিলম্ব করে।

কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না কিরীটী, যদি সত্যিই অনিরুদ্ধর সঙ্গে শীলার পরিচয় ছিল তখন—

মিঃ গুহর ফাঁদে শীলা পা দিলেন কেন এই তো। তারও কারণ ছিল বৈকি।

কারণ!

হ্যাঁ, সে আর এক ইতিহাস।

আর এক ইতিহাস!

তাই। প্রতাপ গুহর ব্যাপারটা পুরোপুরি জানতে হলে সেই ইতিহাসের পাতায় আমাদের উঁকি দিতেই হবে। যার সামান্য ইঙ্গিত মাত্র, কিছুক্ষণ আগে বাগানে শীলা ও প্রতাপ গুহের তর্ক-বিতর্কের মধ্যে শীলা দেবীর ও প্রতাপ গুহের উভয়েরই মুখ থেকে বের হয়ে এসেছিল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ—কি সব নার্সিংয়ের কথা নরহরিকে বলছিল বটে ওরা। সেই কথাই কি?

হ্যাঁ, যে বিচিত্র উইলের ব্যাপার নিয়ে বর্তমান রহস্য জমাট বেঁধে উঠেছে সেই উইলটা নরহরির মৃত্যুর ঠিক আড়াই বছর আগে আজ থেকে লেখা হয়।

তারপর?

এবং যেদিন উইল তৈরী হয় সেদিন থেকেই প্রতাপের ঐ ব্যাপারে সে বেশ একটু interested হয়ে ওঠে। বিচিত্র উইলটা—সঙ্গে সঙ্গে সে অনিরুদ্ধ ও শীলার খোঁজ খবর নেবার চেষ্টা করে। কিন্তু অনিরুদ্ধর খবর পেলেও শীলার কোন সন্ধান করতে পারে না দিল্লীতে গিয়ে, কারণ সে সময় শীলা দিল্লীতে ছিল না।

তবে কোথায় ছিল সে?

সে তখন স্বামীর ঘর করছিল।

সে আবার কি! শীলা বিবাহিত নাকি?

হ্যাঁ, বিবাহিত—তবে আজ আর সে স্বামী নেই।

মানে?

সে আজ বিধবা।

বিধবা!

হ্যাঁ বিধবা। যা বলছিলাম, সে সময় সে পাটনাতে ছিল তার স্বামীর সঙ্গে। স্বামী তার পাটনায় এক স্কুলের টীচার ছিল।

টীচার!

হ্যাঁ, বছর দুই আগে পাটনাতেই তার মৃত্যু হয়।

কিন্তু এ সব খবর পেলে কোথায়?

জগৎবাবুর কাছে।

জগৎবাবুর কাছে!

হ্যাঁ, কারণ জগৎবাবুরই এক পরিচিত বন্ধুর ছেলে ছিল শীলার স্বামী।

জগৎবাবু নরহরির উইলের ব্যাপার জানেন?

না।

জানেন না?

না, কারণ শীলা বা প্রতাপ কোনদিন তাকে সে কথা জানায় নি। যাক্ যা বলছিলাম, শীলার স্বামীর আকস্মিক মৃত্যু হয় ম্যালিগনেন্ট্ ম্যালেরিয়ায়। স্বামীর মৃত্যুর পর শীলা তার এক বান্ধবা নার্সের উপদেশে কলকাতায় নার্সিং পড়তে আসে। বছরখানেক সে নার্সিং পড়েছিল। সেই সময় কলকাতায় থাকাকালীন অবস্থাতেই হাসপাতালে ঘটনাচক্রে প্রতাপের সঙ্গে শীলার প্রথম পরিচয়। এবং শীলাকে দেখেই প্রতাপ চমকে ওঠে কারণ নরহরির কাছে শীলার যে ফটো ছিল তার সঙ্গে শীলার প্রতিকৃতির হুবহু মিল দেখেই প্রতাপ শীলার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ক্রমে তার সকল পরিচয় জানতে পারে।

অদ্ভুত যোগাযোগ তো!

অদ্ভুতই বটে। যাহোক শীলার সত্য পরিচয় পেয়ে প্রতাপ ঘনিষ্ঠতা করে তার সঙ্গে। আগেই বলেছি, প্রতাপের বাবা নরহরির শুধু সলিসিটারই ছিল না—ঘনিষ্ঠ বন্ধুও ছিল এবং পরামর্শদাতাও ছিল সর্ব ব্যাপারে। নরহরির ছিল এনজাইনা পেকটোরিস্। মধ্যে মধ্যে ওই রোগে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তেন। একবার একটা অ্যাটাক অ্যাকিউট্ হওয়ায় তাঁর জন্য একজন

নার্সের প্রয়োজন হয়। সেই সুযোগটি গ্রহণ করে প্রতাপ। স্ত্রীলোক এনে হাজির করে নরহরির রোগশয্যার পাশে অন্য নামে অর্থাৎ মালতী সেন নামে।

অসুস্থ নরহরির তখন যদিও কাউকে চিনবার উপায় ছিল না কারণ সে ছিল যেন ঔষধের ঘোরে আচ্ছন্ন ও রোগযন্ত্রণায় কাতর। এবং যে রাত্রে শীলা নার্সিং করতে আসে নরহরিকে সেই রাত্রেই শেষের দিকে আর একটা অ্যাটাকে তাঁর মৃত্যু হয়।

একথা তুমি জানলে কি করে?

এবারে কিরীটী তার পকেট থেকে একখানা চিঠির খাম বের করে শাশ্বতকে দেখাল।

বিস্মিত শাশ্বত সুধায়, কি ওটা!

একটা চিঠি।

কার?

আজ দ্বিপ্রহরে এই চিঠিখানা আমি পেয়েছি।

কিন্তু চিঠিটা কার?

প্রতাপ গুহর পার্টনার সমীরণ দত্তর।

তাহলে প্রতাপের পার্টনার সমীরণ দত্তও কিছু কিছু জানত শীলা ও ও প্রতাপের ব্যাপারটা?

জানতো যে তা এখন তো বোঝাই যাচ্ছে।

কিন্তু জানতোই যদি তো এতদিন ব্যাপারটা জানায় নি কেন?

কারণ একটা নিশ্চয়ই আছে, তবে সেটা উহ্য। এবং সেটা নিজে না সে প্রকাশ করলে আমাদের পক্ষে জানাও সম্ভব নয়।

তা কি লিখেছে সে তার চিঠিতে?

সেও ধরি মাছ না ছুঁই পানী গোছের চিঠি। অর্থাৎ যতটুকু লিখে জানালে আমাদের কাজ হবে অথচ তাকে ধরা ছোঁয়া যাবে না ঠিক ততটুকুই।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ, সে তার চিঠিতে মাত্র এইটুকুই লিখেছে শীলার সঙ্গে সম্ভবত তার পার্টনার প্রতাপের পূর্ব পরিচয় কোন এক সময় হয়েছিল এবং শীলা কিছুদিন কলকাতায় কোন এক হাসপাতালে নার্সিং শিক্ষা করেছিল। বাকীটা অবিশ্যি আমি কিছুক্ষণ পূর্বে শীলা ও প্রতাপের কথোপকথন থেকে অনুমান

করে নিয়েছি। যাক, তারপর যা ঘটছে আমার মনে হয় ট্রেন অ্যাকসিডেণ্টের পর শীলার কোন সংবাদ না পাওয়ায় দীর্ঘদিন প্রতাপ অনন্যোপায় হয়েই বোধ হয় চুপচাপ ছিল।

তারপর ?

তারপর তো ব্যাপারটা খুবই সহজ। কাশী থেকে শীলার চিঠি পেয়েই প্রতাপ সেখানে ছুটে যায়। এবং শীলার পূর্ব বিবাহের কথাটা হয়তো তখনই সে প্রথম মানে প্রতাপ জানতে পারে। কিন্তু—

কী ?

তার পরের ব্যাপারটাই ঠিক আমি এখনও অনুমান করতে পারি নি, কেন না শীলা তারপরেও কিছুদিন নিজেকে গোপন রেখে ট্রেন দুর্ঘটনার ঠিক দেড় বৎসর পরে এখানে আবির্ভূত হলো। হয়তো—

কী ?

অনিরুদ্ধকে যে এককালে সে ভালবেসেছিল সে কথাটা সে ভুলতে পারে নি। এবং সেই কথাটা অনুমান করতে পেরেই শীলার সেই গোপন দুর্বলতার সুযোগেই ধূর্ত প্রতাপ তাকে তার হাতের মুঠোর মধ্যে পায়—অর্থাৎ নিজের স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপারে শীলাকে যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে।

ইতিমধ্যে কথা বলতে বলতে কখন এক সময় ভোর হয়ে গিয়েছে ওরা টেরও পায় নি।

ভোরের প্রথম আলোর আভাস খোলা জানলা পথে দেখা দিতেই কিরীটী বলে ওঠে, চল তো শাশ্বত, একবার শীলাদেবীর খোঁজটা নেওয়া যাক—সুস্থ হয়ে থাকেন যদি ইতিমধ্যে তো তাঁর কাছ থেকেই বাকীটা এবারে আদায় করে নেওয়া যাবে।

চল।

দুজনে উঠে ঘর থেকে বের হয়ে শীলার ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

ঘরের দরজা বন্ধ। দরজার কপাটে টুক্ টুক্ করে নক্ করে মৃদুকণ্ঠে ডাকল কিরীটী, শীলাদেবী—

কিন্তু কোন সাড়া নেই।

আরও বার দুই ডাকল শীলাকে, তবু কোন সাড়া নেই।

কিরীটী এবারে দরজাটায় একটু ঠেলা দিতেই দরজার কবাট দুটো খুলে গেল।

শীলাদেবী—

শীলা ঘরে নেই। কোথায় গেল শীলা!

সারা বাড়িতেও আর শীলার খোঁজ পাওয়া গেল না।

রাতারাতি এক সময় সকলের অলক্ষ্যে শীলা কোথায় চলে গিয়েছে কে জানে!

॥ ২৬ ॥

তরুণ রায়েরও আর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না অনেকদিন।

অনিরুদ্ধর বিরুদ্ধে ইনসিওরেন্সের মামলাটা তখন চলছে আদালতে এবং প্রতাপ গুহও রয়েছে তখনও বিচারের অপেক্ষায় হাজতে বন্দী।

ঠিক ওই সময় একদিন কিরীটীর হাতে এসে পৌঁছাল শীলার দীর্ঘ চিঠিটা।

শ্রদ্ধেয় কিরীটীবাবু,

এই চিঠিটা যখন আপনার হাতে পৌঁছবে তখন আমি অনেকদূরে।

আমি চোর, আমি জালিয়াৎ, আমি লোভী, আপনাদের চোখে হয়তো আজ আমি সব কিছুই।

আর আপনারাই বা সকলে আমার গায়ে ধুলো ছিটাবেন না কেন, আমার সৃষ্টিকর্তা বিধাতাই যখন গায়ে আমার ধুলো দিয়ে দিয়েছেন!

কিন্তু আমি ভাবছি আমার সৃষ্টিকর্তার কথাই।

আর সেই সঙ্গে বলতে ইচ্ছা করছে, তুমি সত্যিই অতুলনীয়। তুলনা সত্যিই তোমার নেই।

যাক, যে কথাটা বলবার জন্য এই চিঠির অবতারণা আমার সেই কথাতেই আসি।

বলছিলাম নরহরিবাবুর কথা।

আপনারা হয়তো খুব অবাক হয়েছিলেন নরহরিবাবুর বিচিত্র উইলটা পড়ে, কিন্তু আমি অবাক হইনি।

কারণ নরহরিবাবু সত্যিই আমার মাকে ভালবাসতেন। এবং আপনারা যে জেনেছেন জীবনে বিয়ে সেদিন হল না বলে ছাড়াছাড়ি হবার পর আমার মার সঙ্গে নরহরিবাবুর দ্বিতীয়বার আর কোন দিনের জন্যই সাক্ষাৎ হয় নি সেটা কিন্তু সত্য নয়।

আমার বাবার মৃত্যুর পর থেকেই যদিচ মা দিল্লীর সরোজিনী বিধবা আশ্রমে ছিলেন তথাপি যতদিন মা বেঁচে ছিলেন নরহরিবাবুর সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল, মধ্যে মধ্যে দেখাও হত এবং মধ্যে মধ্যে দূর দূর কোন নির্জন জায়গায় দুজনে একত্র গিয়েও কিছুদিন থাকতেনও।

অবিশ্যি বিধবা আশ্রমের কঠিন নিয়মানুবর্তীতার মধ্যে থেকেও মা যে কি করে ওইসব ম্যানেজ করত তা আজও আমি জানতে পারি নি।

মার মৃত্যুর পর ওরই অর্থাৎ নরহরিবাবুর অর্থসাহায্যেই আমি মানুষ হয়েছি।

তারপর বড় হলাম একদিন এবং সেই সময়েই অকস্মাৎ দিল্লীর এক ইনডাস্ট্রিয়াল একজিবিশনে অনিরুদ্ধর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ পরিচয় হয়।

কিছুটা ঘনিষ্ঠতাও যে হয় নি সে সময় তা অস্বীকার করব না।

এমনি কি আমাদের উভয়েয় মধ্যে বিবাহের কথাবার্তাও হয়।

তারপর একদিন অনিরুদ্ধ ফিরে গেল এলাহাবাদে।

আমাদের উভয়ের মধ্যে সম্পর্কটা কেবল তখন কিছুদিন ধরে উভয়কে উভয়ের পত্র দেওয়া নেওয়ার মধ্যে দিয়েই রইল বেঁচে।

তারপরই হঠাৎ একদিন সে সম্পর্কটা ছিন্ন হয়ে গেল।

রুমা অনিরুদ্ধর স্ত্রীর এক চিঠিতে অনিরুদ্ধ বিবাহিত কথাটা জানবার পরই।

অথচ সে আগাগোড়াই কথাটা আমার কাছে গোপন করে গিয়েছিল।

ভাগ্য আবার আমার সঙ্গে যেন বিদ্রূপ করল।

দুঃখ সেদিন আমার হয় নি এতবড় মিথ্যে কথাটা বলব না কিরীটী বাবু তার জন্যে। কিন্তু জন্মাবধিই অমনি ধারা বিদ্রূপ করছে আমার ভাগ্য আমার সঙ্গে, তাই আশ্চর্য খুব একটা হই নি।

দুঃখটাকেও মেনে নিয়েছিলাম।

ঐ ঘটনারই পর আকস্মিক ভাবে পরিচয় হল আমার প্রদ্যুতের সঙ্গে।

প্রদ্যুৎই একদিন বিয়ের প্রস্তাব জানাল আমাকে।

ভাবলাম ক্ষতি কি।

কতকাল আর এমনি করে ভেসে বেড়াব—ঘর বাঁধলাম বিয়ে করে প্রদ্যুৎকে নিয়ে।

কিন্তু আবার ভাগ্য বিদ্রূপ করল আমার সঙ্গে—আকস্মিক ভাবে মাত্র চারদিনের জ্বরে প্রদ্যুতের মৃত্যু হল।

কি করি, কোথায় যাই—ভাবতে ভাবতে যখন কোন আর কুল কিনারা পাচ্ছি না, আমার এক নার্স বান্ধবী আমাকে নার্সিং পড়বার জন্য উপদেশ দিল।

একটা কিছু করতেই হবে, এভাবে বসে থাকলে চলবে না তো। তাছাড়া বিয়ের পর থেকেই নরহরিবাবুর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হওয়াতে তার কাছ থেকে অর্থ সাহায্যটাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ঐ সময়। অতএব কলকাতায় চলে এলাম নার্সিং পড়ার জন্য।

আদালতে ঐ পর্যন্ত চিঠিটা পড়তে পড়তে শাশ্বতর মনে পড়ল সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে প্রতাপ গুহকে সরকার পক্ষের উকীল যে প্রশ্ন করেছিল।

শীলা দেবীর সঙ্গে কতদিনকার আপনার পরিচয় প্রতাপবাবু?

প্রথম পরিচয় হয় তার সঙ্গে আমার নরহরিবাবুর রোগশয্যার পাশে।

তাই কি?

হ্যাঁ—

কিন্তু আমরা যত দূর জানি আপনি সত্য কথা বলছেন না।

সত্যটা যদি জানেনই আপনারা তবে মিথ্যেই বা আমাকে প্রশ্ন করছেন কেন?

প্রশ্ন করছি এই কারণে যে আদালত জানতে চায় কতখানি ঘনিষ্ঠতা শীলা দেবীর সঙ্গে আপনার হয়েছিল?

প্রশ্নটা আদালতের একান্তই ব্যক্তিগত হয়ে যাচ্ছে না কি?

তা যদি বলেন তো তাই।

যেমন খুশি আপনারা তাহলে ভেবে নিন।

অর্থাৎ প্রশ্নটার জবাব আপনি দেবেন না?

না।

বেশ। আর একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন কি?

দেবার মত হলে পাবেন।

শীলা দেবী যে বিধবা তা আপনি জানতেন?

জানতাম না।

জানতেন না?

না।

শীলা দেবীকে তখন কি আপনি বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন?

অবান্তর প্রশ্ন।

শাশ্বত আবার শীলার চিঠির মধ্যে মনোনিবেশ করল।

হাসপাতালে যখন নার্সিংয়ের ট্রেনিং নিচ্ছি সেই সময়ই একদিন আকস্মিক ভাবে প্রতাপের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। প্রতাপের এক বন্ধু ছিল হাসপাতালে সেই সময় রোগী। তাকে একদিন সে দেখতে আসে হাসপাতালে।

সেখানেই সে আমাকে দেখে বারান্দায় ডেকে নিয়ে গিয়ে বলে, কিছু যদি মনে না করেন তো কয়েকটা প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই।

কী বলুন তো?

আপনার মুখের সঙ্গে আমার একটি জানা মহিলার মুখের আশ্চর্য রকম মিল—

তা অনেকের মুখের সঙ্গে অনেকের কোন কোন সময় সে রকম মিল তো দেখা যায়ই।

তা অবিশ্যি যে যায় না তা আমি বলছি না, তবে অনেকদিন হল তিনি নিরুদ্দেশ। আর—

আর—

কিছু যদি মনে না করেন আপনার নামটা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

শীলা রায়—

আশ্চর্য! তার নামও তাই, তিনি দিল্লীতে এক সময় দীর্ঘকাল ছিলেন।

সত্যি!

হ্যাঁ—

কিন্তু, তার মায়ের নাম ছিল বিমলা—

আশ্চর্য তো, আমার মায়ের নামও যে ছিল বিমলা—

কি আশ্চর্য! তবে তো যাকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি—সে আপনি—আমি যে আপনাকেই এতদিন খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম।

আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন!

হ্যাঁ। আপনি এখানে কোথায় থাকেন?

নার্সেস্ কোয়ার্টারে।

কাল বা পরশু যখন হোক একবার আমার আপনার সঙ্গে দেখা হতে পারে কি?

কেন বলুন তো? আপনাকে তো আদেপেই আমি চিনতে পাচ্ছি না, জীবনে কখনও দেখেছি বলেও মনে করতে পাচ্ছি না।

না, তা দেখেন নি, চেননও না সত্যি আপনি আমাকে, তবে—

তবে কি?

না থাক, এখন না—বলব, সব কথাই আপনাকে আমি বলব—

কী কথা বলবেন?

এমন সংবাদ আপনাকে আমি দেব যা জানার পর—

কী?

জীবন ধারণের জন্য এই নার্সিং শেখার ব্যাপারটা আপনার কাছে যেন মনে হবে তুচ্ছ, হাস্যকর—

তাই নাকি?

হ্যাঁ—

॥ ২৭ ॥

বুঝতেই পারছেন কিরীটীবাবু, প্রতাপের ওই ধরণের কথা শোনার পর কৌতূহলটা হওয়া আমার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু এখন ভাবি কি কুক্ষণেই যে সে কৌতূহল আমার জেগেছিল, কি কুক্ষণেই যে ওর সঙ্গে পরের দিনই আমি দেখা করতে স্বীকৃত হয়েছিলাম!

তা যদি না হত তবে হয়তো আজ—আজ এই অপবাদের বোঝা মাথায় নিয়ে এমনই ভাবে চোরের মত আমাকে পালিয়ে দূরদূরান্তে চলে যেতে হত না।

যাক্ সে কথা। যা বলছিলাম বলি।

পরের দিনই দেখা হল আমাদের লেকের ধারে সন্ধ্যা বেলা।

সেই মত নিরিবিলি ব্যবস্থাই আমরা করেছিলাম আগের দিন।

কী কথা আমার সঙ্গে ছিল আপনি বলেছিলেন কাল?

নরহরিবাবুকে চেনেন? শুনেছেন তাঁর নাম?

চমকে উঠেছিলাম ঐ নামটা শুনেই।

বললাম, কোন নরহরির কথা বলছেন?

নরহরি সরকার। বরাহনগরে থাকেন।

চিনি।

কে তিনি আপনার?

কেউ নন।

তা জানি। তবে তাঁর আপনার মার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল।

তা ছিল।

নরহরিবাবু আপনাকে খুঁজছেন তা জানেন ?

না। কিন্তু কেন ?

তিনি তার উইলে আপনাকে তাঁর বিরাট সম্পত্তির মালিক করেছেন—

সে কি ?

তাই। তবে একটা শর্ত আছে।

শর্ত !

হ্যাঁ, যদি আপনি তাঁর ভাগ্নে অনিরুদ্ধ ঘোষকে বিবাহ করেন তবেই তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকার আপনারা দুজনে পাবেন।

কথাটা বলে প্রতাপ সেই সম্পত্তির পরিমাণটা আমাকে জানাল।

সেদিন সারাটা রাত আমি ঘুমোতে পারি নি কিরীটীবাবু।

কারণ পরে অনিরুদ্ধর যে পরিচয় সে আমাকে দিয়েছিল তাতেই জানতে পেরেছিলাম অনিরুদ্ধ আমার পূর্ব পরিচিত অনিরুদ্ধই।

বিধাতার কত বড় নির্মম পরিহাস একবার ভাবুন তো।

অনিরুদ্ধর সঙ্গে যদি আমার বিবাহ হত তাহলে তো আজ অনায়াসেই আমরা ঐ বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতাম।

অথচ—আজ আর তার কোন উপায়ই নেই।

অনিরুদ্ধ বিবাহিত।

আর আমি বিধবা।

এতবড় সম্পত্তি হাতের মুঠোর মধ্যে এসেও মরীচিকার মত মিলিয়ে যাচ্ছে।

পরের দিন আবার আমাদের দেখা হল।

বললাম, সম্পত্তি তো আমরা পাব না।

কেন ? অনিরুদ্ধকে খুঁজে আনব আমি। বিবাহ করুন আপনারা—

কোন লাভ হবে না।

কেন ?

কারণ অনিরুদ্ধ বিবাহিত—

সে কি!

শুধু তাই নয়, আমিও বিবাহিতা—তবে—

তবে?

আমি বিধবা।

কথাটা শুনে প্রতাপ কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইল। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললে, তা হলে আর কি হবে।

দিন দুই বাদে প্রতাপ গুহ আমাকে নার্সেস্ কোয়ার্টারে ফোন করল

আজ একবার দেখা করতে পারেন আমার সঙ্গে?

কেন?

বিশেষ প্রয়োজন আছে। দেখা হলে বলব।

আবার দেখা হল আমাদের।

প্রতাপ বললে, শুনুন শীলাদেবী, আপনি কি সত্যি সত্যিই সম্পত্তিটা চান?

প্রতাপের কথাটার যেন কোন মানেই বুঝতে পারলাম না।

বললাম, আপনার কথাটা তো ঠিক বুঝতে পারলাম না।

চান কিনা আগে বলুন, বুঝবেন পরে। তবে আপনি যদি সম্পত্তিটা চান তো আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারি।

কী করে?

মৃদু অর্থপূর্ণ হাসি হেসে প্রতাপ বললে, বললাম তো সেটা আমার ভাববার কথা। আপনি শুধু সহযোগিতা করে যাবেন আর চুপ করে যা বলব তাই করে যাবেন।

লোভের আগুন জ্বলে উঠল বুকের মধ্যে।

একদিকে লোভ, অন্যদিকে সন্দেহ। কেমন করে কি হবে বুঝতে পারছি না।

বললাম, বুঝতে সত্যিই পারছি না আপনার কথাটা। বিয়ে না হলে ঐ সম্পত্তি তো পাব না।

বিয়ে হবে।

বিয়ে হবে!

হ্যাঁ—

কিন্তু—

শুধু সম্পত্তির জন্যই লোক-দেখান বিয়েটা হবে।

সে কি করে সম্ভব। তাছাড়া অনিরুদ্ধই বা রাজী হবে কেন?

রাজী হবে। নরহরির মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, তারপর যা করবার আমিই করব।

আশ্চর্য!

তখন একবারও মনে হয় নি প্রতাপ গুহ এতবড় উপকারটা আমার কেন করতে চাইছে।

সত্যি লোকটার তুলনা খুঁজে পাই নি সেদিন।

মূর্খ—মূর্খ ছিলাম তাই বুঝতে পারি নি, বুঝতে চাই নি যে বিনা স্বার্থে এতবড় উপকার কেউ করতে পারে না।

লোকটার মহত্ত্বে যেন অন্ধের মতই সেদিন তার প্রতি আমাকে আকর্ষণ করেছিল।

কিন্তু আজ বুঝতে পারছি ব্যাপারটা তা নয়, মহত্ত্বের আকর্ষণ নয়।

আকর্ষণ করেছিল সেদিন তার প্রতি আমারই লোভ।

আমার অর্থলোলুপ মনটা।

ভালবাসা সেটা নয়, কুৎসিত অর্থের উলঙ্গ লোভ সেটা আমার মনের।

আজ অস্বীকার করব না, সত্যি সত্যিই সেদিন স্বপ্ন দেখেছিলাম আমি।

এবং একবারও মনে হয় নি সেদিন ব্যাপারটা কি করে আদৌ সম্ভব।

আর এও বুঝতে পারি নি আসল মতলবটা প্রতাপের মনে কি ছিল।

বুঝতে যেদিন পারলাম সেদিন আর ফিরবার আমার কোন উপায়ই ছিল না।

সামনে পিছনে সমস্ত রাস্তাই তখন আমার কাছে বন্ধ। রুদ্ধ।

কিন্তু যাক সে কথা। যা বলছিলাম তাই বলি।

ঐ ব্যাপার নিয়ে প্রতাপের সঙ্গে ঘন ঘন আমার দেখা হতে লাগল।

আর সেই দেখাশোনার মধ্য দিয়েই ক্রমশঃ মনটা আমার প্রতাপের দিকে ঝুঁকতে লাগল একটু একটু করে।

প্রতাপ যেন আমাকে এক স্বপ্নের রাজ্যে হাত ধরে নিয়ে চলেছিল।

এমনি করে মাস দুই কাটার পর হঠাৎ একদিন প্রতাপ এসে বললে, এখুনি আমাকে বেরুতে হবে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায়?

আগে চল, সব পরে জানতে পারবে।

তাড়াতাড়ি পোশাক বদলে এলাম কিন্তু প্রতাপ আমার দিকে তাকিয়ে বলে, উঁহু, ও বেশে নয়—নার্সের পোশাক পরে এস।

কেন?

একজনকে নার্সিং করতে যেতে হবে।

একটু বিস্মিত হয়েই তাড়াতাড়ি পোশাক বদলে এলাম আবার।

রাত আটটা নাগাদ সে আমাকে নিয়ে গিয়ে কোথায় হাজির হল জানেন?

নরহরির বরাহনগরের বাড়িতে।

এবং সোজা নিয়ে গেল নরহরির শয়ন ঘরে আমাকে।

সকালবেলা থেকে নরহরির এনজাইনার অ্যাট্যাক চলেছে। রোগের যন্ত্রণায় তখন সে আচ্ছন্ন।

বাড়িতে একটি বুড়ী ঝি ছিল ও জনকয়েক ভৃত্য ছিল।

পুরাতন ভৃত্য রামচরণ সে সময় একমাসের ছুটি নিয়ে তার এক ভাইপোর বিয়েতে দেশে বর্ধমানে গিয়েছিল।

একজন ডাক্তার কিছুক্ষণ পরে এলেন।

প্রতাপ আমাকে সেখানে রোগীকে নার্সিংয়ের জন্য এনেছে বললে। ডাক্তার রাজেন ধরও দেখলাম প্রতাপের পূর্বপরিচিত।

ডাক্তার যথাযথ নির্দেশ দিয়ে এক সময় চলে গেলেন। এবং প্রতাপও চলে গেল তার কিছুক্ষণ পরে।

আমি তখন সেই মৃত্যু-আচ্ছন্ন রোগীর শয্যার পাশে বসে রইলাম। রাত যত বাড়তে লাগল রোগী যেন ততই নিস্তেজ হয়ে আসতে লাগল।

সে রাত্রে দুবার আরও এসেছিল প্রতাপ। একবার কি ঔষধও যেন খাওয়াতে গেল। শেষের বার এসে নরহরিবাবুর শিয়রের বালিশের তলা থেকে চাবি বার করে সিন্দুক খুলে কি যেন কাগজপত্র বের করে নিয়ে গেল।

তারপর সেই রাত্রেই নরহরিবাবুর মৃত্যু হয়।

সরকারপক্ষের উকিল আদালতে প্রতাপ গুহকে প্রশ্ন করেছিলেন, নরহরির মৃত্যুর সময় আপনি সেখানে ছিলেন?

না। জবাব দেয় প্রতাপ গুহ।

কিন্তু নার্স মালতী রায় ছিল আপনি আপনার স্টেটমেণ্টে বলেছেন।

ছিল।

শীলা দেবীই বোধ হয় মালতী নামে সেখানে গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ—

কিন্তু কেন বলুন তো?

সে যেন হাসপাতালে ঐ নামেই পরিচয় দিয়েছিল।

কিন্তু কেন?

জানি না।

কথাটা আপনি জানতেন?

জানতাম।

আর একটা কথা প্রতাপবাবু, শীলা সে সময়ে নার্সিংয়ের ট্রেনিংয়ে ছিল, তাই না?

হ্যাঁ—

সে কথাও আপনি জানতেন তাহলে?

জানতাম।

কথাটা জানা সত্ত্বেও আপনি অমন একজন রোগীর সেবার জন্য একজন পিউপিল নার্সকে নরহরি বাবুর নার্সিংয়ের জন্য নিযুক্ত করলেন কি করে?

হাতের কাছে তাড়াতাড়িতে সে সময় অন্য কোন নার্স পাওয়া গেল না—

কলকাতার মত শহরে আপনি একজন নার্স পেলেন না—কথাটা কি খুব বিশ্বাসযোগ্য প্রতাপবাবু?

মৃদু হেসে প্রশ্নটা করলেন পাবলিক প্রসিকিউটার।

যা ঘটেছিল, তাই আমি বলেছি।

আচ্ছা, এ কথা কি সত্যি, নরহরিবাবুর মৃত্যুর কিছুদিন আগে থাকতেই শীলা দেবীর সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়েছিল?

হ্যাঁ, হাসপাতালে ঘটনাচক্রে হয়েছিল।

শীলা দেবীর সত্যিকারের পরিচয়টা আপনি নিশ্চয়ই জানতেন?

না।

জানতেন না?

না।

নরহরিবাবুর মৃত্যুর পর?

তখন জেনেছিলাম।

তখন কেন শীলা দেবীকে উইলের কথাটা বলেন নি ?

বলবার সুযোগ পাই নি—

সুযোগ পান নি ? কেন ?

কারণ নরহরিবাবুর মৃত্যুর দিন চারেক বাদে নার্সেস্ কোয়ার্টারে শীলা দেবীর খোঁজ নিতে গিয়ে শুনলাম—

কি শুনলেন ?

সে দিল্লীতে চলে গিয়েছে তখন।

তা শীলা দেবী নার্সিং পড়তে এসে হঠাৎ নার্সিংয়ের কোর্স শেষ না করেই যে শেষ পর্যন্ত আবার দিল্লীতে ফিরে গেলেন ; বিরাট সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব পাচ্ছেন কথাটা জানতে পেরেই বোধ হয়।

তা কি করে হবে। তিনি তো সে কথা তখন জানতেনই না।

অথচ জানত কথাটা শীলা।

প্রতাপই তাকে বলেছিল।

আদালতে সে কথাটা প্রমাণ করতে না পারলেও, আজ শাশ্বত তার প্রমাণ পেলে কিরীটীকে লেখা শীলার সুদীর্ঘ চিঠিটার মধ্যেই।

শীলা তার চিঠিতে লিখেছে '

নরহরিবাবুর মৃত্যুর পরদিনই প্রতাপের পরামর্শ মত আমি রাত্রের ট্রেনে দিল্লী চলে গেলাম।

প্রতাপ যাবার সময় আমাকে বলে দিয়েছিল, তার চিঠি না পাওয়া পর্যন্ত যেন আমি দিল্লীতেই অপেক্ষা করি।

সেই পরামর্শ মতই আমি দিল্লীতে পৌঁছে প্রতাপের চিঠির অপেক্ষায় বসে রইলাম।

নরহরিবাবুর মৃত্যুর এক মাস পরে প্রতাপ আমাকে উইলের সারমর্ম জানিয়ে দিল্লীতে চিঠি দিল।

বোধ হয় সেই সঙ্গে অনিরুদ্ধকেও চিঠি দিয়েছিল তাকে তার এলাহাবাদের ঠিকানায় ঐ একই কথা জানিয়ে।

যা হোক চিঠি পেয়েই কলকাতায় আমি রওনা হলাম।

উইল-সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে চিঠিটা ছাড়াও আর একখানা পৃথক চিঠি দিয়েছিল আমাকে প্রতাপ।

সে চিঠিতে লেখা ছিল আমি যেন কলকাতায় গিয়ে সোজা টাওয়ার হোটেলে উঠি।

সেখানে আমার নামে একটা রুম রিজার্ভ করে রেখেছে প্রতাপ আগে থাকতেই।

এবং তার সঙ্গে দেখা হওয়ার পূর্বে যেন তার অফিসে কোন মতেই আমি না যাই।

প্রতাপ তার চিঠিতে বিশেষভাবে একটা কথা লিখেছিল।

আমার বিবাহ ও স্বামীর মৃত্যুর কথা অনিরুদ্ধ যখন জানে না এবং জানবার কোন কারণই নেই, তখন যেন সে কথাটা আমি না প্রকাশ করি তার কাছে দেখা হলেও।

কিন্তু প্রতাপের চক্রান্ত যাই থাক না কেন, বিধাতার ইচ্ছা যে ছিল অন্যরূপ তা তো আপনি বুঝতেই পেরেছেন।

বলতে পারেন আমার নিয়তিরই নির্দেশ ছিল বুঝি অন্যরূপ।

এবং সেই নিয়তিরই অলঙ্ঘ্য নির্দেশে শেষ পর্যন্ত আমরা উভয়েই এক ট্রেনে কলকাতাভিমুখে চলতে চলতে পথে ঘটল সেই ভয়াবহ ট্রেন ডিজাস্টার।

একটা কথা বিশ্বাস করেছেন কি না জানি না, নকল অনিরুদ্ধ মানে অনিরুদ্ধরূপী তার শ্যালক তরুণ আমার সঙ্গে ঐ একই ট্রেনে চলেছিল তা সত্যিই সেদিন কিন্তু আমি জানতাম না।

পরে কথাটা শুনেছিলাম।

॥ ২৮ ॥

এবং এ কথাটাও সত্যি, ট্রেনের দুর্ঘটনায় সত্যিই আমার কিছুদিনের জন্য স্মৃতিলোপ হয়েছিল।

এখন ভাবি সে স্মৃতি যদি চিরদিনের মতই লোপ পেয়ে যেতো, তবে হয়তো আজকের এই মর্মান্তিক লজ্জা আর গ্লানির বোঝাটা বাকী জীবনের মত আমাকে বয়ে বেড়াতে হত না।

কিন্তু বললাম তো—নিয়তি ;—নিয়তিই আমাকে এখানে আবার টেনে এনেছিল স্মৃতিশক্তি ফিরে আসার পরেও।

নিয়তি কপালে আমার লিখে রেখেছে ঐ লজ্জা, আর গ্লানি, নিষ্কৃতি পাব কেমন করে!

তাই, বোধ হয় স্মৃতিশক্তি ফিরে আসার পরই আমি সব কথা জানিয়ে কলকাতায় প্রতাপকে চিঠি দিয়েছিলাম।

প্রতাপ আমার চিঠি পাওয়া মাত্রই কাশীতে এসে জগৎকাকার ওখানে আমার সঙ্গে দেখা করল।

সেদিন তার মুখেই প্রথম শুনলাম একই ট্রেনে নাকি অনিরুদ্ধও আসছিল এবং সেও আমার মত দৈবক্রমে বেঁচে গিয়েছে। তবে তার একখানা হাত চিরজন্মের মতই অকর্মণ্য হয়ে গিয়েছে সেই দুর্ঘটনায়।

কাশীতে আমার সঙ্গে জগৎকাকার ওখানে দেখা করে প্রতাপ আমাকে পরামর্শ দিল, আমি যেন কিছুদিন পর তার নির্দেশ পেলে তবে কলকাতায় গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করি।

কিন্তু তখনো বুঝি নি, কেন সে এ কথা আমাকে বলেছিল।

পরে অবিশ্যি বুঝেছিলাম।

অনিরুদ্ধ যে আসল অনিরুদ্ধ নয়, ছদ্মবেশী অনিরুদ্ধ, তা কিন্তু প্রতাপ জানতে পারে নি, তরুণ রায়কে সে সত্যিকারের অনিরুদ্ধ বলেই ধরে নিয়েছিল।

এবং সেই ভেবেই নরহরির সম্পত্তির সত্যিকার ওয়ারিশন হিসাবে তার সঙ্গে একটা চুক্তি করেছিল—অনিরুদ্ধ যেহেতু বিবাহিত, সেহেতু সম্পত্তিটা তার পক্ষে আজ আর পাওয়া সম্ভবপর নয়—ঐ রঙের টেক্কাটি হাতে রেখেই সে অনিরুদ্ধকে তার সঙ্গে একটা চুক্তিতে আসতে বাধ্য করেছিল অবিশ্যি।

কিন্তু বেচারী প্রতাপ তখনো জানত না, অনিরুদ্ধ-বেশী তরুণ রায় লোকটা চাতুরী ও শয়তানী বুদ্ধিতে তার চাইতে কম তো যায়ই না, বরং বেশীই যায়।

অনিরুদ্ধ-বেশী তরুণ রায় যখন বুঝতে পারলে, প্রতাপ তাকে চিনতে পারে নি বা সন্দেহও করে নি, তখন সে বিবাহিত এই ভয়েই যেন ভীত হয়ে প্রতাপের সঙ্গে চুক্তি করছে, এই ভাবে চুক্তি করলে একটা, সেই চুক্তি অনুযায়ী স্থির হলো উভয়ের মধ্যে প্রতাপ অনিরুদ্ধর দাবী ন্যায্য বলে

স্বীকার করে নেবে, তবে প্রতি মাসে দশ হাজার করে টাকা অনিরুদ্ধ তাকে দেবে।

আগেই বলেছি, তরুণ রায় লোকটা ছিল অসাধারণ ধূর্ত। তার ভগ্নীপতি অনিরুদ্ধর সঙ্গে তার যে চুক্তিই থাক, এখনও প্রতাপ তাকে চিনতে পারে নি এবং সেও তাদেরই পথের পথিক ব্যাপারটা জানতে পেরে অনিরুদ্ধর মাথায় কাঁঠাল ভাঙবার জন্য প্রস্তুত হল।

এবং সেই চুক্তি সত্যই আট নয় মাস চলছিল।

কিন্তু তারপরই তরুণ রায় অর্থাৎ ছদ্মবেশী অনিরুদ্ধ বেঁকে বসলো।

বললে, আর টাকা পাবে না তুমি।

টাকা পাব না?

না।

প্রতাপ বললে, মানে! চুক্তি আমাদের ভুলে গেছো?

ভুলবো কেন, মনে আছে বৈকি।

তবে?

তবে আবার কি? আর পাবে না, তাই জানিয়ে দিলাম।

জানো, কালই তোমার সব কথা প্রকাশ করে দিয়ে এখান থেকে তোমাকে তো আমি তাড়াতে পারিই, সেই সঙ্গে প্রতারক ও প্রমাণ করতে পারি। তার পরিণাম—

জেল, এই তো।

সেটা কি বুঝতে পারছ না?

পারব না কেন। পারছি বৈকি। কিন্তু সেই সঙ্গে তোমাকেও কি ঐ ষড়যন্ত্রের অন্যতম অংশীদার বলে জেলে টেনে নিয়ে যাবো না সঙ্গে করে ভেবেছ?

অনিরুদ্ধবাবু! চিৎকার করে ওঠে প্রতাপ।

বলুন প্রতাপবাবু। বান্দা হাজির—

ব্যঙ্গ ঝরে পড়ে তরুণের কণ্ঠস্বরে।

বেশ। I accept your challange। শীঘ্রই আমাদের আবার দেখা হবে। বলে প্রতাপ বের হয়ে এলো।

ঐ ঘটনারই মাস খানেক আগে কাশী থেকে আমার চিঠিটা পেয়েছিল প্রতাপ।

বুঝতেই পারছেন, প্রতাপ এল এবারে আমার কাছে।

এসে বললে, আর সাতদিন পরেই তুমি কলকাতায় আমার অফিসে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবে।

প্রতাপের পরামর্শ মতই এবারে এলাম আমি কলকাতায়।

সেদিন বুঝতে পারি নি কিন্তু আজ বুঝতে পারছি অনিরুদ্ধকে অর্থাৎ অনিরুদ্ধ-বেশী তরুণ রায়কেই জব্দ করবার জন্যই সে সেদিন আমাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিল।

করেছিলও জব্দ আমাকে সামনে খাড়া করে তাকে।

এদিকে আমি আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপ অনিরুদ্ধর ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলার ক্ষমতা আইন জারী করে বন্ধ করে দিল।

যার ফলে তরুণ রায় একেবারে ক্ষেপে গেল।

এবং প্রতাপকে সে নানা ভাবে জব্দ করবার চেষ্টা করতে লাগল তারপর থেকেই।

সে এক বিচিত্র নাটক!

আমাদের দেশে শেয়ানায় শেয়ানায় কোলাকুলি বলে যে একটা কথা আছে এবারে দুজনার মধ্যে ঠিক তাই চলতে লাগল।

এবং উভয়ের মাঝখানে পড়ে আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হল।

ওদিকে সবটুকু না বুঝতে পারলেও আমিও যে প্রতাপের মতলবটা তখন একেবারে বুঝতে পারি নি তা নয়।

এবং তাদের দুজনার অভিসন্ধির মধ্যে পড়ে আমার প্রতি মুহূর্তে মনে হতে লাগল আমি পালাই।

শেষ পর্যন্ত হয়তো পালাতামও।

কিন্তু পারলাম না, আমার পালানো হল না।

॥ ২৯ ॥

তরুণ—এবার থেকে তরুণই বলব তাকে। আর অনিরুদ্ধ বলে ডাকব না।

তরুণ পুলিশকে ফোন করবার পর পুলিশ এসে যখন ঐ বাড়িতে হাজির হল প্রতাপের মুখটা একেবারে চুপসে গেল।

সে ঠিক অতটা ভাবতে পারে নি।

তার মত চতুর মতলববাজ শয়তানের উপরেও যে টেক্কা দিতে পারে প্রতাপ বোধ হয় কথাটা স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি, তরুণ ঐভাবে অতর্কিতে পুলিশ ডেকে এনে।

পুলিশ আসার পরই একদিন গভীর রাত্রে বাগানে যখন একা একা বেড়াচ্ছি তরুণ এসে আমার সামনে নিঃশব্দে দাঁড়াল।

শীলা—

কে?

আমি—

অনিরুদ্ধ—

হ্যাঁ, বোস, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

কী কথা?

বোসই না—

না, আপনি বলুন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুনছি।

অনেক কথা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তো শেষ হবে না। কিন্তু তুমি আমাকে আপনি বলে সম্বোধন করছ কেন!

তবে কি বলে সম্বোধন করব?

কেন, দিল্লীতে পরিচয় হবার পর যেমন 'তুমি' বলে সম্বোধন করতে—

কিন্তু আপনি তো আর সত্যি সত্যিই সেই লোক নন—

কী বললে?

হ্যাঁ, আপনি অনিরুদ্ধর মত দেখতে হলেও অনিরুদ্ধ নন—

তবে—তবে কে—

তা জানি না আপনি কে—তবে অনিরুদ্ধ আপনি নন—

আমি অনিরুদ্ধ নই?

না।

কিছুক্ষণ, অতঃপর তরুণ রায় চুপ করে থেকে বললে, তাহলে তুমি আমাকে চিনতে পেরেছ?

পেরেছি বৈকি! প্রথম দিন দেখেই চিনেছিলাম—

হুঁ। ঠিকই বলেছ। সত্যিই অনিরুদ্ধ আমি নই। আর সেই কথাটা জানাব বলেই আজ এসেছি।

তাই নাকি!

হ্যাঁ, কিন্তু যাক্, তুমি যখন জানই তখন আসল কথাতেই এবার আসা যাক।

আসল কথা?

হ্যাঁ শোন, আমি অনিরুদ্ধ নই—আমার নাম তরুণ রায়। যদিচ আসল অনিরুদ্ধর পরামর্শ মতই এখানে আমি এসেছি—

কেন?

বলাই বাহুল্য তার সঙ্গে আমার একটা চুক্তি হয়েছে এবং সে চুক্তি অনুযায়ী আমার একটা লাভের ব্যাপার আছে বলেই এখানে এসেছিলাম অনিরুদ্ধ হয়ে।

কি চুক্তি?

তুমি জান না বোধ হয় অনিরুদ্ধ বিবাহিত।

জানি।

জানো?

হ্যাঁ—

ও। শোন—অনিরুদ্ধর সঙ্গে আমার চুক্তি হয়েছিল যতটা পারি টাকা হাতিয়ে নেবো আমি এবং তার আধাআধি বখরা হবে—

তাই নাকি!

হ্যাঁ, কিন্তু মাঝখানে প্রতাপ পড়ে সব ভেস্তে দিল। টাকার অর্ধেক সে নিতে লাগল, বাকী অর্ধেক আমরা দুজনে এতকাল পাচ্ছিলাম। আমার অবিশ্যি তাতে আপত্তি ছিল না কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনিরুদ্ধর পরামর্শেই আমি প্রতাপকে অর্ধেক দিতে অস্বীকার করলে সে তোমাকে এখানে নিয়ে এলো এবং টাকা বন্ধ করে দিল।

তারপর?

সেই তারপরের জন্যই আমি তোমার কাছে এসেছি—

কী রকম?

অনিরুদ্ধ তার স্ত্রী বর্তমানে কোন দিনই তোমাকে বিয়ে করে আইনত নরহরির সম্পত্তি পেতে পারে না আর তুমিও পাবে না— কারণ তুমিও তাকে বিয়ে না করলে পাবে না। তাই সে—

তাই কি—

অনিরুদ্ধর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।

কী কথা?

লোক দেখানো ভাবে আমরা মানে তুমি ও আমি একটা বিয়ে করবো—কিন্তু—

কিন্তু কি ?

ঐ বিয়ে পর্যন্তই—তারপর এই সম্পত্তি আমাদের হাতে এলে সম্পত্তির তিনটি ভাগ হবে। অর্ধেক ভাগ পাবে অনিরুদ্ধ, বাকী অর্ধেক দুই সমান ভাগে এক ভাগ আমি, এক ভাগ তুমি। অতঃপর আমরা কেউ কারোর পথে দাঁড়াবো না। যে যার পথ দেখে নেবো ইচ্ছামত। তুমি যদি এতে রাজী থাক তো—

আমার কথা ছেড়ে দিন, আপনি রাজী আছেন কি এ প্রস্তাবে ?

হ্যাঁ, তা আছি বৈকি।

আপনি ঠিক বলছেন ঐ চুক্তি মত নির্বিঘ্নে কাজ হাসিল হয়ে যাবে ?

তাই তো আশা করি।

হুঁ। তা বেশ, এখন আমাকে কি করতে হবে ?

প্রতাপ যেন ব্যাপারটা না জানতে পারে বা ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ না করে।

অর্থাৎ—

অর্থাৎ যেমন চলছে তেমনি চলবে। আমরা পরস্পর যে ভাবে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহার করে চলেছি, প্রতাপের সন্দেহ যাতে করে উদ্রিক্ত না হয় সেই ভাবেই ঠিক তাই আমাদের চালিয়ে যেতে হবে।

এটাই তা'হলে আপনার মনের কথা ?

এবারে মৃদু হাসলো। প্রত্যুত্তরে তরুণ হেসে বললে, বুদ্ধিমতী তুমি, বুঝতে পেরেছো দেখছি। তবে খুলেই বলি, মোটেই তা নয়—

তবে ?

সে কথা সময়ে জানতে পারবে। আগে ব্যাপারটা চুকে যাক তো।

বেশ।

তবে তুমি রাজী ?

রাজী।

ব্যাপারটা হয়তো ঐ ভাবেই চলতো কিন্তু তা হলো না, কারণ তরুণের সত্যিকারের মনের কথা বুঝতেও আমার দেরি হয় নি, যে মুহূর্তে মন্দিরা চ্যাটার্জীর সংবাদটা আমি পেয়েছিলাম।

এবং তখুনি বুঝেছিলাম আমি যে তিমিরে সে তিমিরেই আছি। সেই

সময় প্রতাপ এলো আবার নতুন প্রস্তাব নিয়ে, জুয়েলগুলো যদি হাতিয়ে নিতে পারি তা হলে সে আমাকে বিয়ে করে ঘর বাঁধবে এই আশ্বাস দিতে।

মূর্খ আমি তাই তার সে প্রস্তাবে আবার জীবনে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিলাম। কিন্তু একটা ব্যাপার ঐ সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, কিছুদিনের মধ্যেই প্রতাপ জুয়েলস্‌গুলোর কথা আমাকে বললে বটে কিন্তু চাবিটা সে কিছুতেই আমার হাতে তুলে দিচ্ছে না। চাবির কথা বললেই সে নানা অজুহাত দেখিয়ে সময় নিতে লাগল।

এদিকে আমরাও অর্থাৎ আমি ও তরুণ রায় পূর্ব্বের মতই অভিনয় করে যেতে লাগলাম পরস্পরের মধ্যে আমাদের চুক্তি অনুযায়ী।

মামলা চলাকালীন সময়ের মধ্যেই অকস্মাৎ একদিন তরুণ রায় কলকাতায় ফিরে এসে পুলিশের কাছে ধরা দিল।

তাকে আদালতে এনে হাজির করা হল।

সে স্পষ্টই কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বললে, অনিরুদ্ধর পরামর্শ মতই সে সব কিছু করেছে। সব কিছু দোষ সে অনিরুদ্ধর ঘাড়েই চাপিয়ে দিল।

শাশ্বত আবার শীলার চিঠির শেষাংশে মন দিল।

আপনি হয়তো বলবেন কিরীটী বাবু, পরিস্থিতিটা যখন অমনি ঘোলাটে হয়ে উঠল আমি সব কথা প্রকাশ করে দিলাম না কেন?

নিজের লোভ আর বোকামির জালে যে নিজে জড়িয়েছি কি করে সব কথা প্রকাশ করি। আমিও যে প্রতারণার দায়ে পড়বো।

তাইতো আজ যাবার আগে মনে হচ্ছে যা কিছু ঘটলো সবই আমার ভবিতব্য। আমার নিষ্ঠুর ভবিতব্যই এখানে হাত ধরে আমায় নিয়ে এসেছিল এই কলঙ্ক আর লজ্জা সর্বাঙ্গে আমার মেখে দেবার জন্য।

শেষ একটা অনুরোধ মাত্র, এ চিঠিটা কাউকে দেখাবেন না। এবং পারেন তো পড়া হয়ে গেলে পুড়িয়ে ফেলবেন।

চিঠিটা শেষ করে শাশ্বত সামনের জানালা পথে তাকাল।

রাত্রি শেষ হয়ে আসছে।

তারই আভাস রাত্রিশেষের আকাশে।

॥ ১ ॥

দেখা হয়ে গেল দুজনের।

রজত আর সুজাতা।

এতদিন পরে এমনি করে দুজনার আবার দেখা হয়ে যাবে কেউ কি ওরা ভেবেছিল!

দুজনে দুদিকে যে ভাবে ছিটকে পড়েছিল তারপর আবার কোন দিন যে দেখা হবে তাও এক বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্যে ব্যাপারটা দুজনের কাছেই ছিল সত্যি স্বপ্নাতীত।

তবু দেখা হল দুজনার।

রজত আর সুজাতার।

দুজনের একজন আসছিল লাহোর থেকে। অন্যজন লক্ষ্ণৌ থেকে।

এবং দুজনেরই কলকাতায় আগমনের কারণ হচ্ছে একই লোকের কাছ থেকে পাওয়া দুখানা চিঠি।

আরও আশ্চর্য, যখন ওরা জানতে পারল একই দিনে নাকি দুজনে এই চিঠি দুখানা পেয়েছে!

একই তারিখে লেখা দুখানা চিঠি।

এবং একই কথা অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে দুখানা চিঠিতে লেখা। আর সেই চিঠি পেয়েই লক্ষ্ণৌ থেকে সুজাতা ও লাহোর থেকে রজত একই দিনে রওনা হয়ে এক ঘণ্টা আগে-পিছে হাওড়া স্টেশনে এসে নামল।

পরবর্তী উত্তরপাড়া যাবার লোকাল ট্রেণটা ছিল ঘণ্টা দেড়েক পরে।

দুজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল তাই হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফরমের উপরেই।

এ কি! সুজাতা না? রজত প্রশ্ন করে বিস্ময়ে।

কে, ছোড়দা! সুজাতাও পাল্টা বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্নটা করে।

কোথায় যাচ্ছিস? লক্ষ্ণৌ থেকেই আসছিস নাকি?

হ্যাঁ, উত্তরপাড়া। ছোট্‌কার একটা জরুরী চিঠি পেয়ে আসছি।

আশ্চর্য! আমিও তো ছোট্‌কার জরুরী চিঠি পেয়েই উত্তরপাড়ায় যাচ্ছি। জবাবে বলে রজত।

রজত ও সুজাতা জ্যেঠতুত ও খুড়তুত ভাই বোন। একজন থাকে লাহোরে, অন্যজন লক্ষ্ণৌতে।

প্রায় দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে ভাই বোনে সাক্ষাৎ।

এদিকে ট্রেণ ছাড়বার শেষ ঘণ্টা তখন বাজতে শুরু করেছে।

তাড়াতাড়ি দুজনে সামনের লোকাল ট্রেণটায় উঠে বসল।

শীতের বেলা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। বেলা সবে সাড়ে চারটে হলেও, বাইরের আলো ইতিমধ্যেই ঝিমিয়ে এসেছে।

ইতিমধ্যেই অফিস-ফেরতা নিত্যকার কেরাণী যাত্রীদের ভিড় শুরু হয়ে গেছে ট্রেণে। ট্রেণের কামরায় ঠেসাঠেসি গাদাগাদি। সেকেণ্ড ক্লাশ কামরায় ভিড় থাকলেও ততটা ভিড় নেই। একটা বেঞ্চের একধারে ওরা কোনমতে একটু জায়গা করে নিয়ে গায়ে গা দিয়ে বসে পড়ল।

দুজনেই ভাবছিল বোধ হয় একই কথা।

ছোটকাকা বিনয়েন্দ্রর জরুরী চিঠি পেয়ে দুজনে, একজন লাহোর থেকে অন্যজন লক্ষ্ণৌ থেকে আসছে উত্তরপাড়ায় তার সঙ্গে দেখা করতে।

জরুরী চিঠি পেয়ে আসছে ওরা কিন্তু তখনো জানে না কী ব্যাপারে জরুরী চিঠি দিয়ে তাদের আসতে বলা হয়েছে।

অথচ গত দশ বৎসর ধরে তাদের ওই কাকা বিনয়েন্দ্র যদিও আপনার কাকা, তার সঙ্গে ওদের কোন সম্পর্কই ছিল না।

দেখা-সাক্ষাৎ বা মুখের আলাপে কুশল প্রশ্ন পর্যন্ত দূরের কথা, গত দশ বৎসর পরস্পরের মধ্যে ওদের কোন পত্র বিনিময় পর্যন্ত হয় নি। ওরাও সত্যি কথা বলতে কি ভুলেই গিয়েছিল যে, ওদের একজন আপনার কাকা এ সংসারে কেউ এখনো আছেন!

সেই কাকার কাছ থেকে জরুরী চিঠি। অত্যন্ত জরুরী তাগিদ, পত্র পাওয়ামাত্র যেন চলে আসে ওরা উত্তরপাড়ায়। ইতি অনুতপ্ত ছোট্‌কা। চিঠির মধ্যে কেবল এতকাল পরে আসবার জন্য ওই জরুরী তাগিদটুকু

থাকলেই ওরা এভাবে চিঠি পাওয়ামাত্রই চলে আসত কিনা সন্দেহ। আরও কিছু ছিল সেই সংক্ষিপ্ত চিঠির মধ্যে যেটা গুরুত্বের দিক দিয়ে ওরা অস্বীকার করতে পারে নি। এবং যে কারণে ওরা চিঠি পাওয়ামাত্রই না এসেও পারে নি।

কল্যাণীয়েষু রজত,

আমার আর বেশী দিন নেই। স্পষ্ট বুঝতে পারছি মৃত্যু আমায় একেবারে সন্নিকটে এসে দাঁড়িয়েছে। তার হাত থেকে আর আমার কোন মতেই নিস্তার নেই। দাদুর প্রেতাত্মার চেষ্টা এতদিনে বোধ হয় সফল হবেই বুঝতে পারছি। আগে কেবল মধ্যে মধ্যে রাতের বেলা তাকে দেখতাম, এখন যেন তাকে দিনে রাত্রে সব সময়ই দেখতে পাচ্ছি। সেই প্রেত-ছায়া এবারে বোধ হয় আর আমাকে নিস্তার দেবে না। এতকাল যে কেন তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখি নি যাবার আগে অন্তত সে কথাটা তোমাকে জানিয়ে যদি না যাই এবং আমার যা কিছু তোমার হাতে তুলে না দিয়ে যেতে পারি তবে মরণের পরেও হয়তো আমার মুক্তি মিলবে না। তাই আমার শেষঅ সুরোধ এই চিঠি পাওয়ামাত্রই রওনা হবে।

ইতি আশীর্বাদক, অনুতপ্ত, ভাগ্যহীন, তোমার ছোট্‌কা।

সুজাতার চিঠিতেও অক্ষরে অক্ষরে একই কথা লেখা। কেবল কল্যাণীয়েষু রজতের জায়গায় লেখা, কল্যাণীয়া মা সুজাতা।

তাই যত মন কষাকষিই থাক, দীর্ঘদিনের সম্পর্কহীন এবং ছাড়াছাড়ি থাকা সত্ত্বেও রজত বা সুজাতা কেউই তাদের ছোট্‌কা বিনয়েন্দ্রর ওই চিঠি পড়ে রওনা না হয়ে পারে নি।

গত দশ বৎসরই না হয় ছোট্‌কার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই কিন্তু এমন একদিন তো ছিল যখন ওই ছোট্‌কাই ছিল ওদের বাড়ির মধ্যে সবার প্রিয়। যত কিছু আদর আব্দার ছিল ওদের ঐ ছোট্‌কার কাছেই।

সেজন্য রজতের মাও কম তো বলেন নি ওদের ছোট্‌কাকে।

প্রত্যুত্তরে ছোট্‌কা হেসেছেন শুধু ওদের দুজনকে পরমস্নেহে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে।

ছোট্‌কার ওরা দুজনেই যে ছিল বাড়ির মধ্যে একমাত্র সঙ্গী বা সাথী।

হাসতে হাসতে ছোট্‌কা রজতের মাকে সম্বোধন করে বলেছেন, না, না, ওদের তুমি অমন করে বল না।

রজতের মা জবাবে বলেছেন, না বলবে না। আদর দিয়ে দিয়ে ওদের

মাথা দুটো যে চিবিয়ে খাচ্ছ। দুটিই সমান ধিঙ্গি হয়েছে, লেখাপড়ার নামে ঘণ্টা। কেবল ছোট্‌কা, এটা দাও, ছোট্‌কা ওটা দাও, এটা করো ছোট্‌কা, ওটা করো।

আহা, অমন করে বল না বউদি। একজন এই বয়সে বাপ হারিয়েছে, আর একজন তো বাপ মা দুটো বালাই-ই চুকিয়ে বসে আছে।

সত্যিই তো!

রজতের বাবা অমরেন্দ্রনাথ সেক্রেটারিয়েটে বড় চাকরি করতেন। তিন ভাই অমরেন্দ্র, সুরেন্দ্র ও বিনয়েন্দ্রর মধ্যে তিনিই ছিলেন জ্যেষ্ঠ। অল্প বয়সেই দেখা দিল রক্তচাপাধিক্য, হঠাৎ করোনারী থ্রম্বসিসে একদিন দ্বিপ্রহরে অফিসে কাজ করতে করতেই অজ্ঞান হয়ে গেলেন। জ্ঞানহীন অমরেন্দ্রনাথকে অ্যাম্বুলেন্সে করে বাড়িতে নিয়ে আসা হল কিন্তু লুপ্ত জ্ঞান আর তাঁর ফিরে এল না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল। রজতের বয়স তখন সবেমাত্র নয় বৎসর। এক বৎসরও ঘুরল না, সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। একটা ব্রিজ কনসট্রাকসনের তদ্বির করে ফিরছিলেন সস্ত্রীক নিজের গাড়িতেই। ড্রাইভার ড্রাইভ করছিল। একটা রেলওয়ে ক্রশিংয়ের বাঁকের মুখে ড্রাইভার স্পীডের মুখে গাড়ি টার্ণ নিতে গিয়ে গাড়ি উল্টে গিয়ে একই সঙ্গে ড্রাইভার ও সস্ত্রীক সুরেন্দ্রনাথের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে সঙ্গে সঙ্গেই।

সুজাতার বয়স তখন বছর ছয়েক মাত্র।

অতি অল্প বয়সে মা ও বাপকে এক সঙ্গে হারালেও সুজাতার খুব বেশী অসুবিধা হয় নি। কারণ সে প্রকৃতপক্ষে তার জন্মের পর থেকেই আয়ার কোলে ও জেঠাইমার তত্ত্বাবধানে মানুষ হচ্ছিল। বাপ-মার সঙ্গে তার সম্পর্ক খুব কমই ছিল। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর কনসট্রাকসনের কাজে বাইরে বাইরেই সর্বদা ঘুরে বেড়াতেন, সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন তাঁর স্ত্রী সুপ্রিয়া।

সুজাতার যা কিছু আদর-আব্দার ছিল তার ছোট্‌কা বিনয়েন্দ্রনাথ ও জেঠীমার কাছেই।

একটা বৎসরের মধ্যেই সাজান-গোছান সংসারটার মধ্যে যেন অকস্মাৎ একটা ঝড় বহে গেল। সব কিছু ওলটপালট হয়ে গেল।

সমস্ত ঝক্কি ও দায়িত্ব এসে পড়ল বিনয়েন্দ্রনাথের ঘাড়ে।

বিনয়েন্দ্রনাথ তখন রসায়ণে এম, এস, সি, পাশ করে এক বে-সরকারী কলেজে সবেমাত্র বৎসর দুই হলো অধ্যাপনার কাজ নিয়েছেন ও ডক্টরেটের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

সংসারের টাকা পয়সার ব্যাপারটা কোন দিনও তাঁকে ভাবতে হয় নি ইতিপূর্বে। যা আয় করতেন তার সবটাই তাঁর ইচ্ছামত রসায়ণ শাস্ত্রের বই কিনে ও ভাইপো ভাইঝিদের আদর-আব্দার মিটাতেই ব্যয় হয়ে যেত। কিন্তু হঠাৎ যেন মোটা রকমের উপার্জনক্ষম মাথার উপরে দুই ভায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে সমস্ত ঝক্কি এসে তাঁকে একেবারে বিব্রত করে তুলল।

কিন্তু অত্যুৎসাহী, সদাহাস্যময় আনন্দ ও জ্ঞানপাগল বিনয়েন্দ্রনাথকে দেখে সেটা বোঝবার উপায় ছিল না।

অমরেন্দ্রনাথ যত্র আয় করতেন তত্র ব্যয় করতেন ; কাজেই মৃত্যুর পর সামান্য হাজার ২।৩ টাকা ব্যাঙ্কে ছাড়া আর কিছুই রেখে যেতে পারেন নি এবং সময়ও পান নি।

সুরেন্দ্রনাথও তাই, তবে হাজার পনের টাকার জীবন-বীমা ছিল তাঁর।

বিনয়েন্দ্রনাথ বউদির শত অনুরোধেও বিবাহ করলেন না, নিজের রিসার্চ ও ভাইপো ভাইঝিদের নিয়েই দিন কাটাতে লাগলেন।

এমনি করেই দীর্ঘ চোদ্দটা বছর কেটে গেল।

রজত বি, এ, পাশ করে এম, এ, ক্লাশে ভর্তি হলো ও সুজাতা বি, এ, ক্লাশে সবে নাম লিখিয়েছে এমন সময় অকস্মাৎ একটা ঘটনা ঘটল।

অমরেন্দ্র, সুরেন্দ্র ও বিনয়েন্দ্রর মাতামহ অম্বিকাচরণ রায় সেকালের একজন বর্ধিষ্ণু জমিদার, থাকতেন উত্তরপাড়ায়।

একদিন বিনয়েন্দ্র কলেজ থেকেই সেই যে দাদুকে তাঁর দেখতে গেলেন তাঁর উত্তরপাড়ার বাড়িতে, আর ফিরে এলেন না কলকাতার বাসায়।

সন্ধ্যার দিকে উত্তরপাড়া থেকে অবিশ্যি বিনয়েন্দ্রর একটা চিঠি একজন লোকের হাত দিয়ে এসেছিল রজতের মার নামে এবং তাতে লেখা ছিল :

বউদি,

দাদুর হঠাৎ অসুখের সংবাদ পেয়ে উত্তরপাড়ায় এসে দেখি তাঁর মস্তিষ্ক-বিকৃতিটা কয়েকদিন থেকে একটু বেশী রকমই বাড়াবাড়ি চলেছে। তাঁকে দেখবার কেউ নেই, এ অবস্থায় তাঁকে একা একটিমাত্র চাকরের ভরসায় ফেলে ফিরতে পারছি না। তবে একটু সুস্থ হলে যাব। রজতই যেন একরকম করে সব চালিয়ে নেয়।

ইতি বিনয়েন্দ্র।

ওইটুকু সংবাদ ছাড়া ওদের কলকাতার বাসার ওই লোকগুলোর খরচ-পত্র কেমন করে কোথা থেকে চলবে তার কোন আভাস মাত্রও সে চিঠিতে ছিল না।

বিনয়েন্দ্রর পক্ষে ওই ধরণের চিঠি দেওয়াটা একটু বিচিত্রই বটে।

যাহোক সেই যে বিনয়েন্দ্র উত্তরপাড়ায় চলে গেলেন আর সেখান থেকে ফিরলেন না।

এবং দ্বিতীয় আর কোন সংবাদও দিলেন না দীর্ঘ তিন মাসের মধ্যে; এমন কি সকলে কে কেমন আছে এমনি ধরণের কোন একটি কুশল সংবাদ নিয়েও কোন সন্ধান বা পত্র এল না ওই দীর্ঘ তিন বৎসরে।

রজতের মা বিনয়েন্দ্রর এতাদৃশ ব্যবহারে বেশ কিছুটা মর্মাহত তো হলেনই এবং অভিমানও হলো তাঁর সেই সঙ্গে।

আশ্চর্য! বিনয়েন্দ্র অকস্মাৎ সকলকে কেমন করে ভুলে গেল আর ভুলতে পারলই বা কী করে! যাহোক অভিমানের বশেই রজতকে পর্যন্ত তাঁর অনুরোধ সত্ত্বেও একদিনের জন্যও তিনি বিনয়েন্দ্রর সন্ধানে যেতে দিলেন না।

যাক, সে যদি ভুলে থাকতে পারে তাঁরাই বা কেন তাকে ভুলে থাকতে পারবেন না।

॥ ২ ॥

উত্তরপাড়ায় বিনয়েন্দ্রর যে মাতামহ ছিলেন অনাদি চক্রবর্তী, তাঁর বয়স প্রায় তখন সত্তরের কাছাকাছি।

এমন একদিন ছিল যে সময় উত্তরপাড়ায় চক্রবর্তীদের ধনসম্পদের প্রবাদটা কিংবদন্তীর মতই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে হচ্ছে রামানন্দ চক্রবর্তীর যুগ। অথচ খুব বেশী দিনের কথাও তো সেটা নয়। কলকাতায় সে সময় ইংরাজ কুঠিয়ালদের প্রতিপত্তি সবে শুরু হয়েছে। রামানন্দ ছিলেন ওইরূপ এক কুঠিরই মুচ্ছুদ্দি। রামানন্দ বিয়ে করেছিলেন ভাটপাড়ার বিখ্যাত গাঙ্গুলী পরিবারে। বউ লক্ষ্মীরাণী ছিলেন অপরূপ সুন্দরী। কিন্তু সুখে বা আনন্দে সংসার তিনি করতে পারেন নি।

হঠাৎ এক নিষুতি রাতে রামানন্দের ঘরে ডাকাত পড়ল। ডাকাতদের হাতে ছিল গাদা বন্দুক আর জলন্ত মশাল।

ডাকাতের দল কেবল যে রামানন্দর ধনদৌলতই লুঠ করল তাই নয়, লুঠ করে নিয়ে গেল ওই সঙ্গে তার পরমাসুন্দরী যুবতী স্ত্রী লক্ষ্মীরাণীকেও।

সত্য কথাটা কিন্তু রামানন্দ কাউকেই জানতে দিলেন না। তিনি রটনা করে দিলেন ডাকাতদের হাতে লক্ষ্মীরাণীর মৃত্যু ঘটেছে।

দুচারজন আত্মীয়স্বজন কথাটা বিশ্বাস না করলেও উচ্চবাচ্য করতে সাহস করল না বা রামানন্দর বিরুদ্ধে দাঁড়াতেও সাহস পেল না রামানন্দের প্রতিপত্তি ও ধনৈশ্বর্যের জন্যই বোধ হয়।

রামানন্দের একটি মাত্র ছেলে যোগেন্দ্র চক্রবর্তী। যোগেন্দ্রকে বুকে নিয়ে রামানন্দ স্ত্রী বিচ্ছেদের দুঃখটা ভুলবার চেষ্টা করতে লাগলেন কিন্তু কিছুতেই যেন ভুলতে পারেন না লক্ষ্মীরাণীকে।

সুরার আশ্রয় নিলেন। এবং শুধু সুরাই নয় সেই সঙ্গে এসে জুটল বাগানবাড়িতে বাঈজী চন্দনা বাঈ।

হু হু করে সঞ্চিত অর্থ বের হয়ে যেতে লাগল।

তারপর একদিন যখন তাঁর মৃত্যুর পর তরুণ যুবা যোগেন্দ্রর হাতে বিষয়সম্পত্তি এসে পড়ল, রামানন্দর অর্জিত বিপুল ঐশ্বর্যের অনেকখানিই তখন শুঁড়ীর দোকান দিয়ে সাগরপারে চালান হয়ে গেছে।

এদিকে উচ্ছৃংখলতার যে বিষ রামানন্দের রক্ত থেকে তাঁর সন্তানের রক্তের মধ্যেও ধীরে ধীরে সংক্রামিত হচ্ছিল, রামানন্দ কিন্তু সেটা জানতে পারলেন না, এবং বাপের মৃত্যুর পর থেকেই তাঁর এতদিনকার জানা উচ্ছৃংখলতা স্বমূর্তিতে যেন প্রকাশ পেল।

এবং যোগেন্দ্র তাঁর উচ্ছৃংখলতায় বাপকেও ডিঙিয়ে গেলেন যেন।

এবং কাল তার মৃত্যু হল আরও অল্প বয়সে। তার পুত্র অনাদির বয়ঃক্রম যখন মাত্র আঠার বৎসর। সম্পত্তিও তখন অনেকটা বেহাত হয়ে গেছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও অনাদি ছিলেন যাকে বলি সত্যিকারের উদ্‌যোগী পুরুষ-সিংহ। তিনি তাঁর চেষ্টায় ও অধ্যাবসায়ের দ্বারা ক্রমশঃ সেই জীর্ণ দেউলকে সংস্কার করে ভাগ্যের চাকাটা আবার ফিরিয়ে দিলেন।

অনাদির কোন পুত্রসন্তান জন্মায় নি। জন্মেছিল মাত্র একটি কন্যা সুরধনী।

লক্ষ্মীরাণী চক্রবর্তী পরিবার থেকে লুণ্ঠিতা হলেও তার রূপের যে ছাপ চক্রবর্তী পরিবারে রেখে গিয়েছিল সেটা পরিপূর্ণভাবে যেন ফুটে উঠেছিল সুরধনীর দেহে।

অপরূপ সুন্দরী ছিলেন সুরধনী। এবং চক্রবর্তীদের ঘরে লক্ষ্মীরাণীর যে

অয়েল-পেনটিংটা ছিল তার মুখের গঠন ও চেহারার নিখুঁত মিল যেন ছিল ওই সুরধনীর চেহারায়।

অনাদি চক্রবর্তী অল্প বয়সেই সুরধনীর বিবাহ দেন গরীবের ঘরের এক অসাধারণ মেধাবী ছাত্র মৃগেন্দ্রনাথের সঙ্গে।

অমরেন্দ্র ও সুরেন্দ্রের জন্মের পর তৃতীয়বার যখন সুরধনীর সন্তান সম্ভাবনা হলো তিনি উত্তরপাড়ার পিতৃগৃহে আসেন কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে।

মৃগেন্দ্রনাথ অসাধারণ মেধাবী ছাত্র হলেও জীবনে তেমন উন্নতি করতে পারেন নি। অথচ নিজে অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ও আত্মাভিমানী ছিলেন বলে শ্বশুর অনাদি চক্রবর্তীর বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁর কোনরূপ সাহায্যও কখনো গ্রহণ করেন নি। এবং স্ত্রীকেও সহজে পিতৃগৃহে যেতে দিতেন না।

এজন্য জামাই মৃগেন্দ্রর উপরে অনাদি চক্রবর্তী কোনদিন সন্তুষ্ট ছিলেন না।

ঠাট্টা করে বলতেন, সাপ নয় তার কুলপানা চক্র।

ধনী পিতার আদরিণী ও সুন্দরী কন্যা সুরধনীও স্বামীর প্রতি কোন দিন খুব বেশী আকৃষ্ট হন নি। কারণ তাঁর রূপের মত ধনেরও একটা অহঙ্কার ছিল।

সেবারে যখন অনেক অনুনয় বিনয় করবার পর দিন সাতেকের কড়ারে সুরধনী পিতৃগৃহে এলেন এবং সাতদিন পরেই ঠিক মৃগেন্দ্র স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এলেন, সুরধনী বললেন, আর কটা দিন তিনি থাকতে চান।

মৃগেন্দ্র রাজী হলেন না। বললেন, না, চল।

কেন, থাকি না আর কটা দিন।

না সুরো। গরীব আমি, আমার স্ত্রী বেশী দিন ধনী শ্বশুরের ঘরে থাকলে লোকে নানা কথা বলবে।

তা কেন বলতে যাবে। বাপের বাড়িতে গিয়ে থাকবে।

না, চল। মানুষকে তুমি চেন না, তারা বাঁকা ভাবেই নেবে।

সবারই তো তোমার মত বাঁকা মন নয়।

কী বললে, আমার মন বাঁকা?

তা নয়তো কী। অন্য কোথাও নয়, এ আমার নিজের বাপের বাড়ি। থাকিই না কটা দিন আর, গিয়েই তো আবার সেই হাঁড়ি ঠেলা শুরু।

ও, সোনার পালঙ্কে দুদিন শুয়েই বুঝি আরাম ধরে গেছে!

কোথা থেকে কী হয়ে গেল।

সমান বক্রভাবে সুরধনী জবাব দিলেন, সোনার পালঙ্কে ছোটবেলা থেকেই শোওয়া আমার অভ্যাস। তোমরাই বরং চিরদিন কুঁড়েঘরে থেকেছ, তোমাদেরই চোখে ধাঁধা লাগা সম্ভব দুদিনের সোনার পালঙ্কে শুয়ে, আমাদের নয়।

হুঁ। আচ্ছা বেশ, থাক তবে তুমি এখানেই।

মৃগেন্দ্র চলে গেলেন।

সত্যি সত্যি মৃগেন্দ্রর দিক থেকে পরে আর কোন ডাকই এল না।

সুরধনী এবং অনাদি চক্রবর্তী ভেবেছিলেন দু একদিন পরেই হয়তো মৃগেন্দ্রর রাগ পড়বে কিন্তু দেখা গেল দু একদিন বা দু এক সপ্তাহ তো দূরের কথা দশ বছরেও মৃগেন্দ্র চক্রবর্তী বাড়ির ছায়া পর্যন্ত আর মাড়ালেন না। এমন কী সুরধনীর মৃত্যুসংবাদ পেয়েও তিনি এলেন না। কেবল জ্যেষ্ঠ পুত্র অমরেন্দ্রকে ও সঙ্গে একটি ভৃত্য পাঠিয়ে দিলেন তাদের হাতে এক চিঠি দিয়ে অবিলম্বে বিনয়েন্দ্রকে তাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দেবার জন্য।

বিনয়েন্দ্র চক্রবর্তী বাড়িতেই জন্মেছিল এবং দাদুর আদরে মানুষ হচ্ছিল।

অনাদি ফেরত পাঠিয়ে দিলেন নাতিকে।

সেই থেকেই অনাদি চক্রবর্তীর সঙ্গে মৃগেন্দ্রদের আর কোন সম্পর্ক ছিল না।

কোন পক্ষই কেউ কারোর সন্ধান করতেন না বা কোনরূপ খোঁজখবরও নিতেন না।

॥ ৩ ॥

আরও অনেকগুলো বছর গড়িয়ে গেল।

মৃগেন্দ্রও মারা গেলেন একদিন।

অমরেন্দ্র, সুরেন্দ্র লেখাপড়া শিখে উপার্জন শুরু করল, সংসার করল, তাদের ছেলেমেয়ে হল। কিন্তু চক্রবর্তী বাড়ির সঙ্গে এবাড়ির আর যোগাযোগ ঘটে উঠল না।

যক্ষের মত বৃদ্ধ অনাদি চক্রবর্তী একা একা তাঁর উত্তরপাড়ার বিরাট প্রাসাদোপম অট্টালিকা নীলকুঠিতে দিন কাটাতে লাগলেন।

অল্প বয়সে বিনয়েন্দ্র মাতামহের স্নেহের নীড় ছেড়ে এসে ক্রমে তাঁর

দাদুকে তুলতে পেরেছিলেন কিন্তু ভুলতে পারেন নি অনাদি চক্রবর্তী। একটি বালকের স্মৃতি সর্বদা তাঁর মনের পর্দায় ভেসে বেড়াত।

তথাপি প্রচণ্ড অভিমানবশে কোনদিনের জন্য বিনয়েন্দ্রর খোঁজ খবর নেন নি বা তাকে ডাকেন নি অনাদি চক্রবর্তী।

চক্রবর্তী বাড়ির পুরাতন ভৃত্য রামমচরণ কিন্তু বুঝতে পারত বৃদ্ধ অনাদি চক্রবর্তীর মনের কোথায় ব্যথাটা। কিন্তু সে দু একবার মুখ ফুটে অনাদি চক্রবর্তীকে কথাটা বলতে গিয়ে ধমক খেয়ে চুপ করে গিয়েছিল বলে আর উচ্চবাচ্য করে নি কোনদিন।

শেষের দিকে বৃদ্ধ অনাদি চক্রবর্তীর মাথায় কেমন একটু গোলমাল দেখা দিল।

প্রথম প্রথম সেটা তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য মনে হয় নি বলেই রামচরণ ততটা মাথা ঘামায় নি কিন্তু শেষটায় যখন একটু বাড়াবাড়ি শুরু হল, তখন সে অনন্যোপায় হয়ে বিনয়েন্দ্রনাথকেই তার কলেজে, সরকার মশাইকে দিয়ে তার নিজের জবানীতেই একটা চিঠি লিখে পাঠাল।

খোকাবাবু,

কর্তাবাবু, আপনার দাদুর অবস্থা খুবই খারাপ। আপনি হয়তো জানেন না আপনার চলে যাওয়ার পর থেকেই বাবুর মাথার একটু একটু গোলমাল দেখা দেয়। এবং সেটা আপনারই জন্য, আপনাকে হারিয়ে এবারে হয়তো আর বাঁচবেন না। তাই আপনাকে জানাচ্ছি একটিবার এ সময়ে যদি আসেন তো ভাল হয়।

ইতি রামুদা।

চিঠিটা পেয়ে বিনয়েন্দ্র কলেজের লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে বসলেন।

একবার দুবার তিনবার চিঠিটা পড়লেন।

শৈশবের আনন্দ কলহাসি মুখরিত জীবনের অনেকগুলো পৃষ্ঠা যেন তাঁর মনের মধ্যে পর পর উল্টে যেতে লাগল।

বহুকাল পরে আবার মনে পড়ল সেই বৃদ্ধ স্নেহময় দাদুর কথা।

বিশেষ করে মধ্যে মধ্যে একটা কথা যা তাঁর দাদু তাঁকে প্রায়ই বলতেন, তোর বাবা যদি তোকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চায় দাদুভাই, চলে যাবি না তো?

বিনয়েন্দ্র জবাবে বলেছেন, ইস, অমনি নিয়ে গেলেই হল কিনা

যাচ্ছে কে। তোমাকে কোনদিনও আমি ছেড়ে যাব না দাছু, দেখে নিও তুমি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দাছু তাকে আটকে রাখতে পারেন নি।

ছেড়ে দিতেই হয়েছে।

পরের জিনিসের উপর তার জোর কোথায়।

বিনয়েন্দ্রর মনটা ছটফট করে ওঠে। তিনি তখুনি বের হয়ে পড়েন দাছুর ওখানে যাবার জন্যে।

দীর্ঘ একুশ বছর বাদে সেই পরিচিত বাড়িতে এসে প্রবেশ করলেন বিনয়েন্দ্র।

বিরাট প্রাসাদ শূন্য—যেন খাঁ খাঁ করছে।

সিঁড়ির মুখেই বাড়ির পুরাতন ভৃত্য রামচরণের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, রামচরণ প্রথমটায় ওকে চিনতে পারে নি কিন্তু বিনয়েন্দ্র ঠিকই চিনেছিল।

মাথার চুল সাদা হয়ে গেলেও মুখের চেহারা তার বিশেষ একটা পরিবর্তিত হয় নি।

রামুদা না?

কে?

আমাকে চিনতে পারছ না রামুদা, আমি খোকাবাবু, বিনু।

বিনু! খোকাবাবু, সত্যি সত্যিই তুমি এতদিন পরে এলে! চোখে জল এসে যায় রামচরণের।

দাছু—দাছু কেমন আছেন রামুদা?

চল। উপরে চল।

রামচরণের পিছু পিছু বিনয়েন্দ্র দোতলায় যে ঘরে অনাদি চক্রবর্তী থাকতেন সেই ঘরে এসে প্রবেশ করলেন।

বিকৃত-মস্তিষ্ক অনাদি চক্রবর্তী তখন ঘরের মধ্যে একা একা পায়চারি করছিলেন আপন মনে ভূতের মত।

পদশব্দে ফিরে তাকালেন।

দৃষ্টি ক্ষীণ—স্পষ্ট কিছুই দেখতে পান না।

রামচরণ বললে, এই জ্বর নিয়ে আবার বিছানা ছেড়ে উঠে ঘরের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছেন!

বেশ করছি। আমার খুশি। তোর বাবার কি!

এখুনি মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন যে !

পড়ি পড়ব মাথা ঘুরে, তোর বাবার কী !

এমন সময় বিনয়েন্দ্র ডাকেন, দাদু !

কে ?

চকিতে ঘুরে দাঁড়ালেন অনাদি চক্রবর্তী।

দাদু, আমি বিনু।

বিনু ! বিনু !

হঠাৎ অনাদি চক্রবর্তীর সমস্ত দেহটা থর থর করে কেঁপে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যাচ্ছিলেন টলে ; কিন্তু চকিতে এগিয়ে গিয়ে বলিষ্ঠ দু হাতে বিনয়েন্দ্র ততক্ষণে পতনোন্মুখ বৃদ্ধকে ধরে ফেলেছেন।

আর ফেরা হল না বিনয়েন্দ্রর।

চক্রবর্তীদের নীলকুঠিতেই রয়ে গেলেন।

এবং মাস চারেক বাদে অনাদি চক্রবর্তী মারা গেলেন।

অনাদি চক্রবর্তী মারা যাবার পর দেখা গেল তিনি তাঁর স্থাবর অস্থাবর যা কিছু সম্পত্তি ছিল সব এবং মায় চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স সব কিছু দিয়ে গিয়েছেন বিনয়েন্দ্রকেই।

কিন্তু তার মধ্যে দুটি সর্ত আছে।

বিনয়েন্দ্র জীবিতকালে তাঁর ঐ নীলকুঠি ছাড়া অন্যত্র কোথাও গিয়ে থাকতে পারবেন না। তাহলেই তাঁর সমস্ত সম্পত্তি চলে যাবে ট্রাষ্টির হাতে এবং তখন একটি কপর্দকও আর পাবেন না। দ্বিতীয়তঃ অমরেন্দ্র সুরেন্দ্রর সন্তানসন্ততিদের সঙ্গেও কোন সম্পর্ক রাখতে পারবেন না।

মৃগেন্দ্রর প্রথম দুই সন্তান অমরেন্দ্র ও সুরেন্দ্র তাদের বাপের মতই হয়েছিল। কখনও তারা দাদুর ওখানে আসে নি এবং দাদুর কথা কোন-ক্রমে উঠলে কখনও প্রীতিকর কথা বলত না।

সেই সব অনাদি চক্রবর্তীর কানে যাওয়ায় তিনি তাদের কোনদিনই ভাল চোখে দেখতে পারেন নি।

এবং সেই কারণেই হয়তো তিনি তাদের বঞ্চিত করে যাবতীয় সম্পত্তি একা বিনয়েন্দ্রকেই দিয়ে গিয়েছিলেন।

উইলটা অনাদি চক্রবর্তী মৃত্যুর পাঁচ বছর আগেই করেছিলেন।

বিনয়েন্দ্র উত্তরপাড়ার নীলকুঠি থেকে আর ফিরলেন না। সবাই আত্মীয় অনাত্মীয়রা বুঝল এবং বললে, বিষয় সম্পত্তি উইল অনুযায়ী সেখান থেকে এলে হাত ছাড়া হয়ে যাবে বলেই তিনি সেখান থেকে আর এলেন না।

কিন্তু আসলে বিনয়েন্দ্র যে আর নীলকুঠি থেকে ফিরে আসেন নি তার একমাত্র কারণ তার মধ্যে ঐ বিরাট সম্পত্তির ব্যাপারটা থাকলেও একমাত্র কারণ কিন্তু তা নয়। অন্য মুখ্য একটা কারণ ছিল।

বহুদিনের ইচ্ছা ছিল তাঁর একটি নিজস্ব ল্যাব্রোটারী তৈরি করে নিজের ইচ্ছেমত গবেষণা নিয়ে থাকেন। কিন্তু তার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন সে অর্থ তো তাঁর ছিল না। এখন দাদুর মৃত্যুতে সেই সুযোগ হাতের মুঠোর মধ্যে আসায় বহুদিনের তাঁর অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাটি পূরণ করবার পক্ষে আর কোন বাধাই এখন অবিশিষ্ট রইল না। এবং দীর্ঘ তিন বছর পরে আবার সব কথা খুলে বলে তিনি রজতের মাকে একটা দীর্ঘ পত্র দিয়েছিলেন।

কিন্তু রজতের মা সে চিঠি পড়লেন না পর্যন্ত, খাম সমেত ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে জানালা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিলেন।

দিনের পর দিন অপেক্ষা করেও বিনয়েন্দ্র চিঠির কোন জবাব পেলেন না।

আবার চিঠি দিলেন।

দ্বিতীয় চিঠিও প্রথম চিঠিটার মতই অপঠিত অবস্থায় শতছিন্ন হয়ে জানালা পথে নিক্ষিপ্ত হলো।

দীর্ঘ দুমাস অপেক্ষা করবার পরও যখন সেই দ্বিতীয় চিঠিরও কোন জবাব এল না, প্রচণ্ড অভিমানে বিনয়েন্দ্র আর ওপথ মাড়ালেন না।

তারপর আরও পাঁচটা বৎসর কালের বুকে মিলিয়ে গেল।

হঠাৎ একদিন বিনয়েন্দ্র সংবাদ পেলেন, রজত লাহোরে চাকরি নিয়ে তার মাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল, সেখানেই বৌদির মৃত্যু হয়েছে।

এবং সুজাতাও তার পরের বৎসর বি, এ, পাশ করে লক্ষ্ণৌয়ে চাকরি নিয়ে চলে গেছে।

একজন লাহোরে, অন্যজন লক্ষ্ণৌতে।

॥ ৪ ॥

সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে রজত আর সুজাতা গঙ্গার ধরে নীলকুঠির লোহার ফটকটার সামনে এসে সাইকেল-রিক্সা থেকে নেমে এবং রিক্সার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে গেট দিয়ে ঢুকতে যাবে এমন সময় হঠাৎ বাধা পেয়ে তাদের দাঁড়াতে হল।

দাঁড়ান।

গেটের সামনে বাধা দিয়েছিল একজন লাল পাগড়ি পরিহিত কনস্টেবল।

কে আপনারা, কী ব্যাপার। দু'জনেই থমকে দাঁড়ায়।

কোথা থেকে আসছেন?

রজত বললে, আমার নাম রজত সান্যাল আর ইনি আমার বোন সুজাতা সান্যাল। আমি আসছি লাহোর থেকে আর আমার বোন লক্ষ্ণৌ থেকে।

ও, তা এ বাড়ির মালিক—বিনয়েন্দ্র সান্যাল।

রজত আবার বললে, আমাদের কাকা।

বিনয়েন্দ্রবাবু তাহলে—

বললাম তো আমাদের কাকা।

আপনারা তা হলে কি কিছুই জানেন না?

কিছু জানি না মানে! কি জানি না?

গেটের সামনেই ঢোকার মুখে পুলিশ কর্তৃক বাধা পেয়েই মনের মধ্যে উভয়েরই একটা অজানিত আশঙ্কা জাগছিল। এখন পুলিশ প্রহরীদের কথায় সে আশঙ্কাটা যেন আরও ঘনীভূত হয়।

এ বাড়ির কর্তা কাল রাত্রে খুন হয়েছেন।

অ্যাঁ! কী বললে?—যুগপৎ একটা অস্ফুট আর্তচীৎকারের মতই যেন একই মুহূর্তে দু-জনের কণ্ঠ হতে কথাটা উচ্চারিত হল।

সংবাদটা শুধু আকস্মিকই নয়, অভাবনীয়।

হ্যাঁ বাবু, বড় দুঃখের বিষয়। এ বাড়ির কর্তাকে কাল রাত্রে কে যেন খুন করেছে।

রজত বা সুজাতা দু-জনের একজনের ওষ্ঠ দিয়েও কথা সরে না। দু-জনেই বাক্যহারা, বিস্মিত, স্তম্ভিত।

ভিতরে যান, ইনেস্‌পেকটারবাবু আছেন।

কিন্তু কি বলছ তুমি, আমি যে কিছুই মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছি না। এ বাড়ির কর্তা নিহত হয়েছেন মানে? রজত কোন মতে প্রশ্নটা করে।

পুলিশ প্রহরীটি মৃদু কণ্ঠে বললে, সেই জন্যই তো বাড়িটা পুলিশের প্রহরায় আছে। যান, ভিতরে যান, ভিতরে দারোগাবাবু আছেন, তাঁর কাছেই সব জানতে পারবেন।

কিন্তু পা যেন আর চলে না।

অতর্কিত একটা বৈদ্যুতিক আঘাতে যেন সমস্ত চলচ্ছক্তি ওদের লোপ পেয়ে গেছে।

এই চরম দুঃসংবাদের জন্যেই কী তারা এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এল পত্র পাওয়ামাত্রই!

গেট পার হবার পর পায়ে চলা একটা লাল সুরকী ঢালা রাস্তা। শেষ হয়েছে গিয়ে সেটা প্রশস্ত একটা গাড়িবারান্দার নীচে।

গাড়িবারান্দায় উঠলেই সামনে যে হলঘরটা সেটাই বাইরের ঘর।

হলঘরের দরজাটা খোলা এবং সেই খোলা দরজা-পথে একটা আলোর ছটা বাইরের গাড়িবারান্দায় এসে পড়েছে। যন্ত্রচালিতের মতই দুজনে হলঘরটার মধ্যে খোলা দরজা-পথে গিয়ে প্রবেশ করল।

তাদের কাকা বিনয়েন্দ্রর আকস্মিক নিহত হবার সংবাদটা যেন দুজনারই মনকে অতর্কিত আঘাতে একেবারে অবশ করে দিয়েছে। সত্যি কথা বটে দীর্ঘদিন ঐ কাকার সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্কই ছিল না। এমন কি দীর্ঘ গত দশ বৎসরে পরস্পরের মধ্যে কোন পত্রযোগে সংবাদের আদান-প্রদান পর্যন্ত ছিল না।

তথাপি সংবাদটা তাদের বিহ্বল করে দিয়েছে।

ব্যাপারটা সঠিক কি হল, এখনও যেন তারা বুঝে উঠতে পারছে না।

হলঘরের মধ্যে প্রবেশ করে তাই তারা দুজনেই যেন থমকে দাঁড়াল।

এ বাড়িতে ইতিপূর্বে ওরা কখনও আসে নি। এই প্রথম এল।

বিরাট হলঘরটি।

এক পায়ে চৌকীর উপরে বিস্তৃত ফরাস। তার উপর এদিক-ওদিক কয়েকটা মলিন তাকিয়া পড়ে আছে।

অন্য দিকে কয়েকটা পুরাতন আমলের রং-চটা, ভেলভেটের গদীমোড়া, মলিন ভারি কারুকার্য করা সেগুন কাঠের তৈরি কাউচ।

দেওয়ালে বড় বড় কয়েকটি অয়েল-পেনটিং।

চোগাচাপকান পরিহিত ও মাথায় পাগড়ী আঁটা পুরুষের প্রতিকৃতি। এই চক্রবর্তীদের স্বনামধন্য সব পূর্বপুরুষদেরই প্রতিকৃতি বলেই মনে হচ্ছে।

মাথার উপরে সিলিং থেকে দোদুল্যমান বেলোয়ারী কাচের সেকেলে ঝাড়বাতি। তবে আগে হয়তো এককালে সেই সব বাতিদানের মধ্যে জ্বলত মোমবাতি, এখন জ্বলছে তারই মধ্যে বিজলী বাতি।

এবং ঝাড়ের সবগুলি বাতি জ্বলছে না, জ্বলছে মাত্র দুটি অল্প শক্তির বিদ্যুৎ বাতি। যাতে করে অত বড় হলঘরটায় আলোর খাঁকতি ঘটেছে।

স্বল্প আলোয় সর্বত্র যেন একটা ছমছমে ভাব।

ঘরের মধ্যে কেউ নেই।

শুধু ঘরের মধ্যে কেন এত বড় বিরাট নীলকুঠিটার মধ্যে কেউ আছে বলেই মনে হয় না। কোন পরিত্যক্ত কবরখানার মতই একটা যেন মৃত্যুশীল স্তব্ধতা সমস্ত বাড়িটার মধ্যে চেপে বসেছে।

এ বাড়িতে রজত বা সুজাতা ইতিপূর্বে একবারও আসে নি। অপরিচিত সব কিছু।

দুজনে কিছুক্ষণ হলঘরটার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে।

তারপর আবার একসময় সামনের ভেজান দরজাটা খুলে অন্দরের দিকে পা বাড়ায়:

লম্বা একটা দীর্ঘ টানা বারান্দা। নির্জন খাঁ-খাঁ করছে।

এখানেও একটি স্বল্প শক্তির বিদ্যুৎ বাতির জন্য রহস্যময় একটা আলো-ছায়ার থমথমে ভাব।

বারান্দায় প্রবেশ করে রজত একবার চারিদিকে তার চোখের দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিল।

ঘরের মত সেই বারান্দাটাও শূন্য। এবং হঠাৎ তার নজরে পড়ল বারান্দার মাঝামাঝি জায়গায় অর্ধেক ভেজান একটা দ্বারপথে ঘরের মধ্যকার একটা ক্ষীণ আলোর আভাস আসছে।

সেই ঘরের দিকেই এগুবে কিনা রজত ভাবছে, এমন সময় অল্প দূরে সামনেই দোতলায় উঠবার সিঁড়িতে ভারি জুতোর মচ্ মচ্ শব্দ শোনা যেতেই উভয়েরই দৃষ্টি সেই দিকে গিয়ে নিবদ্ধ হল।

প্রশস্ত সিঁড়ি।

॥ ৫ ॥

সিঁড়ির খানিকটা দেখা যাচ্ছে, তারপরেই বাঁয়ে বাঁক নিয়ে উপরে উঠে গেছে বোঝা যায় সিঁড়িটা।

মচ্ মচ্ ভারি জুতোর শব্দটা আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নিচেই নেমে আসছে মনে হল।

আপাতত ওরা দুজনেই উদগ্রীব হয়ে শব্দটাকে লক্ষ্য করে ঐ দিকেই তাকিয়ে থাকে।

ক্রমে বারান্দার অল্প আলোয় ওদের নজরে পড়ল দীর্ঘকায় এক পুরুষ মূর্তি।

পুরুষ মূর্তিটিই জুতোর শব্দ জাগিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন।

আগন্তুক দৈর্ঘ্যে প্রায় ছয় ফুট হবেন।

পরিধানে মুসলমানী চেপা পায়জামা, গায়ে কালো সার্জের গলাবন্ধ ঝুল সেরওয়ানী। পায়ে কালো ডার্বী জুতো।

মুখখানি লম্বাটে ধরণের।

কালো ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। সরু গোঁফ। মাথার চুল ঘন কুঞ্চিত, চোখে সরু ফ্রেমের চশমা।

হাতে একটি মোটা লাঠি। লাঠিটা ডান হাতে ধরে উঁচু করে নামছিলেন ভদ্রলোক।

হঠাৎ সিঁড়ির নিচে অল্প দূরেই দণ্ডায়মান ওদের দু-জনের দিকে নজর পড়তেই নামতে নামতে সিঁড়ির মাঝখানেই দাঁড়িয়ে পড়লেন। এক হাতে লাঠিটা ধরে ওদের দিকে তাকালেন।

চশমার লেন্সের ভিতর দিয়ে চোখের দৃষ্টি জোড়া যেন ওদের সর্বাঙ্গ লেহন করতে লাগল।

ওরাও নিঃশব্দে দণ্ডায়মান আগন্তুকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কোন পক্ষ থেকেই কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না।

কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল এমনি।

হঠাৎ এমন সময় সেই স্তব্ধতার মধ্যে একটা পুরুষের কণ্ঠস্বর পশ্চাৎ দিক থেকে শুনতে পেয়েই রজত ঘুরে ফিরে তাকাল পশ্চাতের দিকে।

এ কি! পুরন্দরবাবু কোথায় বের হচ্ছেন?

দ্বিতীয় আগন্তুককে দেখা মাত্রই রজতের বুঝতে কষ্ট হয় না তিনি কোন পুলিশের লোক।

পরিধানে চিরন্তন পুলিশের পোশাক। পরিধানে লংস ও হাফসার্ট, কাঁধে পুলিশের ব্যাজ।

হ্যাঁ। একটু বাইরে থেকে ঘুরে না এলে মারা পড়ব, মিঃ বসাক।

পুরন্দরবাবুর প্রত্যুত্তরে পুলিশ অফিসার মিঃ বসাক বললেন, কিন্তু আপনাকে তো সকাল বেলাতেই বলে দিয়েছিলাম, আপাততঃ investigation শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনাদের কারোরই কোথাও এবাড়ি থেকে বের হওয়া চলবে না মিঃ চৌধুরী।

বেশ রুক্ষ ও কর্কশ কণ্ঠেই এবারে পুরন্দর চৌধুরী প্রত্যুত্তর দিলেন, কিন্তু কেন বলুন তো। এ আপনাদের অন্যায় জুলুম নয় কী?

অন্যায় জুলুম বলছেন?

নিশ্চয়ই। আপনাদের কি ধারণা তাহলে আমিই বিনয়েন্দ্রকে হত্যা করেছি?

সে কথা তো আপনাকে আমি বলি নি।

তবে? তবে এভাবে আমাকে বাড়ির মধ্যে নজরবন্দী করে রাখবার মানেটা কা? কী উদ্দেশ্য বলতে পারেন?

উদ্দেশ্য যাই থাক, আপনাকে যেমন বলা হয়েছে তেমনি চলবেন।

আর যদি না চলি?

পুরন্দরবাবু, আপনি ছেলেমানুষ নন, জেনেশুনে আইন অমান্য করবার অপরাধে যে আপনাকে পড়তে হবে সেটা ভুলে যাবেন না।

বলেই যেন সম্পূর্ণ পুরন্দর চৌধুরীকে উপেক্ষা করে এবারে মিঃ বসাক দণ্ডায়মান রজত ও সুজাতার দিকে ফিরে তাকালেন।

বারান্দায় প্রবেশ করা মাত্রই ওদের প্রতি নজর পড়েছিল মিঃ বসাকের, কিন্তু পুরন্দর চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলবার জন্যে ওদের সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলেন নি বোধ হয়।

এবারে ওদের দিকে তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললেন, আপনারা?

রজত সংক্ষেপে নিজের ও সুজাতার পরিচয় দিল, আমি আর সুজাতা এই এখুনি আসছি।

কিন্তু আপনারা এত তাড়াতাড়ি এলেন কি করে?

কি বলছেন আপনি মিঃ বসাক? রজত প্রশ্ন করে।

মানে আমি বলছিলাম আজই তো বেলা দশটা নাগাদ আপনাদের দু'জনকে আসবার জন্য তার করেছি।

তার করেছেন ?

হ্যাঁ। এ বাড়িতে গত রাত্রে যে দুর্ঘটনা ঘটেছে !

আমরা শুনেছি।

আপনারা শুনেছেন ! শুনেছেন যে বিনয়েন্দ্রবাবু—

হ্যাঁ শুনেছি। বাইরে গেটের সামনে যে পুলিশ প্রহরীটি আছে তার মুখেই শুনেছি। কিন্তু আমরা তো কাকার জরুরী চিঠি পেয়েই আসছি।

জরুরী চিঠি পেয়ে—মানে বিনয়েন্দ্রবাবুর চিঠি পেয়ে ?

হ্যাঁ।

আশ্চর্য ! আপনারাও কি তাহলে ওরই মত বিনয়েন্দ্রবাবুর চিঠি পেয়েই আসছেন নাকি ?

সত্যিই বিচিত্র ব্যাপার দেখছি। মিঃ বসাক বললেন।

হ্যাঁ।

যাক্। তাহলে আমি একাই নয়। আপনারাও আমার দলে আছেন। কথাটা বললেন এবার পুরন্দর চৌধুরী।

সকলে আবার পুরন্দর চৌধুরীর দিকে ফিরে তাকালেন।

কই, কী চিঠি পেয়েছেন দেখি, আছে আপনাদের কাছে সে চিঠি ?

হ্যাঁ।

রজতই প্রথমে তার পকেট থেকে চিঠিটা বের করে দিতে দিতে সুজাতার দিকে তাকিয়ে বললে, তোর চিঠিটা আছে তো ?

হুঁ, এই যে। বলতে বলতে সুজাতাও তার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটা মুখ-ছেঁড়া খামসমেত চিঠি বের করে মিঃ বসাকের হাতে তুলে দিল।

বারান্দার অল্প আলোতেই দু'খানা চিঠি পর পর পড়লেন মিঃ বসাক। তারপর আবার মৃদু কণ্ঠে বললেন, আশ্চর্য ! একই ধরণের চিঠি, একেবারে হুবহু এক।

নিন, থাকুন এবারে এখানে আমার মতই নজরবন্দী হয়ে। পুরন্দর চৌধুরী আবার কথা বললেন।

মিঃ বসাক কিন্তু পুরন্দর চৌধুরীর ওই ধরণের কথায় মুখে কোনরূপ মন্তব্য না করলেও একবার তীব্র দৃষ্টিতে পুরন্দর চৌধুরী তাকালেন, তারপর আবার

ওদের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, আপনাদের সঙ্গে কোন জিনিসপত্র আনেন নি রজতবাবু?

বিশেষ কিছু তো সঙ্গে আনি নি, ওর একটা আর আমার একটা বেডিং ও দু'জনের দুটো সুটকেশ।

সেগুলো কোথায়?

বাইরে দারোয়ানের ছোট ঘরটাতেই রেখে এসেছি।

ঠিক আছে। আসুন, আপাততঃ আমার ঐ ঘরেই।

মিঃ বসাক ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন, রজত ও সুজাতা তাঁকে অনুসরণ করল এবং পুরন্দরবাবুকে কিছু না বলা সত্ত্বেও তিনিও ওদের সঙ্গে সঙ্গেই অগ্রসর হলেন।

দরজার কাছাকাছি যেতেই একজন প্রৌঢ় ব্যক্তিকে বারান্দার অপর প্রান্ত থেকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল।

এই যে রামচরণ! শোন. এদিকে এস।

ঐ প্রৌঢ়ই এবাড়ির পুরাতন ভৃত্য রামচরণ।

॥ ৬ ॥

রামচরণ মাত্র আঠার বছর বয়সে এবাড়িতে এসে চাকরী নিয়েছিল অনাদি চক্রবর্তীর কাছে। বাড়ি তার মেদিনীপুরে।

দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর তার এবাড়িতে কেটে গেছে।

ষাটের উর্ধ্বে বর্তমানে তার বয়স হলেও একমাত্র কেশে পাক ধরা ছাড়া দেহের কোথাও বার্ধক্যের দাঁত বসে নি।

বেঁটে-খাটো বেশ বলিষ্ঠ গঠনের লোক।

পরিধানে একটা পরিষ্কার শাদা ধুতি ও শাদা মের্জাই। কাঁধে একটা পরিষ্কার তোয়ালে।

রামচরণ মিঃ বসাকের ডাকে এগিয়ে এসে বললে, আমাকে ডাকছিলেন ইন্‌স্‌পেক্টারবাবু?

হ্যাঁ। তোমার চা হলো?

জল ফুটে গেছে, এখুনি নিয়ে আসছি।

এদের জন্যেও চা নিয়ে এসো, এদের বোধ হয় তুমি চিনতে পারছ না?

আজ্ঞে না তো!

এঁরা তোমার কর্তাবাবুর ভাইপো ও ভাইঝি। উপরে এঁদের থাকবার ব্যবস্থা করে দাও। আর হ্যাঁ, দেখ, বাইরে দারোয়ানের ঘরে এঁদের জিনিসপত্র আছে, সেগুলো মালীকে দিয়ে ভিতরে আনাবার ব্যবস্থা কর।

যে আজ্ঞে—

রামচরণ বোধ হয় আজ্ঞা পালনের জন্যই চলে যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ সুজাতার কথায় থমকে দাঁড়াল।

সুজাতা বলছিল, কিন্তু আমি তো এখানে থাকতে পারব না ছোড়দা, আমি কলকাতায় যাব।

মিঃ বসাক ফিরে তাকালেন সুজাতার দিকে তার কথায়, কেন বলুন তো সুজাতা দেবী?

না না—আমি এখানে থাকতে পারব না, আমার যেন কেমন দম বন্ধ হয়ে আসছে। ছোড়দা, আমি কলকাতায় যাব।

কেমন যেন ভীত শুষ্ক কণ্ঠে কথাগুলো বলে সুজাতা।

মিঃ বসাক হাসলেন, বুঝতে পারছি সুজাতা দেবী, আপনি একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। কিন্তু ভয়ের কিছু নেই, আমিও আজকের রাত এখানেই থাকব, কলকাতায় ফিরে যাব না। তাছাড়া এই রাত্রে কলকাতায় গিয়ে সেই হোটেলেই তো উঠবেন। তার চাইতে আজকের রাতটা এখানেই কাটান না, কাল সকালে যা হয় করবেন।

হ্যাঁ। সেই ভাল সুজাতা। রজত বোঝবার চেষ্টা করে।

না ছোড়দা, কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। থাকতে হয় তুমি থাক, আমি কলকাতায় ফিরেই যাব। সুজাতা আবার প্রতিবাদ জানায়।

তা যেতে হয় যাবেন 'খন। আবার বললেন মিঃ বসাক।

এবারে সুজাতা চুপ করেই থাকে।

কিন্তু আজকের রাতটা সত্যিই থেকে গেলে হত না সুজাতা? রজত বোঝাবার চেষ্টা করে।

না—

শোন্ একটা কথা। বলে রজত সুজাতাকে এক পাশে নিয়ে যায়।

কী?

তোর যাওয়াটা বোধ হয় এক্ষুনি উচিত হবে না।

কেন?

কাকার কি করে মৃত্যু হল সেটাও তো আমাদের জানা প্রয়োজন।

তাছাড়া আমি রয়েছি, আরও এত পুলিশের লোক রয়েছে—ভয়টাই বা কি ?

না ছোড়দা—

যেতে হয় কাল সকালেই না হয় যাস। চল্—

ঐ সময় মিঃ বসাকও আবার বললেন, চলুন, ঘরে চলুন। শুধু আমরাই নয় মিস্ রয়, এ বাড়ি ঘিরে আট দশজন পুলিশ প্রহরীও আছে এবং সারা রাতই তারা থাকবে।

সকলে এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

এ ঘরের সাইজটাও নেহাৎ ছোট নয়। বেশ প্রশস্তই। মনে হল চারিদিকে চেয়ে ঘরটা ইদানিং খালিই পড়ে থাকত।

একটা টেবিল ও এদিক ওদিক খানকতক চেয়ার ও একটা আরাম কেদারা ছাড়া ঘরের মধ্যে অন্য কোন আসবাবপত্রই আর নেই।

এবং ঘরের আলোটা কম শক্তির নয়। বেশ উজ্জ্বলই।

টেবিলের উপরে একটা সিগ্রেটের টিন, একটা দেশালাই ও একটা ফ্ল্যাট্ ফাইল পড়ে ছিল। মিঃ বসাক রজতের দিকে তাকিয়ে বললেন, বসুন রজতবাবু, বসুন সুজাতা দেবী। পুরন্দরবাবু বসুন।

সকলে এক একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন।

রজতই প্রথমে কথা বললে।

মিঃ বসাক তাঁর ডাইরীতে রজতবাবু সম্পর্কে যা লিখেছিলেন তা হচ্ছে রজতবাবুর বয়স ত্রিশ বত্রিশের মধ্যে। বেশ বলিষ্ঠ দোহারা গঠন। গায়ের রং কালো। চোখে মুখে একটা বুদ্ধির দীপ্তি আছে। এম, এ, পড়তে পড়তে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে লাহোরের একটা মার্চেণ্ট্ অফিসে তাঁর মামার সুপারিসেই চাকরি পেয়ে বছর পাঁচ আগে লাহোরে চলে যান। রজতবাবুর মামা লাহোরের সেই অফিসেই উচ্চপদস্থ একজন কর্মচারী ছিলেন।

কিন্তু গত বছর দুয়েক হল রজতবাবু সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে লাহোরে আনারকলি অঞ্চলে একটা ঔষধ ও পারফিউমারীর দোকান নেন এক পাঞ্জাবী মুসলমান বন্ধুর সঙ্গে আধাআধি বখরায়।

মধ্যে মধ্যে প্রায়ই ব্যবসার প্রয়োজনে কলকাতায় আসতেন বটে তবে কখনও কাকা বিনয়েন্দ্রর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন নি বা উত্তরপাড়ায় ইতিপূর্বে কখনও আসেন নি।

আর সুজাতা দেবী।

রজতবাবুর চাইতে বছর চার পাঁচেক বয়সে ছোটই হবেন।

দেখতে অপরূপ সুন্দরী। সে বোধ হয় তার অপরূপ সুন্দরী পিতামহী সুরধনী দেবীর চোখ ঝলসান রূপের ধারাটাকে বহন করে এনেছিল।

চোখে মুখে অদ্ভুত একটা শান্ত নিরীহ সরলতা যেন।

সুজাতা লক্ষ্ণৌতে চাকরি করছে। বি, এ, পাশ। বিবাহ করে নি।

॥ ৭ ॥

রজতই প্রথমে কথা বললে, কিন্তু কি করে কি হলো কিছুই যে আমি বুঝে উঠতে পারছি না মিঃ বসাক। ছোট্কার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে আমাদের কোন যোগাযোগ ছিল না সত্যি বটে, তবে তাঁকে তো ভাল করেই জানতাম। তাঁর মত অমন ধীর স্থির শান্ত চরিত্রের লোককে কেউ হত্যা করতে পারে এ যে কখনও কিছুতেই বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না।

মিঃ বসাক মৃদু কণ্ঠে বললেন, বিশ্বাস না করতে পারলেও ব্যাপারটা যে ঘটেছে তা তো অস্বীকার করতে পারবেন না রজতবাবু। তাছাড়া দীর্ঘদিন বিনয়েন্দ্রবাবুর সঙ্গে আপনাদের কোন যোগাযোগ পর্যন্ত ছিল না। তাঁর সম্পর্কে কোন কথাও আপনারা শোনেন নি।

তা অবিশ্যি ঠিক।

এই সময়ের মধ্যে তাঁর কোন পরিবর্তন হয়েছিল কিনা এবং এমন কোন কিছু ঘটেছিল কিনা যে জন্য এই দুর্ঘটনা ঘটল তাও তো আপনি বলতে পারেন না।

তা অবিশ্যি পারি না।

আচ্ছা পুরন্দরবাবু,—হঠাৎ মিঃ বসাক পার্শ্বেই উপবিষ্ট পুরন্দর চৌধুরীর দিকে ফিরে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনি তো তাঁর বিশেষ বন্ধু ছিলেন, তাঁর সম্পর্কে কোন কিছু আপনি জেনেছিলেন?

না। He was a perfect gentleman। গম্ভীর কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দিলেন পুরন্দর চৌধুরী।

এবারে আবার মিঃ বসাক রজতের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, আমি লালবাজার থেকে এসে পৌঁছবার আগেই এখানকার থানা-ইনচার্জ রামানন্দবাবু যতটা সম্ভব তদন্ত করেছিলেন। তাঁর রিপোর্ট থেকে যতটা

জানতে পেরেছি, বিনয়েন্দ্রবাবু নাকি ইদানিং সাত আট বছর অত্যন্ত secluded life lead করতেন। দিবারাত্র তাঁর ল্যাব্রোটারী ঘরের মধ্যেই কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। পাড়ার কারোর সঙ্গেই তাঁর বড় একটা মেলামেশা ছিল না। আশপাশের ভদ্রলোকেরা কেউ তাঁর সম্পর্কে কোন কথা বলতে পারে নি। একজন ভদ্রলোক তো বললেন, লোকটা যে বাড়িতে থাকে তাই জানবার উপায় ছিল না।

ঐ সময় রামচরণ চায়ের ট্রে হাতে ঘরে এসে প্রবেশ করল।

রজত রামচরণের দিকে তাকিয়ে মিঃ বসাককে সম্বোধন করে বললে, রামচরণ তো এ বাড়ির অনেকদিনকার পুরানো চাকর। ওকে জিজ্ঞাসা করেন নি? ও হয়তো অনেক কথা বলতে পারবে।

হ্যাঁ, রামচরণের কাছে কিছু কিছু information পেয়েছি বটে তবে সেও অত্যন্ত এলোমেলো।

রামচরণ একবার রজতের মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু কোন কথা না বলে চায়ের কাপগুলো একটার পর একটা টেবিলের 'পরে নামিয়ে রেখে নিঃশব্দে ঘর থেকে যেমন এসেছিল তেমনি বের হয়ে গেল।

চা পান করতে করতে মিঃ বসাক আবার বলতে লাগলেন।

প্রথম ভোরের লোকাল ট্রেনে পুরন্দর চৌধুরী বিনয়েন্দ্রবাবুর একটা জরুরী চিঠি পেয়ে এখানে এসে পৌঁছান। পুরন্দর চৌধুরী আসছেন সিঙ্গাপুর থেকে।

ভোরবেলায় তিনি প্লেনে করে কলকাতায় এসে পৌঁছান এবং সোজা একেবারে ট্যাক্‌সিতে করে অন্য কোথায়ও না গিয়ে উত্তরপাড়ায় চলে আসেন।

ইতিপূর্বে অবিশ্যি পুরন্দর চৌধুরী বার তিন চার এ বাড়িতে এসেছেন, তিনি নিজেও তা স্বীকার করেছেন এবং রামচরণও বলেছে।

পুরন্দর চৌধুরী এককালে কলেজ লাইফে বিনয়েন্দ্রর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তারপর বি, এস, সি, পরীক্ষায় ফেল করে কাউকে কিছু না জানিয়ে জাহাজে খালাসীর চাকরি নিয়ে সিঙ্গাপুরে চলে যান ভাগ্যান্বেষণে। এখনও সেখানেই আছেন। পুরন্দর চৌধুরী এখানে এসে নীচে রামচরণের দেখা পান। রামচরণকেই জিজ্ঞাসা করেন বাবু তার কোথায়।

রামচরণ ঐ সময় প্রভাতী চা নিয়ে বাবুর ল্যাব্রোটারীর দিকেই চলেছিল।

সে বলে, গত রাত থেকে বাবু ল্যাব্রোটারীতেই কাজ করছেন। এখনও বের হন নি।

এ রকম প্রায়ই নাকি মধ্যে মধ্যে সারাটা রাত বিনয়েন্দ্র ল্যাব্রোটারীতেই কাটিয়ে দিতেন।

সকলের উপর কঠোর নির্দেশ ছিল বিনয়েন্দ্র যতক্ষণ ল্যাব্রোটারীতে থাকবেন কেউ যেন তাঁকে কোন কারণেই না বিরক্ত করে।

সেইজন্যই রামচরণ সে রাত্রে তাঁকে বিরক্ত করে নি।

রামচরণের জবানবন্দী থেকেই জানা যায়, গত রাত্রে এগারোটা নাগাদ একবার নাকি ল্যাব্রোটারী থেকে বের হয়েছিলেন বিনয়েন্দ্র।

সেই সময় খাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করায় বিনয়েন্দ্র বলেছিলেন্, রাত্রে আর তিনি কিছু খাবেন না। এক গ্লাস দুধ যেন কেবল গরম করে তাঁর শোবার ঘরে রামচরণ রেখে দেয়। প্রয়োজন হলে তাই তিনি খাবেন।

রামচরণ প্রভুর নির্দেশমত এক গ্লাস দুধ গরম করে ল্যাব্রোটারী সংলগ্ন তাঁর শয়নঘরে রেখে শুতে যায়, রাত তখন প্রায় পৌণে বারোটা।

তারপর সে নীচে এসে তার নিজের ঘরে শুতে যায়।

কেন জানি না সেদিন রাত্রি দশটার সময় রাত্রের আহার শেষ করবার পর থেকেই অত্যন্ত ঘুম পাচ্ছিল রামচরণের। অন্যান্য রাত্রে তার চোখে ঘুম আসতে আসতে সেই রাত বারটা বেজে যায়। অত ঘুম পাচ্ছিল বলেই রামচরণ বোধ হয় বিছানায় গিয়ে শোবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ে।

অন্যান্য দিন খুব সকালেই তার ঘুম ভাঙে কিন্তু গতকাল ঘুম ভাঙে তার প্রায় বেলা সাড়ে সাতটায়। তাও লছমনের ডাকাডাকিতে।

লছমন এ বাড়িতে পাচকের কাজ করে। ঘুম ভেঙে অত বেলা হয়ে গেছে দেখে সে একটু ভীতই হয়ে পড়ে। কেননা বাবুর খুব ভোরে চা-পানের অভ্যাস। এবং সময়মত প্রভাতী চা না পেলে গালাগালি দিয়ে তিনি ভূত ছাড়াবেন।

লছমনকে জিজ্ঞাসা করে বাবু তাঁকে ডেকেছেন কিনা চায়ের জন্য।

লছমন বলে, না।

যাহোক তাড়াতাড়ি চা নিয়ে যখন সে উপরে চলেছে, পুরন্দর চৌধুরীর সঙ্গে সিঁড়ির সামনে তার দেখা।

সাহেব, আপনি কখন এলেন? রামচরণ জিজ্ঞাসা করে।

এই আসছি। তোমার বাবু কেমন আছেন?

ভালই। চলুন, বাবু বোধ হয় কাল রাত থেকে ল্যাব্রোটারী ঘরেই আছেন।

উভয়ে উপরে এসে দেখে ল্যাব্রোটারী ঘরের দরজাটা ঈষৎ খোলা; যেটা ইতিপূর্বে খোলা থাকতে কেউ দেখে নি। রামচরণ বেশ একটু আশ্চর্যই হয়।

রামচরণ চায়ের কাপ হাতে ল্যাব্রোটারী ঘরে প্রবেশ করে, পুরন্দর চৌধুরী বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকেন।

রামচরণকে শুধু বলে দেন তাঁর আসবার সংবাদটা বাবুকে দিতে।

সরাসর ঢোকেন না তিনি ল্যাব্রোটারীতে, কেননা সংবাদ না দিয়েও অনুমতি না নিয়ে যে ল্যাব্রোটারী ঘরে একমাত্র রামচরণ ব্যতীত এ বাড়ির কারুরই প্রবেশ করবার হুকুম ছিল না সেটা পুরন্দরের অজানা ছিল না।

বারান্দার ঘরের সামনে দোতলায় পুরন্দর চৌধুরী দাঁড়িয়ে ছিলেন; হঠাৎ একটা কাচ ভাঙার ঝনঝন শব্দ ও আর্তকণ্ঠে চিৎকার তাঁর কানে এল।

কী হল?

ল্যাব্রোটারীর ভিতর থেকে আবার রামচরণের চাপা আর্তস্বর শোনা গেল।

এবং পুরন্দর চৌধুরী কিছু বুঝে উঠবার আগেই খোলা দরজা পথে একপ্রকার ছুটতে ছুটতেই বের হয়ে এল রামচরণ। তার সর্বাঙ্গ তখন থর থর করে কাঁপছে।

কী! কী হয়েছে রামচরণ? পুরন্দর চৌধুরী প্রশ্ন করেন।

বাবু—বাবু বোধ হয় মরে গেছেন!

॥ ৮ ॥

কি বলছ রামচরণ! বাবু মরে গেছেন কি!

হ্যাঁ। আসুন, দেখবেন চলুন।

পুরন্দর চৌধুরী সোজা ঘরের মধ্যে ছুটে যান। প্রথমটায় তাঁর কিছুই চোখে পড়ে না। ল্যাব্রোটারী-ঘরে সব কয়টা জানালাই বন্ধ। এবং জানালার উপর সব ভারি কালো পর্দা ফেলা। সাধারণতঃ ল্যাব্রোটারী-ঘরে যে উজ্জ্বল হাজার পাওয়ারের বিদ্যুৎ বাতি জ্বলে, তখনও ঘরে সেই আলোটা জ্বলছে। আর কাজ করবার লম্বা টেবিলটা, যার উপরে

নানা ধরণের বিচিত্র সব কাচের যন্ত্রপাতি—মাইক্রোসকোপ, বুন্‌সেন বার্ণার প্রভৃতি সাজান—সেই লম্বা টেবিলটারই সামনে একটা বসবার উঁচু টুলটার পাশেই চিৎ হয়ে পড়ে আছেন বৈজ্ঞানিক বিনয়েন্দ্র সান্ন্যালের নিথর নিস্পন্দ দেহটা।

পরিধানে তখনও তাঁর পায়জামা ও গবেষণাগারের শাদা অ্যাপ্রন। ভূপতিত নিষ্কম্প দেহটা এবং তাঁর মুখের দিকে দৃষ্টিমাত্রেই বুঝতে কষ্ট হয় না যে, সে দেহে প্রাণের লেশমাত্রও আর নেই।

বহুক্ষণ পূর্বেই তাঁর দেহান্ত ঘটেছে। এবং সমস্ত মুখখানা হয়ে গেছে নীলাভ। আতঙ্কিত, বিস্ফারিত দুটি চক্ষুতারকা। ঈষৎ বিভক্ত ও প্রসারিত নীলাভ দুটি ওষ্ঠের প্রান্ত দিয়ে ক্ষীণ একটা রক্তাক্ত ফেনার ধারা গড়িয়ে নেমেছে।

দুটি হাত মুষ্টিবদ্ধ।

মৃতদেহের পাশেই তখনও পড়ে রয়েছে একটি গ্লাস-বিকার। সেই গ্লাস-বিকারের তলদেশে তখনও শাদা মত কী সামান্য খানিকটা তরল পদার্থ অবশিষ্ট পড়ে আছে।

প্রথম দর্শনেই ব্যাপারটা মনে হবে বিনয়েন্দ্র যেন কিছু খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

পুরন্দর চৌধুরীই দারোয়ান ধনবাহাদুরের হাতে চিঠি দিয়ে স্থানীয় থানায় সংবাদ প্রেরণ করেন। সংবাদ পাওয়ামাত্রই থানা-ইনচার্জ রামানন্দ সেন চলে আসেন। নীলকুঠিতে এসে ব্যাপারটা তদন্ত করে এবং মৃতদেহ পরীক্ষা করে থানা-ইনচার্জের মনে যেন কেমন একটা খটকা লাগে। তিনি তাড়াতাড়ি থানার এ. এস. আই.-কে একটা সংবাদ পাঠান, লালবাজার স্পেশাল ব্রাঞ্চে ফোন করে তখুনি ব্যাপারটা জানাবার জন্য।

মৃত্যুর ব্যাপারটা যে ঠিক সোজাসুজি আত্মহত্যা নয়, তিনটি কারণে থানা-ইন্‌চার্জের সন্দেহ হয়েছিল। প্রথমতঃ ঘাড়ের ঠিক নিচেই ১—১ ২" × ১" পরিমাণ একটি কালসিটার চিহ্ন ছিল। দ্বিতীয়তঃ, সুদৃশ্য টেবিল টাইম-পিস্‌টা ভগ্ন অবস্থায় ঘরের মেঝেতে পড়েছিল এবং তৃতীয়তঃ, ল্যাব্রোটারীর ঘরের দরজাটা ছিল খোলা।

ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যেই বেলা দশটা নাগাদ ইন্‌স্পেক্টার মিঃ বসাক লালবাজার থেকে চলে আসেন।

থানা-ইন্‌চার্জ তখন নীলকুঠির সমস্ত লোকদের নিচের একটা ঘরে জড়ো

করে পুলিশ প্রহরায় একজন একজন করে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে জেরা করছেন।

নীলকুঠিতে লোকজনের মধ্যে এ বাড়ির পুরাতন ভৃত্য প্রৌঢ় রামচরণ, পাচক লছমন, বয়স তার ত্রিশ বত্রিশের মধ্যে, বছর দুই হল এখানে চাকরিতে লেগেছে। আর একজন ভৃত্য বাইরের যাবতীয় বাজার ও ফাই-ফরমাস খাটবার জন্য, নাম রেবতী। পূর্ববঙ্গে বাড়ি। বয়েস ত্রিশ বত্রিশই হবে। বছর পাঁচেক হল এবাড়িতে কাজ করছে। দারোয়ান নেপালী ধনবাহাদুর থাপা। সেও এবাড়িতে প্রায় বছর ছয়েক আছে। আর সফার ও ক্লীনার করালী। করালী এবাড়িতে কাজে লেগেছে বছর খানেক মাত্র। তার আগে যে ড্রাইভার ছিল গাড়িতে অ্যাকসিডেণ্ট করে এখন হাজত বাস করছে বছর দেড়েক ধরে।

বিরাট নীলকুঠি।

ত্রিতল। তিনতলায় দু'খানা ঘর, দোতলায় সাতখানা ও একতলায় ছয়খানা ঘর। এছাড়া বাড়ির সামনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ফুলের বাগান। একধারে গ্যারেজ ও দারোয়ানদের থাকবার ঘর।

গ্যারেজটা মস্ত বড়। এককালে সেখানে তিনটি জুড়ি গাড়ি ও চারটে ওয়েলার ঘোড়া থাকত।

অনাদি চক্রবর্তীর মৃত্যুর বছরখানেক বাদেই শেষ গাড়িখানি ও শেষ দুটি ঘোড়া বিক্রয় করে দিয়ে, সহিস ও কোচওয়ানকে তুলে দিয়ে মস্ত একটা ফোর্ড গাড়ি কিনেছিলেন বিনয়েন্দ্র।

মোটর গাড়িটা অবিশ্যি কেনা পর্যন্তই।

কারণ বেশির ভাগ সময়েই গ্যারেজে পড়ে থাকত, কচিৎ কখনও বিনয়েন্দ্র গাড়িতে চেপে বের হতেন। ড্রাইভার বসে বসেই মোটা মাইনে পেত। বাড়ির পশ্চাৎ দিকেও মস্ত বড় বাগান, চারিদিকে তার এক মানুষ সমান উঁচু লোহার রেলিং দেওয়া প্রাচীর। তারই ঠিক নিচে প্রবহমান জাহ্নবী। একটা বাঁধানো প্রশস্ত ঘাটও আছে চক্রবর্তীদেরই তৈরী তাদের নিজস্ব ব্যবহারের জন্য।

ঘাটের গায়েই একটা লোহার গেট। তবে গেটটা সদাসর্বদা বন্ধই থাকে। একদা ওই পশ্চাৎ দিককার বাগানের অত্যন্ত সমারোহ ছিল, এখন অযত্নে ও অবহেলায় ঘন আগাছায় ভরে গেছে।

রামচরণ, রেবতী, লছমন ও করালী সকলেই খানতিনেক ঘর নিয়ে বাড়ির নিচের তলাতেই থাকে।

নীলকুঠিতে ওই চারজন লোক থাকলেও বিনয়েন্দ্রর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল একমাত্র রামচরণেরই। অন্যান্য সকলের সঙ্গে বাবুর দেখাসাক্ষাৎ কচিৎ কখনও হত। তবে মাইনেপত্র নিয়মিত সকলে মাসের প্রথমেই বাড়ির পুরাতন সরকার প্রতুলবাবুর হাত দিয়েই পেত।

প্রতুলবাবু নীলকুঠিতে থাকতেন না।

ঐ অঞ্চলেই কাছাকাছি একটা বাসা নিয়ে গত তের বৎসর ধরে পরিবার নিয়ে আছেন।

অনাদি চক্রবর্তীর আমল থেকেই নাকি ঐ ব্যবস্থা বহাল ছিল।

বিনয়েন্দ্র তার কোন অদলবদল করেন নি তাঁর আমলেও।

প্রত্যহ সকালবেলা একবার প্রতুলবাবু নীলকুঠিতে আসতেন। বেলা দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ চলে যেতেন, তারপর আবার আসতেন গোটা পাঁচেকের সময়, যেতেন সেই রাত নটায়।

অনাদি চক্রবর্তীর আমলে অনেক কাজই প্রতুলবাবুকে করতে হত, অনেক কিছুরই দেখাশোনা করতে হত, কিন্তু বিনয়েন্দ্র আসার পর ক্রমে ক্রমে তার দায়িত্ব ও কাজগুলো নিজেই তিনি নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন।

গতকাল প্রতুলবাবু উত্তরপাড়ায় ছিলেন না, তাঁর এক ভাইঝির বিবাহে শ্যামনগর দিন চারেকের জন্য গিয়েছেন।

ভৃত্য, পাচক, সফার ও দারোয়ান কাউকেই জিজ্ঞাসা করে এমন কোন কিছু জানতে পারা যায় নি, যা বিনয়েন্দ্রর মৃত্যু ব্যাপারে আলোক-সম্পাত করতে পারে।

মিঃ বসাক শুধু একাই আসেন নি, তিনি আসবার সময় সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন পুলিশ সার্জেন ডাঃ বক্সীকেও।

থানা-ইনচার্জ রামানন্দবাবুও ওঁদের দেখে উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালেন।

চলুন। কোন্ ঘরে মৃতদেহ আছে, একবার দেখে আসা যাক।

॥ ৯ ॥

মিঃ বসাক সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বললেন, ব্যাপারটা আপনার তা হলে সুসাইড নয়, হোমিসাইড বলেই মনে হচ্ছে?

হ্যাঁ স্যার।

মাথার নিচে ঘাড়ে abbression ছাড়া অন্য কিছু কি দেখতে পেয়েছেন, যাতে করে আপনার মনে হয়েছে ব্যাপারটা হোমিসাইডই ?

হ্যাঁ, আরও একটা কারণ আছে স্যার।

কি ?

মৃতদেহ দেখেই অবশ্য বোঝা যায় যে, বিষই মৃত্যুর কারণ এবং মৃতদেহের পাশে যে গ্লাস-বিকারটি পাওয়া গেছে, সেটার যে অবশিষ্টাংশ তরল পদার্থ এখনও বর্তমান আছে, সেটার chemical analysis হলে হয়তো সেটাও বিষই প্রমাণিত হবে। রামানন্দবাবু বললেন।

বসাক বললেন, কিন্তু বিষই যদি তিনি খেয়ে আত্মহত্যা করবেন, তাহলে মেঝেতে শুয়ে খেলেন কেন ? তারপর ঘড়িটা ভাঙা অবস্থায় বা পাওয়া গেল কেন ? বরং আমার যেন সব শুনে মনে হচ্ছে তাঁকে কেউ অতর্কিতে প্রথমে পিছন দিক থেকে কোন ভারি বস্তু দিয়ে আঘাত করে তারপর হয়তো বিষ প্রয়োগ করেছে অজ্ঞান অবস্থায়। আরও একটা কথা, ভেবে দেখেছেন কি ঘরের দরজা খোলাই ছিল। অথচ দেখা যায় আত্মহত্যার সময় সাধারণ লোক দরজা বন্ধ করেই রাখে।

থানা-অফিসার রামানন্দ সেনের কথার জবাবে মিঃ বসাক কোন সাড়া দিলেন না বা কোনরূপ মন্তব্য করলেন না।

ল্যাব্রোটারী ঘরের দরজায় থানা-অফিসার ইতিমধ্যে তালা লাগিয়ে রেখেছিলেন। চাবি তাঁর কাছেই ছিল।

ঘরের তালা খুলে সকলে গিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন।

মিঃ প্রশান্ত বসাক মাত্র বছর কয়েক পুলিশ লাইনে প্রবেশ করলেও ইতিমধ্যেই তাঁর কর্মদক্ষতায় স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের ইন্‌স্‌পেক্টারের পদে উন্নীত হয়েছিলেন।

বয়স তাঁর ৩২।৩৩শের মধ্যে হলেও ঐ ধরণের জটিল সব কেসে অদ্ভুত ও আশ্চর্য রকমের ঘটনা বিশ্লেষণের 'ন্যাক' ছিল তাঁর।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে সর্বাগ্রে তিনি ঘরের চতুর্দিক একবার তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিলেন।

বসাক ভাবছিলেন তখন থানা-অফিসারের অনুমান যদি সত্যই হয়, সত্যিই যদি ব্যাপারটা একটা নৃশংস হত্যাকাণ্ডই হয় তো এই ঘরের মধ্যেই সেটা গত রাত্রেই সংঘটিত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে হত্যাকারী কি তার কোন দুর্বল মুহূর্তে কোন চিহ্নই আর দুষ্কৃতি রেখে যায় নি। নিশ্চয়ই গিয়েছে।

মানে, বলতে চাইছেন অন্যের চোখে ব্যাপারটাকে আত্মহত্যা বোঝাবার জন্য, তাইতো।

ঠিক তাই।

কিন্তু কেন আপনার সে কথা মনে হচ্ছে বলুন তো মিঃ বসাক। ডাঃ বক্সী প্রশ্ন করলেন।

চেয়ে দেখুন ভাল করে, মৃতের নীচের ওষ্ঠে একটা ক্ষতচিহ্ন রয়েছে, এবং শুধু ক্ষতচিহ্নই নয়, জায়গাটা একটু ফুলেও আছে। তাতে করে কি মনে করতে পারি না আমরা যে, হয়তো কোন আঘাত দিয়ে অজ্ঞান করবার পর ব্যাপারটাকে আত্মহত্যার light দেবার জন্যই metal tube বা ঐ জাতীয় কোন কিছুর সাহায্যে মুখের মধ্যে বিষ ঢেলে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যার দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে এটা pure simple case of homicide নৃশংস হত্যা, আত্মহত্যা আদৌ নয়।

এবারে ডাঃ বক্সী একটু বিশেষ দৃষ্টি দিয়েই মৃতের ওষ্ঠটা আবার পরীক্ষা করলেন, তারপর বললেন, সত্যিই তো, আপনার অনুমান হয়তো মিথ্যা নাও হতে পারে মিঃ বসাক। আমার মনে হচ্ছে হয়তো you are right। হ্যাঁ। আপনিই হয়তো ঠিক।

ভাঙা জার্মান টাইম পিসটা লম্বা টেবিলটার উপরেই রাখা ছিল। মিঃ বসাক ঘড়িটা হাতে তুলে নিলেন এবারে দেখবার জন্য।

ঘড়ির কাচটা ভেঙে শতচিড় খেয়ে গেলেও কাচের টুকরগুলো খুলে পড়ে যায় নি। ঘড়িটা ঠিক একটা বেজে বন্ধ হয়ে আছে।

ঘড়িটা বার দুই নাড়াচাড়া করে মিঃ বসাক পুনরায় সেটা টেবিলের উপরেই রেখে দিলেন।

খুব সম্ভবত ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে রাত একটায়।

যে কোন কারণেই হোক ঘড়িটা নিশ্চয়ই ছিটকে পড়েছিল এবং যার ফলে ঘড়ির কাচটা ভেঙেছে ও ঘড়িটাও বন্ধ হয়ে গেছে।

ঘড়িটা কোথায় পেয়েছেন? মিঃ বসাক থানা অফিসারকে জিজ্ঞাসা করলেন।

মেঝেতে পড়েছিল।

ভৃত্য রামচরণকে পরে জিজ্ঞাসা করে জানা গিয়েছিল ঘড়িটা ওই টেবিলটার উপরেই নাকি সর্বদা থাকত।

॥ দশ ॥

যদিচ থানা অফিসার সকলেরই জবানবন্দী নিয়েছিলেন, তথাপি মিঃ বসাক প্রত্যেককেই আবার পৃথক পৃথক ভাবে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন। বিশেষ করে একটা প্রশ্ন সকলকেই করলেন, রাত সাড়ে বারটা থেকে একটার মধ্যে কোনরূপ শব্দ বা চিৎকার শুনতে কেউ পেয়েছিল কিনা।

কিন্তু সকলেই জবাব দেয়, না। তারা কোনরূপ শব্দই শোনে নি। কারও কোন চিৎকারও শোনে নি।

সমস্ত গবেষণা-ঘরটা মিঃ বসাক চরিদিক খুব ভাল করে দেখলেন অন্য কোন সূত্র অর্থাৎ clue পাওয়া যায় কিনা।

গবেষণা-ঘরটি প্রশস্ত একটি হলঘরের মতই বললে অত্যুক্তি হয় না। দরজা মাত্র দু'টি ; একটি বাইরের বারান্দার দিকে ও অন্যটি পাশের ঘরের যোগাযোগ রেখে। অতএব ওই দুটি দরজা ভিন্ন ওই ঘরে যাতায়াতের আর দ্বিতীয় কোন রাস্তাই নেই।

বারান্দার দিকে তিনটি জানালা। সেগুলো বোধ হয় দীর্ঘ দিন পূর্বেই একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ভিতর থেকে স্ক্রু এঁটে। অন্যদিকে যে জানালাগুলো—সেগুলোতে পূর্বে খড়খড়ির পাল্লা ছিল। বিনয়েন্দ্রনাথ ঘরটিকে ল্যাবোরোটারী করবার সময় সেগুলো খুলে ফেলে দিয়ে বড় বড় কাচের পাল্লা সেট করিয়ে নিয়েছিলেন। পাল্লাগুলো ফ্রেমের মধ্যে বসান। তার দু'টি অংশ। নীচের অংশটি ফিক্সড্, উপরের অংশটি কব্জার উপরে উঠান নামানোর ব্যবস্থা আছে কর্ডের সাহায্যে।

ঘরের ভিতর থেকে জানালার সামনে আবার ভারী কালো পর্দা টাঙানো। সেই পর্দাও কর্ডের সাহায্যে ইচ্ছামত টেনে দেওয়া বা সরিয়ে দেওয়া যায়।

মধ্যে মধ্যে গবেষণার কাজের জন্য ডার্করুমের প্রয়োজন হতো বলেই হয়তো জানালায় পর্দা দিয়ে বিনয়েন্দ্র ঐরূপ ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন।

ঘরের তিন দিকেই দেওয়াল ঘেঁষে সব লোহার র‍্যাক, আলমারি, রেফ্রিজ, কোল্ড স্টোরেজ। আলমারী ও র‍্যাকে নানাজাতীয় শিশি বোতল রং-বেরংয়ের ঔষধে সব ভর্তি। কোন কোন র‍্যাকে ভর্তি সব মোটা মোটা রসায়ন বিজ্ঞানের বই।

গবেষণা-ঘর নয়তো, জ্ঞানী কোন তপস্বীর জ্ঞানচর্চার পাদপীঠ।

হত্যাকারী এই মন্দিরের মধ্যেও তার মৃত্যু-বীজ ছড়িয়ে যেন এর পবিত্রতাকে কলঙ্কিত করে গেছে।

কাচের জানালার ওদিকে বাড়ির পশ্চাৎ দিক।

জানালার সামনে এসে দাঁড়ালে পশ্চাতের বাগান ও প্রবহমান গঙ্গার গৈরিক জলরাশি চোখে পড়ে।

ঘরের দুটি দরজা। দুটিই খোলা ছিল।

অতএব হত্যাকারী যে কোন একটি দরজাপথেই ঘরে প্রবেশ করতে পারে। তবে বারান্দার দরজাটা সাধারণতঃ যখন সর্বদা বন্ধই থাকত তখন মনে হয়, বিনয়েন্দ্রর শয়নঘর ও গবেষণাঘরের মধ্যবর্তী দরজাপথেই সম্ভবত হত্যাকারী ঐ ঘরে প্রবেশ করেছিল এবং হত্যা করে যাবার সময় দ্বিতীয় দরজাটা খুলে সেই পথে ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছে।

গবেষণাঘরের মেঝেটি সাদা ইটালীয়ান মার্বেল পাথরে তৈরী। মসৃণ চকচকে।

মৃতদেহের আশেপাশে মেঝেটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে করতে মিঃ বসাকের সহসা নজর পড়ে এক জায়গায়।

মেঝের উপরে খানিকটা অংশে যেন একটা হলদে ছোপ পড়ে আছে। মনে হয় যেন কিছু তরল জাতীয় রঙীন পদার্থ মেঝেতে পড়েছিল, পরে মুছে নেওয়া হয়েছে।

মেঝেটা দেখতে দেখতে হঠাৎ মিঃ বসাকের দৃষ্টি একটা ব্যাপারে আকর্ষিত হয়। মৃতের পা একেবারে খালি। বিনয়েন্দ্র কি খালি পায়েই গবেষণা করতেন!

রামচরণ একটি পাশে চুপটি করে দাঁড়িয়েছিল। তাকে মিঃ বসাক প্রশ্ন করলেন, রামচরণ, তোমার বাবু কোন স্যাণ্ডেল বা শ্লিপার ব্যবহার করতেন না বাড়িতে?

হ্যাঁ, বাবুর পায়ে সর্বদা একটা শাদা রবারের শ্লিপার তো থাকত।

কিন্তু তাহলে গেল কোথায় শ্লিপার জোড়া?

সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করে ও পাশের শয়ন ঘরটি অনুসন্ধান করেও বিনয়েন্দ্রর নিত্যব্যবহৃত, রামচরণ-কথিত শাদা রবারের শ্লিপার জোড়ার কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না।

রামচরণ বিস্মিত কণ্ঠে বললে, আশ্চর্য। গেল কোথায় বাবুর শ্লিপার জোড়া, বাবু তো এক মুহূর্তের জন্যও কখনও খালি পায়ে থাকতেন না।

সত্যি মৃত বিনয়েন্দ্রর পায়ের পাতা দেখে সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না।

তবে শ্লিপার জোড়া দেখা গেল না।

এবং বাথরুম থেকে বের হয়ে আসবার মুখে আর একটি ব্যাপারে মিঃ বসাকের দৃষ্টি পড়ল, গবেষণাগারের একটি জলের সিঙ্ক।

সিঙ্কের কলটি খোলা। কলের খোলা মুখ দিয়ে জল ঝরে চলেছে তখনও। এবং সেই জল সিঙ্কের নির্গম পাইপ দিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে।

ভাঙা টাইমপিস্, খোলা কল ও অপহৃত নিত্যব্যবহার্য শ্লিপার, ঘরের দুটি দ্বারই খোলা এবং মেঝেতে কিসের একটা দাগ; এ ভিন্ন অন্য কোন কিছু দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত মিঃ বসাকের মনে লাগল না।

মনের মধ্যে কেবলই ঐ তিনটি ব্যাপার চক্রাকারে আবর্ত রচনা করে ফিরতে লাগল মিঃ বসাকের।

ঘড়িটা ভাঙল কি করে?

শ্লিপার জোড়া কোথায় গেল?

সিঙ্কের কলটা খোলা ছিল কেন?

আর সর্বশেষে মেঝেতে ঐ দাগটা কিসের?

হত্যাকারী সম্ভবত পশ্চাৎ দিক থেকে অতর্কিতে বিনয়েন্দ্রকে আক্রমণ করেছিল। তার সঙ্গে বিনয়েন্দ্রর কোন struggle-এর সুযোগ মেলে নি।

আপাততঃ মৃতদেহটা ময়নাঘরে পাঠাবার ব্যবস্থা করে মিঃ বসাক সকলকে নিয়ে নিচে নেমে এলেন।

থানা অফিসার আবার ঘরে তালা দিয়ে দিলেন।

নিচে এসে ডাঃ বক্সী বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

সমস্ত বাড়িটা চার পাশ থেকে পাহারার ব্যবস্থা করবার জন্য মিঃ বসাক থানা অফিসারকে নির্দেশ দিলেন।

থানা অফিসারও তখনকার মত বিদায় নিলেন।

রামচরণের নিকট হতে রজত ও সুজাতার ঠিকানা নিয়ে মিঃ বসাকই জরুরী তার করে দিলেন তাদের, তার পেয়েই চলে আসবার জন্য নির্দেশ দিয়ে।

॥ ১১ ॥

সমস্ত ঘটনাটা সংক্ষেপে বর্ণনা করে গেলেন মিঃ বসাক রজত ও সুজাতার জ্ঞাতার্থে।

চা পান করতে করতেই মিঃ বসাক সমগ্র দুর্ঘটনাটা বর্ণনা করছিলেন।

উপস্থিত সকলেই চা পান করছিলেন একমাত্র সুজাতা বাদে।

সুজাতা নীলকুঠিতে পা দিয়েই তার ছোট্‌কার মৃত্যু-সংবাদটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই যে কেমন নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিল এবং মাঝখানে একবার ঐ রাত্রেই কলকাতায় ফিরে যাবার কথা ছাড়া দ্বিতীয় কোন কথাই বলে নি।

তার মুখের দিকে তাকালেই বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল না যে, অকস্মাৎ যেন সে কেমন বিহ্বল হয়ে গিয়েছে ঘটনা বিপর্যয়ে।

মিঃ বসাকের বর্ণনা প্রসঙ্গে রজত মধ্যে মধ্যে দু একটা কথা বললেও সুজাতা একবারের জন্যও তার মুখ খোলে নি।

চায়ের কাপটা সে মিঃ বসাকের অনুরোধে হাতে তুলে নিয়েছিল মাত্র, ওষ্ঠে কাপটা স্পর্শও করে নি।

ধূমায়িত চায়ের কাপটা ক্রমে ক্রমে একসময় ঠাণ্ডা হয়ে জুড়িয়ে গেল, সেদিকেও যেন তার লক্ষ্য ছিল না।

রামচরণ এসে ঘরে আবার প্রবেশ করল।

ট্রের 'পরে শূন্য চায়ের কাপগুলি তুলে নিতে নিতে বললে, আপনারা তাহলে রাত্রে এখানেই থাকবেন তো দাদাবাবু?

প্রশ্নটা রামচরণ রজতকে করলেও তার দৃষ্টি ছিল সুজাতার মুখের 'পরেই নিবদ্ধ।

হ্যাঁ হ্যাঁ—এখানেই থাকবো বৈকি। তুমি সব ব্যবস্থা করে রেখো। রজত সুজাতার দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে কথাগুলো বললে।

সুজাতা কোন জবাব দিল না।

উপরের তলার ঘরগুলো অনেকদিন তো ব্যবহার হয় না—

রামচরণকে বাধা দিয়ে রজত বললে, ওরই মধ্যে একটা যাহোক ঝেড়েমুছে পরিষ্কার করে দাও—আজকের রাতের মত। তারপর কাল সকালে দেখা যাবে।

সেই ভাল রামচরণ। আমার শোবার যে ঘরে ব্যবস্থা করেছো, তারই পাশের ঘর দুটোয় ওদের থাকবার ব্যবস্থা করে দাও ভাই-বোনের। মিঃ বসাক বললেন।

রামচরণ ঘর হতে বের হয়ে গেল।

সুজাতা ছাড়াও ঘরের মধ্যে উপস্থিত আর একজনও প্রায় বলতে গেলে চুপচাপ বসেছিলেন, পুরন্দর চৌধুরী।

একটা বিচিত্র লম্বা বাঁকানো কালো পাইপে উগ্র কটুগন্ধী টোব্যাকো ভরে পুরন্দর চৌধুরী চেয়ারটার উপরে হেলান দিয়ে বসে নিঃশব্দে ধূমপান করছিলেন।

ঘরের বাতাসে টোব্যাকোর উগ্র কটু গন্ধটা ভেসে বেড়াচ্ছিল।

রামচরণ ঘর থেকে চলে যাবার পর সকলেই কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে।

ঘরের আবহাওয়াটা যেন কেমন বিশ্রী থম্ থম্ হয়ে উঠেছে।

ইনস্পেক্টার বসাকই আবার ঘরের স্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন।

আজ দুপুরে অনেকক্ষণ ধরে ঐ রামচরণের সঙ্গে আমি কথাবার্তা বলে ও নানা প্রশ্ন করে বিনয়েন্দ্রবাবুর সম্পর্কে যা জানতে পেরেছি, তার মধ্যে একটি বিশেষ ঘটনা হচ্ছে, মাস চার পাঁচ আগে একটি তরুণী একদিন সকালবেলা নাকি বিনয়েন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা করতে আসেন।

তরুণী! বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল রজত মিঃ বসাকের মুখের দিকে।

হ্যাঁ, তরুণীটি দেখতে নাকি বেশ সুশ্রীই ছিলেন। সাধারণ বাঙালী মেয়েদের মত দেহের গঠন নয়। বরং বেশ উঁচু লম্বাই। বয়স ছাব্বিশ আটাশের মধ্যেই নাকি হবে।

কিন্তু কেন এসেছিলেন তিনি জানতে পেরেছেন? প্রশ্ন করে আবার রজতই।

হ্যাঁ, শুনলাম, তরুণীটি এসেছিলেন দেখা করতে, বিনয়েন্দ্রবাবু কাগজে তাঁর একজন ল্যাব্রোটারী অ্যাসিস্টেন্টের প্রয়োজন বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, সেই বিজ্ঞাপন দেখে।

তারপর?

তরুণীটি এসে বিনয়েন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাওয়ায় রামচরণ তার বাবুকে সংবাদ দেয়।

মিঃ বসাক বলতে লাগলেন, বিনয়েন্দ্র তাঁর ল্যাব্রোটারীর মধ্যে ওই সময় কাজ করছিলেন। সংবাদ পেয়ে রামচরণকে তিনি বলেন আগন্তুক তরুণীকে তাঁর ল্যাব্রোটারী ঘরেই পাঠিয়ে দিতে। তরুণী ল্যাব্রোটারী ঘরে গিয়ে ঢোকেন।

ঘণ্টা দুই বাদে আবার তরুণী চলে যান। এবং সেই দিনই সন্ধ্যার সময়

বিনয়েন্দ্র রামচরণকে ডেকে বলেন, যে তরুণীটি ওই দিন সকালবেলা তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, আগামী পরশু সকালে আবার সে আসবে। তরুণীটির জন্য রামচরণ যেন দোতলার একটা ঘর ঠিক করে রাখে, কারণ এবার থেকে সে এ বাড়িতেই থাকবে।

তারপর রক্তত আবার প্রশ্ন করল। নির্দিষ্ট দিনে তরুণীটি এলেন এবং এখানে থাকতে লাগলেন? কি নাম তার?

জানতে পারা যায় নি। রামচরণও তার নাম বলতে পারে নি, মেমসাহেব বলেই রামচরণ তাকে ডাকত। তরুণী অত্যন্ত নির্বিরোধী ও স্বল্পবাক ছিলেন। অত্যন্ত প্রয়োজন না হলে নাকি কারও সঙ্গেই বড় একটা কথা বলতেন না। দিনে রাত্রে বেশির ভাগ সময়ই তার কাটত বিনয়েন্দ্রর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গবেষণাগারের মধ্যে। যে চার মাস এখানে তিনি ছিলেন, মাসের মধ্যে একবার কি দুবার ছাড়া তিনি কখনও একটা বাড়ির বাইরেই যেতেন না।

আর একজন নতুন লোক যে এ বাড়িতে এসেছে বাইরে থেকে কারও পক্ষে তা বোঝবারও উপায় ছিল না।

সারাটা দিন এবং প্রায় মধ্যরাত্র পর্যন্ত দুজনেই যে যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। এবং সে সময়টা বিশেষ কাজের এবং প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া দুজনের মধ্যে কোন কথাই নাকি হত না।

একমাত্র দুজনার মধ্যে সামান্য যা কথাবার্তা মধ্যে মধ্যে হত—সেটা ওই খাবার টেবিলে বসে।

বিনয়েন্দ্রকে নিয়ে এক টেবিলে বসেই তিনি খেতেন।

সেই সময় বিনয়েন্দ্রর সঙ্গে তাকে কথা বলতে শুনেছে রামচরণ, কিন্তু তাও সে সব কথাবার্তার কিছুই প্রায় সে বুঝতে পারে নি কারণ খাওয়ার টেবিলে বসে যা কিছু আলাপ তার বিনয়েন্দ্রর সঙ্গে চলত, তা সাধারণতঃ তাও রেজীতেই হত।

এমনি করে চলছিল, তারপর হঠাৎ একদিন আবার যেমন তরুণীর ওই গৃহে আবির্ভাব ঘটেছিল তেমনি হঠাৎই একদিন আবার তরুণী যেন কোথায় চলে গেল।

নিয়মিত খুব ভোরে গিয়ে রামচরণ তরুণীকে তার প্রভাতী চা দিয়ে আসত, একদিন সকালবেলা তার প্রাত্যহিক প্রভাতী চা দিতে গিয়ে রামচরণ তার ঘরে আর তাকে দেখতে পেল না।

একটিমাত্র বড় সুটকেস কেবল যা সঙ্গে এনেছিলেন তিনি, সেইটিই ডালা-খোলা অবস্থায় ঘরের একপাশে পড়ে ছিল।

রামচরণ প্রথমে ভেবেছিল, তিনি বোধ হয় ল্যাব্রেটারী ঘরেই গেছেন কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখে বিনয়েন্দ্র অ্যাপ্রন গায়ে একা একাই কাজ করছেন।

সকালবেলার পরে দ্বিপ্রহরেও খাওয়ার টেবিলে তাকে না দেখে রামচরণ বিনয়েন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করে, মেমসাহেবকে দেখছি না বাবু? তিনি খাবেন না?

না।

আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে রামচরণেরও যেমন সাহস হয় নি, বিনয়েন্দ্রও আর তাকে সেই তরুণী সম্পর্কে দ্বিতীয় কোন কথা বলেন নি নিজে থেকে।

তবে তরুণীকে আর তারপর এ বাড়িতে রামচরণ দেখে নি।

চার মাস আগে অকস্মাৎ একদিন যেমন তিনি এসেছিলেন, চার মাস বাদে অকস্মাৎই তেমনি আবার যেন উধাও হয়ে গেলেন।

কোথা থেকেই বা এসেছিলেন আর কোথাই বা চলে গেলেন, কে জানে।

রামচরণ তাকে আবার দেখলে হয়তো চিনতে পারবে. তবে তার নামধাম কিছুই জানে না।

তরুণী চলে যান আজ থেকে ঠিক দশ দিন আগে।

এই একটি সংবাদ।

এবং দ্বিতীয় সংবাদটি ওই তরুণীটি ছাড়াও আর একজন পুরুষ আগন্তুক বিনয়েন্দ্রর সঙ্গে গত এক বছরের মধ্যে বার দুই দেখা করেছেন।

আগন্তুক সম্ভবতঃ একজন ইউ. পি.-বাসী।

লম্বা-চওড়া চেহারা, মুখে নুরদাড়ি, চোখে কালো কাচের চশমা ছিল আগন্তুকের। এবং পরিধানে ছিল কেনা পায়জামা, সরওয়ানী ও মাথায় গান্ধী টুপী।

তিনি নাকি প্রথম বার এসে বিনয়েন্দ্রর সঙ্গে তাঁর ল্যাব্রোটারী ঘরে বসে আধঘণ্টাটাক আলাপ করে চলে যান।

দ্বিতীয় বার তিনি আসেন দুর্ঘটনার মাস চারেকের কিছু আগে।

তৃতীয় সংবাদ যা ইনসপেক্টার সংগ্রহ করেছেন রামচরণের কাছ থেকে তা এই : পুরন্দর চৌধুরী গত দুই বৎসর থেকে মধ্যে মধ্যে চার পাঁচ মাস অন্তর অন্তর বার পাঁচেক নাকি এ বাড়িতে এসেছেন। এবং রামচরণ তাকে চেনে। পুরন্দর চৌধুরী এখানে এলে নাকি দু-পাঁচদিন থাকতেন।

চতুর্থ সংবাদটি হচ্ছে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এবং শুধু উল্লেখযোগ্যই নয়, একটু রহস্যপূর্ণও।

গত দেড় বৎসর ধরে ঠিক দুমাস অন্তর অন্তর সিঙ্গাপুর থেকে বিনয়েন্দ্রর নামে একটি করে নাকি রেজিস্টার্ড পার্সেল আসত।

পার্সেলের মধ্যে কি যে আসত তা রামচরণ বলতে পারে না। কারণ পার্সেলটি আসবার সঙ্গে সঙ্গেই রসিদে সই করেই বিনয়েন্দ্র পার্সেলটি নিয়েই ল্যাব্রোটারী ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করতেন। কখনও তিনি রামচরণের সামনে পার্সেলটি খোলেন নি।

এবং একটা ব্যাপার রামচরণ লক্ষ্য করেছিল, পার্সেলটি আসবার সময় হয়ে এলেই বিনয়েন্দ্র যেন কেমন বিশেষ রকম একটু চঞ্চল ও অস্থির হয়ে উঠতেন।

বার বার সকালবেলা পিয়ন আসবার সময়টিতে একবার ঘর একবার বারান্দা করতেন।

যদি কখনও দু' একদিন পার্সেলটি আসতে দেরি হত বিনয়েন্দ্রর মেজাজ ও ব্যবহার যেন কেমন খিট্‌খিটে হয়ে উঠত। আবার পার্সেলটি এসে গেলেই ঠাণ্ডা হয়ে যেতেন।

শান্ত ধীর যেমন তার স্বভাব।

ছোট একটি চৌকো বাক্সে পার্সেলটি আসত।

সিংগাপুর থেকে যে পার্সেলটি আসত রামচরণ তা জেনেছিল একদিন বাবুর কথাতেই কিন্তু জানত না কে পাঠাত পার্সেলটি এবং পার্সেলটির মধ্যে কি থাকতই বা।

॥ ১২ ॥

দরজার বাইরে এমন সময় জুতোর আওয়াজ পাওয়া গেল।

কেউ আসছে এ ঘরের দিকে।

ইনস্‌পেক্টার বসাক চোখ তুলে খোলা দরজাটার দিকে তাকালেন।

ভিতরে আসতে পারি স্যার? বাইরে থেকে ভারি পুরুষ কণ্ঠে প্রশ্ন এল।

কে? সীতেশ! এস এস—

চব্বিশ পঁচিশ বৎসর বয়স্ক একটি যুবক ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল। পরিধানে তার ক্যালকাটা পুলিশের সাদা ইউনিফর্ম।

কী খবর সীতেশ ?

জামার পকেট থেকে একটি মুখ-আঁটা 'অন হিজ ম্যাজেসটির সার্ভিস' ছাপ দেওয়া লম্বা খাম বের করে এগিয়ে দিতে দিতে বললে, পোষ্টমর্টেম রিপোর্ট স্যার।

আগ্রহের সঙ্গে খামটা হাতে নিয়ে ইনস্‌পেক্টার বসাক বললেন, থ্যাঙ্কস। আচ্ছা তুমি যেতে পার সীতেশ।

সার্জেণ্ট সীতেশ ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

ইনস্‌পেক্টার বসাক খামটা ছিঁড়ে রিপোর্টটা বের করলেন।

বিনয়েন্দ্রর মৃতদেহের ময়না তদন্তের রিপোর্ট।

ডাঃ বক্সীই ময়না তদন্ত করেছেন নিজে।

দেখলেন মৃতদেহে বিষই পাওয়া গেছে তবে সে সাধারণ কোন কেমিকেল বিষ নয়, স্নেক-ভেনম্। সর্প-বিষ!

বিষ প্রয়োগও যে বিনয়েন্দ্রকে হত্যার চেষ্টায় করা হয়েছিল সেটা ইনস্‌পেক্টার বসাক সকালে মৃতদেহ পরীক্ষা করতে গিয়েই বুঝত পেরেছিলেন।

কিন্তু বুঝতে পারেন নি সেটা সর্প-বিষ হতে পারে। ঘাড়ের নিচে যে রক্ত জমার (একিমোসিস্) চিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল মৃতদেহে, সেটাও কোন ভারি বস্তুর দ্বারা আঘাতই প্রমাণ করছে। এবং শুধু রক্ত জমাই নয়, base of the skullয়ে ফ্রাকচারও পাওয়া গিয়েছে। সে আঘাতে মৃত্যুও ঘটতে পারত।

এদিকে দেহের সর্প-বিষ প্রয়োগের চিহ্নও যথেষ্ট পাওয়া গিয়েছে।

মৃত্যুর কারণ তাই ওই সর্প-বিষ বা আঘাতের যে কোন একটিই হতে পারে।

অথবা একসঙ্গে ছুটিই হতে পারে। ডাঃ বক্সীর অন্ততঃ তাই ধারণা। কাজেই বলা শক্ত এক্ষেত্রে উক্ত ছুটি কারণের কোনটি প্রথম এবং কোনটি দ্বিতীয়।

তবে এ থেকে আরও একটি সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, ব্যাপারটি আদৌ আত্মহত্যা নয়, নিষ্ঠুর হত্যা।

ময়না তদন্তে কি পাওয়া গেল মিঃ বসাক ? প্রশ্ন করে রজতই।

ইনস্‌পেক্টার ময়না তদন্তের রিপোর্টটা সংক্ষেপ বুঝিয়ে বললেন।

সে কি ! স্নেক-ভেনম্‌ ! সর্প-বিষ ! বিস্মিত কণ্ঠে রজত বলে।

হ্যাঁ।

কিন্তু সর্প-বিষ কাকার শরীরে এল কি করে ! তবে কি সর্প-দংশনেই তাঁর মৃত্যু হল ?

সম্ভবত না, গম্ভীর শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন ইনস্‌পেক্টার।

সর্প-দংশন নয় ?

না।

তবে সর্প-বিষ তাঁর দেহে এল কোথা থেকে ?

সেটাই তো বর্তমান রহস্য। কিন্তু সর্প-দংশন যে নয় বুঝলেন কি করে ?

কারণ সর্প-দংশনে মৃত্যু হলে প্রথমতঃ শরীরের কোথাও না কোথাও বিনয়েন্দ্রবাবুর সর্প-দংশনের চিহ্ন নিশ্চয়ই পাওয়া যেত, এবং দ্বিতীয়তঃ কাউকে সর্প-দংশন আচম্‌কা করলে তার পক্ষে নিঃশব্দে ওইভাবে মরে থাকা সম্ভবপর হত না। শুধু তাই নয়, সর্প-দংশনেই যদি মৃত্যু হবে তবে মৃতের ঘাড়ের নীচে সেই কালসিটার দাগ অর্থাৎ একটা শক্ত আঘাতের চিহ্ন এল কোথা থেকে। নিজে নিজে তিনি নিশ্চয়ই ঘাড়ে আঘাত করেন নি বা পড়ে গিয়েও ওইভাবে আঘাত পান নি। পেতে পারেন না।

তবে ?

আমার যতদূর মৃতের ঘাড়ের ও ঠোঁটের ক্ষতচিহ্ন দেখে মনে হচ্ছে রজতবাবু, হত্যাকারী হয়তো তাকে অতর্কিত আঘাত করে অজ্ঞান করে ফেলে, পরে মুখ দিয়ে সর্পবিষ কোন নল বা ওই জাতীয় কিছুর সাহায্যে তাঁর শরীরের মধ্যে প্রয়োগ করেছিল।

তাহলে আপনি স্থির নিশ্চিত যে ব্যাপারটা হত্যা ছাড়া আর কিছুই নয় ?

হ্যাঁ। Clean murder। নৃশংস হত্যা।

Clean murder তাই বা অমন জোর গলায় আপনি বলছেন কি করে ইনস্‌পেক্টার ?

এতক্ষণে এই প্রথম পুরন্দর চৌধুরী পাইপটা মুখ থেকে সরিয়ে কথা বললেন।

সকলে যুগপৎ পুরন্দর চৌধুরীর মুখের দিকে তাকাল।

কি বলছেন মিঃ চৌধুরী ? ইনস্‌পেক্টার বসাক প্রশ্ন করলেন।

বলছিলাম আপনার পোস্ট মর্টেম্ রিপোর্টের ওই findingsটুকুই কি আপনার ওই ধরণের উক্তির অবিসংবাদী প্রুফ্। ব্যাপারটা তো আগাগোড়া, pure and simple একটা accidentও হতে পারে?

পুরন্দর চৌধুরীর দ্বিতীয়বারের কথাগুলো শুনেই সঙ্গে সঙ্গে ইনস্‌পেক্টার বসাক জবাব দিতে পারলেন না, তাঁর মুখের দিকে কিছুক্ষণের জন্য তাকিয়ে রইলেন।

পুরন্দর চৌধুরীও ইনস্‌পেক্টার বসাকের দিকেই তাকিয়েছিলেন। পুরন্দর চৌধুরীর চোখের উপরের ও নীচের পাতা দুটো যেন একটু কুঁচকে আছে, তথাপি সেই কোঁচকান চোখের ফাঁক দিয়ে যে দৃষ্টিটা তাঁর প্রতি স্থির নিবদ্ধ তার মধ্যে যেন সুস্পষ্ট একটা চ্যালেঞ্জের আহ্বান আছে বলে বসাকের মনে হয় ঐ মুহূর্তে।

কয়েকটা মুহূর্ত একটা গুমোট স্তব্ধতার মধ্যে কেটে গেল।

হঠাৎ ইনস্‌পেক্টারের ওষ্ঠপ্রান্তে ক্ষীণ একটা বঙ্কিম হাসির রেখা জেগে উঠল। এবং তিনি মৃদুকণ্ঠে বললেন, না মিঃ চৌধুরী, আপনার সঙ্গে আমি ঠিক একমত হতে পারছি না। ঘাড়ের নিচে একটা বেশ জোরালো আঘাত ও সেই সঙ্গে সর্পবিষ ব্যাপারটাকে ঠিক আকস্মিক একটা দুর্ঘটনার পর্যায়ে ফেলতে পারছি না।

কেন বলুন তো?

আমার position-এ আপনি থাকলেও কি তাই বলতেন না মিঃ চৌধুরী? ধরুন না যদি ব্যাপারটা আপনি যেমন বলছেন simple একটা accident-ই হয়, আঘাতটা ঠিক ঘাড়ের নিচেই লাগল—শরীরের আর কোথায়ও আঘাত এতটুকু লাগল না, তা কেমন করে হবে বলুন? তারপর সর্পবিষের ব্যাপারটা—সেটাই বা accident-এর সঙ্গে খাপ খাওয়াচ্ছেন কি করে? সেটা সর্প-দংশনও হতে পারে। সর্প-দংশনের জায়গাটা হয়তো আপনাদের ময়না তদন্তে এড়িয়ে গিয়েছে। তদন্তের সময় ডাক্তারের চোখে পড়ে নি।

তারপর একটু থেমে বলে, এবং যেটা এমন কিছু অস্বাভাবিকও নয়। সাপ দংশন করলেও তো এমন একটা বড় রকমের কিছু তার দন্ত-দংশন চিহ্ন রেখে যাবে না যেটা সহজেই নজরে পড়তে পারে।

মৃদু হেসে ইনস্‌পেক্টার বসাক আবার বললেন, আপনার কথাটা হয়তো ঠিক, এবং যুক্তি যে একেবারেই নেই তাও বলছি না। কিন্তু কথা হচ্ছে

একটা লোককে সাপে দংশন করল অথচ বাড়ির কেউ তা জানেতেও পারলে না তাই বা কেমন করে সম্ভব বলুন ?

রামচরণ এমন সময় আবার এসে ঘরে প্রবেশ করল, রান্না হয়ে গেছে। টেবিলে কি খাবার দেওয়া হবে ?

ইনস্পেক্টার বসাক বললেন, হ্যাঁ, দিতে বল।

দোতলার একটি ঘরই বিনয়েন্দ্র ডাইনিং রুম হিসাবে ব্যবহার করতেন।

রামচরণ সকলকে সেই ঘরে নিয়ে এল।

মাঝারি গোছের ঘরটি।

ঘরের মাঝখানে লম্বা একটি ডাইনিং টেবিল, তার উপরে ধবধবে একটি চাদর পেতে দেওয়া হয়েছে।

মাথার উপরে সিলিং থেকে ঝুলন্ত সুদৃশ্য ডিম্বাকৃতি শাদা ডোমের মধ্যে উজ্জ্বল বিদ্যুৎবাতি জ্বলছে।

ঘরের একধারে একটি রেফ্রিজ, তার উপরে বসান একটি সুদৃশ্য টাইমপিস।

ঘড়িটা দশটা বেজে বন্ধ হয়ে আছে।

টেবিলের দু পাশে গদি-মোড়া সুদৃশ্য সব আরামদায়ক চেয়ার।

টেবিলের একদিকে বসলেন ইনস্পেক্টার বসাক ও পুরন্দর চৌধুরী, অন্যদিকে বসল রজত ও সুজাতা।

পাচক কাচের প্লেটে করে পরিবেশন করে গেল আহার্য।

কিন্তু আহারে বসে দেখা গেল, কারোরই আহারে যেন তেমন একটা উৎসাহ বা রুচি নেই। খেতে হবে তাই যেন সব খেয়ে চলেছে।

বিশেষ করে সুজাতা যেন একেবারেই কোন খাওয়ার স্পৃহা বোধ করছিল না।

ঘটনার আকস্মিকতায় সে যেন কেমন বিমূঢ় হয়ে পড়েছে। বার বার তার কাকা বিনয়েন্দ্রর কথাটা ও তাঁর মুখখানাই যেন মনের পাতায় ভেসে উঠছিল।

বছর দশেক হবে তার কাকার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয় নি। কাকার অকস্মাৎ এখানে তাদের ছেড়ে চলে আসাটা তার জেঠিমা ও দাদা রজত কাকার কর্তব্যের মস্ত বড় একটা ত্রুটি বলেই কোন দিন যেন ক্ষমা করতে পারেন নি।

কিন্তু সুজাতা কাকার চলে আসা ও এখানে থেকে যাওয়াটাকে তত বড় একটা ত্রুটি বলে মনে করতে পারে নি কোনদিনই।

কারণ কাকা বিনয়েন্দ্রর সে ছিল অশেষ স্নেহের পাত্রী।

অনেক সময় কাকার সঙ্গে তার অনেক মনের কথা হতো। কাকা ও ভাইঝিতে পরস্পরের ভবিষ্যৎ ও কর্মজীবন নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা ও জল্পনা-কল্পনা হ'ত।

কাকার মনের মধ্যে ছিল একটা সত্যিকারের জ্ঞানলিপ্সু বিজ্ঞানী মানুষ। যে মানুষটা ছিল যেমনি সহজ তেমনি শিশুর মত সরল।

কোনপ্রকার ঘোরপ্যাঁচই তার মনের কোথায়ও ছিল না।

এ কথা শাদা কাগজের পৃষ্ঠার মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

কাকা ভাইঝিতে কতদিন আলোচনা হয়েছে, যদি বিনয়েন্দ্রর টাকা থাকত প্রচুর, তবে সে কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে তৈরী করত একটি মনের মত ল্যাব্রোটারী—গবেষণাগার। দিন রাত সেই গবেষণাগারের মধ্যে বসে সে তার আপন ইচ্ছা ও খুশিমত গবেষণা করে যেত। কোন ঝামেলা নেই, সংসারের কোন দুশ্চিন্তা নেই। নেই কোন দায়িত্ব।

কাকার কথায় হাসতে হাসতে সুজাতা বলতো, এক কাজ কর না কেন ছোট্কা, লটারির টিকিট একটা একটা করে কিনতে থাক। হঠাৎ যদি ভাগ্যে একটা মোটা টাকা পেয়ে যাও তো আর কোন অভাবই তোমার থাকবে না। দিব্যি মনের খুশিতে মনোমত এক গবেষণাগার তৈরী করে দিনরাত বসে বসে গবেষণা চালাতে পারবে তখন।

হেসে বিনয়েন্দ্র জবাব দিয়েছেন, ঠাট্টা নয় রে সুতা, এক মস্ত বড় জ্যোতিষী আমার হস্তরেখা বিচার করে বলেছে হঠাৎ-ই আমার নাকি ধনপ্রাপ্তি একদিন হবে।

তবে আর কি! তবে তো নির্ভাবনায় লটারীর টিকিট কিনতে শুরু করতে পার ছোট্কা।

না। লটারীতে আমার বিশ্বাস নেই।

তবে আর হঠাৎ ধনপ্রাপ্তি হবে কি করে?

কেন, অন্য ভাবেও তো হতে পারে।

হ্যাঁ—হতে পারে যদি তোমার দাদামশাই তোমাকে তার বিষয় সম্পত্তি মরবার আগে দিয়ে যান।

সে গুড়ে বালি।

কেন ?

আমাদের উপরে দাদামশাইয়ের যে কি প্রচণ্ড আক্রোশ আর ঘৃণা তা তো তুই জানিস না।

সে আর সকলের যার উপরেই থাক তোমার উপরে তো ছোটবেলায় বুড়ো খুব খুশিই ছিল।

সে তো অতীত কাহিনী। সেখান থেকে চলে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই সে স্নেহ সব উবে গেছে কবে, তার কি আর কিছু অবশিষ্ট আছেরে। তাহলে তো কটা বছর তোমার অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায়ই দেখছি না ছোট্‌কা।

কী রকম ?

চাক্‌রি বাকরি করি আমি, তারপর মাসে মাসে তোমাকে টাকা দিতে শুরু করব, তুমি সেই টাকা জমিয়ে ল্যাব্রোটারী তৈরী করবে।

তা হলেই হয়েছে। ততদিনে চুলে পাক ধরবে, মাথার ঘিলু আসবে শুকিয়ে; তাছাড়া তোকে চাকরি করতে আমি দেবোই বা কেন? চমৎকার একটা ছেলে দেখে তোর বিয়ে দেব, তারপর বুড়ো বয়েসে চাকরি থেকে অবসর নিয়ে তোর বাড়িতে তোর ছেলেমেয়েদের নিয়ে—

খিলখিল করে হেসে উঠেছে সুজাতা।

হাসছিস যে ?

তা কি করব বল ? বিয়েই আমি করব না ঠিক করেছি।

মেয়েছেলে বিয়ে করবি না কি রে ?

কেন, ছেলে হয়ে তুমি যদি বিয়ে না করে থাকতে পার তো মেয়ে হয়ে আমিই বা বিয়ে না করে কেন থাকতে পারব না ?

দুর পাগলী। বিয়ে তোকে করতে হবে বৈকি।

না ছোট্‌কা, বিয়ে আমি কিছুতেই করতে পারব না।

কেন রে ?

বিয়ে করলে তোমার বুড়ো বয়েসে তোমাকে দেখবে কে ?

কেন, বিয়ে হলেও তো আমাকে দেখাশুনা করতে পারবি।

না কাকামণি, তা হয় না। বিয়ে হয়ে গেলে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা আর থাকে না।

সেই ছোট্‌কা যখন হঠাৎ একদিন কলেজ থেকেই সেই যে তাদের কাউকে কোন কিছু না জানিয়ে চলে গেল তার দাদামশাইয়ের ওখানে এবং

আর ফিরে এল না, সুজাতার অভিমানই হয়েছিল তার ছোট্‌কার উপরে খুব বেশি।

তার জেঠিমার মত অভিমানমিশ্রিত আক্রোশ বা তার দাদার মত শুধু আক্রোশই হয় নি।

সে তার ছোট্‌কার মনের কথা জানত বলেই ভেবেছিল, ছোট্‌কার এতদিনকার মনের সাধটা বোধ হয় মিটতে চলেছে, তাই আপাততঃ ছোট্‌কা ক'টা দিন দূরে থাকতে বাধ্য হয়েছেন মাত্র।

তাদের পরস্পরের সম্পর্কটা নষ্ট হয়ে যায় নি। হবেও না কোনদিন।

ফলতঃ সুজাতা যেমন তার জেঠিমাকে লেখা বিনয়েন্দ্রর দুখানা চিঠির কথা ঘুণাক্ষরেও জানত না তেমনি এও জানতে পারে নি যে, কী কঠোর শর্তে বিনয়েন্দ্রর দাদামশাই তার সমস্ত বিষয়সম্পত্তি বিনয়েন্দ্রকে একা দান করে গেছেন।

তারপর পাশ করার পরেই লক্ষ্ণৌয়ে চাকরি পেয়ে সুজাতা চলে গেল। ছোট্‌কার সঙ্গে তার দেখাসাক্ষাৎ বা পত্র মারফত কোনরূপ যোগাযোগ না থাকলেও ছোট্‌কাকে সে একটি দিনের জন্যও ভুলতে পারে নি বা তার কথা না মনে করে থাকতে পারে নি।

এমন কি ইদানীং কিছুদিন থেকেই সে ভাবছিল, এবারে ছোট্‌কাকে একটা চিঠি দেবে। কিন্তু নানা কাজের ঝঞ্ঝাটে সময় করে উঠতে পারছিল না। ঠিক এমনি সময় বিনয়েন্দ্রর জরুরী চিঠিটা হাতে এল। একটা মুহূর্তও আর সুজাতা দেরি করল না।

চিঠি পাওয়ামাত্রই ছুটি নিয়ে সে রওনা হয়ে পড়ল।

এখানে পৌঁছেই অকস্মাৎ ছোট্‌কার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তাই বোধ হয় সবচাইতে বেশী আঘাত পেল সুজাতা।

নেই! তার ছোট্‌কা আর নেই!

অত দূর থেকে এতদিন অদর্শনের পর তীব্র একটা দর্শনাকাঙ্ক্ষা নিয়ে এসেও ছোট্‌কার সঙ্গে তার দেখা হল না।

শুধু যে দেখাই হল না তাই নয়, এ জীবনে আর কখনো তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না।

মৃত্যু! নিষ্ঠুর মৃত্যু চিরদিনের মতই তার ছোট্‌কাকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে তাদের নাগালের বাইরে।

নিরুপায় কান্নায় বুকের ভিতরটা সুজাতার গুমরে গুমরে উঠছিল অথচ চোখে তার এক ফোঁটা জলও নেই।

সে কাঁদতে চাইছে, অথচ কাঁদতে পারছে না।

সমস্ত ব্যাপারটা যেন এখনো কেমন অবিশ্বাস্য বলেই মনে হচ্ছে।

তার ছোট্‌কাকে কেউ নাকি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। অমন শান্ত সরল স্নেহময় লোকটিকে কে হত্যা করল!

আর কেনই বা হত্যা করল!

কেউ তো ছোট্‌কার এমন শত্রু ছিল না!

কি নিষ্ঠুর হত্যা! সর্পবিষ প্রয়োগে হত্যা! রামচরণের নিক হতে সংগৃহীত ইনস্‌পেক্টার বসাকের মুখে শোনা ক্ষণপূর্বের সেই কাহিনীটাই মনে মনে সুজাতা বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করছিল।

কে সেই রহস্যময়ী তরুণী!

কোথা থেকে এসেছিল সে বিনয়েন্দ্রর কাছে! আর হঠাৎ-ই বা কে সে কাকামণির মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে অমন করে চলে গেল!

ছোট্‌কার এই নিষ্ঠুর হত্যা ব্যাপারের মধ্যে তার কোন হাত নেই তো!

॥ ১৩ ॥

হঠাৎ ইনস্‌পেক্টার বসাকের প্রশ্নে সুজাতার চমক ভাঙল, সুজাতা দেবী, আপনি তো কিছুই খেলেন না?

একেবারেই ক্ষিধে নেই।

ইনস্‌পেক্টার বসাক বুঝতে পারেন, একে দীর্ঘ ট্রেণ-জার্নী, তার উপর এই আকস্মিক দুঃসংবাদ, নারীর মন স্বভাবতই হয়তো মুষড়ে পড়েছে।

কিছু আর বললেন না ইনস্‌পেক্টার।

আহারপর্ব সমাপ্ত হয়েছিল। সকলে উঠে পড়লেন।

রামচরণ ইতিমধ্যেই সকলের শয়নের ব্যবস্থা করে রেখেছিল।

দোতলায় চারটি ঘরের একটি ঘরে পুরন্দর চৌধুরীর, একটি ঘরে রজতের, একটি ঘরে সুজাতার ও অন্য একটি ঘরে ইনস্‌পেক্টার বসাকের।

সকলেই শ্রান্ত। তাছাড়া রাতও অনেক হয়েছিল। একে একে তাই সকলেই আহারের পর যে যার নির্দিষ্ট শয়নঘরে গিয়ে প্রবেশ করল।

নীলকুঠির আশেপাশে একমাত্র, বামপাশে প্রায় লাগোয়া দোতলা একটি বাড়ি ছাড়া অন্য কোন বাড়ি নেই।

ডানদিকে অপ্রশস্ত একটি গলিপথ, তারপর একটা চুণ-সুরকির আড়ৎ। তার ওদিকে আবার বাড়ি।

নিজের নির্দিষ্ট ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে বাগানের দিককার জানালাটা খুলে বসাক জানালার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

পকেট থেকে সিগারেট-কেসটা বের করে, কেস থেকে একটা সিগারেট নিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করলেন।

মিঃ বসাক খুব বেশি ধূমপান করেন না। রাত্রে দিনে হয়তো চার পাঁচটার বেশি সিগারেট নয়।

রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা হবে।

ক্ষীণ একফালি চাঁদ আকাশে উঠেছে। তারই ক্ষীণ আলো বাগানের গাছপালায় যেন একটা ধূসর চাদর টেনে দিয়েছে।

গঙ্গায় বোধ হয় এখন জোয়ার। বাগানের সামনে ঘাটের সিঁড়ির শেষ ধাপ পর্যন্ত নিশ্চয়ই স্ফীত জলরাশি উঠে এসেছে।

কল কল ছল ছল শব্দ কানে আসে।

গঙ্গার ওপারে মিলের আলোকমালা অন্ধকার আকাশপটে যেন সাতনরী হারের মত দোলে।

বিনয়েন্দ্রর হত্যার ব্যাপারটাই মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছিল তখন বসাকের। আসলে মৃত্যুর কারণ কোনটা। ঘাড়ের নিচে আঘাত, না সর্পবিষ। দুটি কারণের যে কোন একটিই পৃথক পৃথক ভাবে মৃত্যু ঘটিয়ে থাকতে পারে। আবার দুটি একত্রেও মৃত্যুর কারণ হতে পারে। আর চোখে যা দেখা গেছে ও হাতের কাছে যে-সব প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে তাতে মনে হয় ঘাড়ে কোন ভারি শক্ত বস্তু দিয়ে আঘাত করাতেই বিনয়েন্দ্র অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল, তারপর সেই অবস্থাতেই সম্ভবতঃ বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে তাকে।

আরও কতকগুলো ব্যাপার যার কোন সঠিক উত্তর যেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

বিনয়েন্দ্রর সর্বদা ব্যবহৃত শাদা রবারের চপ্পল জোড়া কোথায় গেল? ঘড়িটা ভাঙা অবস্থাতেই ঘরের মেঝেতে পড়েছিল কেন?

ল্যাব্রোটারী ঘরের দরজাটি খোলা ছিল কেন?

যে তরুণী মহিলাটি বিনয়েন্দ্রর সঙ্গে কাজ করতে এসেছিল, মাস চারেক

কাজ করবার পর হঠাৎ-ই বা সে কাউকে কোন কিছু না জানিয়ে বিনয়েন্দ্রর নিহত হবার দিন দশেক আগে চলে গেল কেন?

যে নূর দাড়ি, চোখে চশমা সম্ভবতঃ ইউ, পি, হতে আগত ভদ্রলোকটি দুবার বিনয়েন্দ্রর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন তিনিই বা কে?

কি তাঁর পরিচয়?

সিংগাপুর থেকে যে পার্সেলটি নিয়মিত বিনয়েন্দ্রর কাছে আসত তার মধ্যেই বা কি থাকত?

আর কেই বা পাঠাত পার্সেলটি?

হঠাৎ চকিতে একটা কথা মনের মধ্যে উদয় হয়।

পুরন্দর চৌধুরী!

পুরন্দর চৌধুরী সিংগাপুরেই থাকেন। এবং সেখান থেকেই বিনয়েন্দ্রর চিঠি পেয়ে এসেছেন। পুরন্দর চৌধুরী বিনয়েন্দ্রর বিশেষ বন্ধু ছিলেন। সিংগাপুর হতে প্রেরিত সেই রহস্যময় পার্সেলের সঙ্গে ওই পুরন্দর চৌধুরীর কোন সম্পর্ক নেই তো!

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চিন্তাটা যেন পুরন্দর চৌধুরীকে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খেতে শুরু করে বসাকের মাথার মধ্যে।

পুরন্দর চৌধুরী।

লোকটির চেহারাটা আর একবার বসাকের মনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কি করেন ভদ্রলোক সিংগাপুরে তাও জিজ্ঞাসা করা হয় নি। ঘনিষ্ঠতা ছিল পুরন্দর চৌধুরীর সঙ্গে বিনয়েন্দ্রর অনেক কাল, কিন্তু সে ঘনিষ্ঠতা সত্যিকারের কতখানি ছিল তা এখনও জানা যায় নি।

তারপর ওই চিঠি।

পুরন্দর চৌধুরী, সুজাতা দেবী ও রজতবাবু প্রত্যেকেই চিঠি পেয়ে এখানে আসছেন।

চিঠির তারিখ কবেকার?

তিনখানি চিঠিই মিঃ বসাকের পকেটে ছিল। ঘরের আলো জেলে তিনখানি চিঠিই পকেট থেকে টেনে বের করলেন মিঃ বসাক।

আজ মাসের সতের তারিখ। ১৬ই তারিখে রাত্রি একটা থেকে সোয়া একটার মধ্যে বিনয়েন্দ্র নিহত হয়েছেন। এবং চিঠি লেখার তারিখ দেখা যাচ্ছে ১২ই।

হঠাৎ মনে হয় সুজাতা দেবী বা রজতবাবুর হয়তো চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রওনা হয়ে এখানে আজ এসে পৌঁছান সম্ভবপর হয়েছে, কিন্তু পুরন্দর চৌধুরীর পক্ষে সিংগাপুরে চিঠি পেয়ে আজ সকালেই এসে পৌঁছান সম্ভব হল কি করে?

হঠাৎ এমন সময় খুট করে একটা অস্পষ্ট শব্দ মিঃ বসাকের কানে এল। চকিতে শ্রবণেন্দ্রিয় তার সজাগ হয়ে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিলেন মিঃ বসাক।

ঘর অন্ধকার হয়ে গেল মুহূর্তে।

সেই অন্ধকার ঘরের মধ্যে কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে থাকেন মিঃ বসাক।

স্পষ্ট শুনেছেন তিনি খুট করে একটা শব্দ—মৃদু কিন্তু স্পষ্ট।

মুহূর্ত পরে আবার সেই মৃদু অথচ স্পষ্ট শব্দটা শোনা গেল।

মুহূর্তকাল অতঃপর বসাক কি যেন ভাবলেন, তারপরই এগিয়ে গিয়ে নিঃশব্দে হাত দিয়ে চেপে ধরে ধীরে ধীরে ঘরের খিলটা খুলে দরজাটা ফাঁক করে বারান্দায় দৃষ্টিপাত করলেন।

লম্বা টানা বারান্দাটা ক্ষীণ চাঁদের আলোয় স্পষ্ট না হলেও বেশ আবছা আবছা দেখা যাচ্ছিল।

আবার সেই শব্দটা শোনা গেল।

তাকিয়ে রইলেন মিঃ বসাক।

হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল, তৃতীয় ঘর থেকে সর্বাঙ্গ একটা শাদা চাদরে আবৃত দীর্ঘকায় একটা মূর্তি যেন পা টিপে টিপে বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

রুদ্ধশ্বাসে দরজার সামান্য ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে থাকেন মিঃ বসাক সেই দিকে।

॥ ১৪ ॥

আপাদমস্তক শ্বেতবস্ত্রে আবৃত দীর্ঘ মূর্তিটি ঘর থেকে বের হয়ে ক্ষণেকের জন্য মনে হল যেন বসাকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বারান্দাটার এক প্রান্ত হতে অন্য এক প্রান্ত পর্যন্ত দেখে নিল সতর্কভাবে।

তারপর ধীরে ধীরে পা টিপে টিপে তাঁরই ঘরের দিকে যেন এগিয়ে আসতে লাগল সেই মূর্তি।

বারান্দায় যেটুকু ক্ষীণ চাঁদের আলো আসছিল তাও হঠাৎ যেন অন্তর্হিত হয়। বোধ হয় মেঘের আড়ালে চাঁদ ঢাকা পড়েছে।

মিঃ বসাক তাকিয়ে রইলেন সেই দিকে।

মূর্তিটা খুব অস্পষ্ট দেখা যায়, এগিয়ে আসছে।

অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টিতে মিঃ বসাক অগ্রবর্তী মূর্তির দিকে নজর রাখলেন। ক্রমশঃ পায়ে পায়ে মূর্তি দাঁড়াল ঠিক গিয়ে ল্যাব্রোটারী ঘরের বন্ধ দরজার সামনে।

মিঃ বসাকের মনে পড়ল বাড়িতে আর বড় মজবুত তালা না খুঁজে পাওয়ায় একতলা ও দোতলার সংযোজিত সিঁড়ির মুখে কোলাপসিবিল গেটটাতে ওই ল্যাব্রোটারী ঘরের দরজার তালাটাই রাত্রে খুলিয়েই লাগিয়েছিলেন রামচরণকে দিয়ে।

ল্যাব্রোটারীটা এখন খোলাই রয়েছে।

দরজা খোলার শব্দ পাওয়া গেল অত্যন্ত মৃদু হলেও স্পষ্ট।

মূর্তি ল্যাব্রোটারী ঘরের মধ্যে অদৃশ্য হল।

কয়েকটা মুহূর্ত অপেক্ষা করলেন রুদ্ধশ্বাসে ইনস্‌পেক্টার বসাক।

তারপর ঘর থেকে বের হয়ে এগিয়ে গেলেন ল্যাব্রোটারী ঘরের দরজাটার দিকে পা টিপে অতি সন্তপণে।

দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গিয়েছে ততক্ষণে।

এক মুহূর্ত কি ভাবলেন, তারপর পকেট থেকে রুমালটা বের করে দরজার কড়া দুটো সেই রুমাল দিয়ে বেশ শক্ত করে গিঁট দিয়ে বাঁধলেন।

এবং সোজা নিজের ঘরে ফিরে এসে তাঁর ঘর ও বিনয়েন্দ্রর শয়নঘরের মধ্যবর্তী দরজাটা খুলে সেই শয়নঘরে প্রবেশ করলেন। পকেটে পিস্তল ও শক্তিশালী একটা টর্চ নিতে ভুললেন না।

এ বাড়ির সমস্ত ঘর ও ব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্বাহ্লেই তিনি ভাল করে সব পরীক্ষা করে জেনে নিয়েছিলেন।

বিনয়েন্দ্রর শয়নঘর ও ল্যাব্রোটারী ঘরের মধ্যবর্তী দরজাটা এবারে খুলে ফেলে ল্যাব্রোটারী ঘরের মধ্যে দৃষ্টিপাত করলেন।

একটা আলোর সন্ধানী রশ্মি অন্ধকার ল্যাব্রোটারী ঘরটার মধ্যে ইতস্ততঃ সঞ্চারিত হচ্ছে।

বুঝতে কষ্ট হল না বসাকের, ক্ষণপূর্বে যে বস্ত্রাবৃত মূর্তি ঐ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করছে তাঁরই হাতের সন্ধানী আলোর সঞ্চরণশীল রশ্মি ওটা।

পা টিপে টিপে নিঃশব্দে দেওয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে এগিয়ে চললেন মিঃ বসাক ঘরের দেওয়ালের সুইচ বোর্ডটার দিকে।

খুট্ করে সুইচ্ টেপার একটা শব্দ হল এবং সঙ্গে সঙ্গে অত্যুজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয় ঘরের অন্ধকার অপসারিত হল।

অস্ফুট একটা শব্দ শোনা গেল।

নড়বেন না। দাঁড়ান—যেমন আছেন। কঠিন নির্দেশ যেন উচ্চারিত হল ইনস্‌পেক্টার বসাকের কণ্ঠ থেকে।

দিনের আলোর মতই সমস্ত ঘরটা চোখের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মাত্র হাত পাঁচেক ব্যবধানে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে সেই শ্বেত বস্ত্রাবৃত মূর্তি তখন। শ্বেতবস্ত্রে আবৃত যেন একটি প্রস্তরমূর্তি।

কয়েকটা স্তব্ধ মুহূর্ত কেটে গেল।

ইনস্‌পেক্টারই আবার কথা বললেন, পুরন্দরবাবু ঘুরে দাঁড়ান।

পুরন্দর চৌধুরী ঘুরে দাঁড়ালেন। নিজেই গায়ের চাদরটা খুলে ফেললেন।

বসুন পুরন্দরবাবু, কথা আছে আপনার সঙ্গে। বসুন ওই টুলটায়।

পুরন্দর চৌধুরী যেন যন্ত্রচালিতের মতই সামনের টুলটার 'পরে গিয়ে বসলেন।

ঘরে একটা আরাম কেদারা একপাশে ছিল, সেটা টেনে এনে সামনা-সামনি উপবেশন করলেন ইনস্‌পেক্টার প্রশান্ত বসাক, তারপর প্রশ্ন শুরু করলেন।

এবারে বলুন শুনি, কেন এই মাঝরাত্রে চোরের মত লুকিয়ে এঘরে এসেছেন?

ইনস্‌পেক্টার বসাক প্রশ্ন করা সত্ত্বেও পুরন্দর চৌধুরী চুপ করে রইলেন। কোন জবাব দিলেন না।

পুরন্দরবাবু? আবার ডাকলেন মিঃ বসাক।

পুরন্দর চৌধুরী মুখ তুলে তাকালেন ইনস্‌পেক্টারের মুখের দিকে। তারপর যেন মনে হল একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস তাঁর বুকখানা কাঁপিয়ে বের হয়ে এল।

কথা বললেন পুরন্দর চৌধুরী অতঃপর অত্যন্ত মৃদু শান্ত কণ্ঠে, আপনি কি ভাবছেন জানি না ইনস্‌পেক্টার। কিন্তু বিশ্বাস করুন বিনয়েন্দ্রকে আমি হত্যা করি নি। সে আমার বন্ধু ছিল। সেই কলেজের সেকেণ্ড ইয়ার থেকে তার সঙ্গে আমার পরিচয়।

আমি তো বলি নি মিঃ চৌধুরী যে আপনিই তাকে হত্যা করেছেন। জবাব দিলেন ইনস্‌পেক্টার শান্ত মৃদু কণ্ঠে।

বিশ্বাস করুন মিঃ বসাক, আমি নিজেও কম বিস্মিত ও হতভম্ব হয়ে যাই নি তার এই আকস্মিক মৃত্যুতে। পুরন্দর চৌধুরী আবার বলতে লাগলেন, চিঠিটা তার পাওয়ামাত্রই এরোপ্লেনে আমি রওনা হই—

কথার মাঝখানে হঠাৎ বাধা দিলেন ইনস্‌পেক্টার, কিন্তু সিংগাপুরের প্লেন তো রাত দশটায় কলকাতায় পৌঁছায়। সে ক্ষেত্রে চিঠিটা জরুরী মনে করে চিঠিটা পাওয়া মাত্রই যদি রওনা হয়ে এসে থাকেন তো সেই রাত্রেই সোজা এখানে আপনার বন্ধুর কাছে চলে না এসে পরের দিন সকালে এলেন কেন মিঃ চৌধুরী?

ইনস্‌পেক্টারের আকস্মিক প্রশ্নে পুরন্দর চৌধুরী সত্যিই মনে হল কেমন যেন একটু বিব্রত বোধ করেন, কিন্তু পরক্ষণেই সে বিব্রত ভাবটা সামলে নিয়ে বললেন, অত রাত্রে আর এসে কি হবে, তাই রাতটা হোটেলে কাটিয়ে পরের দিন সকালেই চলে আসি।

যদি কিছু না মনে করেন তো কোন্‌ হোটেলে রাত্রে উঠেছিলেন?

হোটেল স্যাভয়ে।

হুঁ। আচ্ছা মিঃ চৌধুরী?

বলুন।

একটা কথা আপনি শুনেছেন, বিনয়েন্দ্রবাবুর নামে নিয়মিত ভাবে সিংগাপুর থেকে কিসের একটা পার্সেল আসত।

হ্যাঁ—

আপনি বলতে পারেন সে পার্সেল সম্পর্কে কিছু? সিংগাপুরে কার কাছ থেকে পার্সেলটা আসত? আপনিও তো সিংগাপুরেই থাকেন।

পুরন্দর চৌধুরী চুপ করে থাকেন।

কি, জবাব দিচ্ছেন না যে? পার্সেলটা সম্পর্কে আপনি তাহলে কিছু জানেন না বোধ হয়?

পার্সেলটা আমিই পাঠাতাম তাকে। মৃদু কণ্ঠে জবাব দিলেন পুরন্দর চৌধুরী এবারে।

আপনি! আপনিই তাহলে পার্সেলটা পাঠাতেন!

হ্যাঁ।

ও, তা কি পাঠাতেন পার্সেলের মধ্যে করে, জানতে পারি কি?

একটা tonic।

টনিক! কিসের tonic পাঠাতেন মিঃ চৌধুরী বন্ধুকে আপনার?

পুরন্দর চৌধুরী আবার চুপ করে থাকেন।

মিথ্যে আর সব কথা গোপন করবার চেষ্টা করে কোনই লাভ নেই পুরন্দরবাবু। আপনি না বললেও সব কথা আমরা সিংগাপুর পুলিশকে তার করলেই তারা খোজ নিয়ে আমাদের জানাবে।

একপ্রকার মাদক দ্রব্য তার মধ্যে থাকত।

মাদক দ্রব্য! হুঁ, আমি ওই রকমই কিছু অনুমান করেছিলাম রামচরণের মুখে সব কথা শুনে। কিন্তু কি ধরণের মাদক দ্রব্য তার মধ্যে থাকত বলবেন কি?

দু'তিন রকমের বুনো গাছের শিকড়, বাকল আর—

আর—আর কি থাকত তার মধ্যে?

সর্প-বিষ।

কি? কি বললেন?

সর্প-বিষ। স্নেক-ভেনম্।

আপনি! আপনি পাঠাতেন সেই বস্তুটি! তাহলে আপনিই বোধ হয় বন্ধুটিকে আপনার ওই বিষের সঙ্গে পরিচিত করিয়েছিলেন?

কতকটা হ্যাঁও বটে, আবার নাও বলতে পারেন।

মানে!

তাহলে আপনাকে সব কথা খুলে বলতে হয়।

বলুন।

ইনস্‌পেক্টার বসাকের নির্দেশে পুরন্দর অতঃপর যে কাহিনী বিবৃত করলেন তা যেমন বিস্ময়কর তেমনি চমকপ্রদ।

॥ ১৫ ॥

আই. এস-সি. ও বি. এস-সি.-তে এক বছর কলকাতার কলেজে পুরন্দর চৌধুরী ও বিনয়েন্দ্র সহপাঠী ছিলেন।

সেই সময়েই উভয়ের মধ্যে নাকি প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়।

উভয়েরই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে ধৈর্য বা একনিষ্ঠতা যা বিনয়েন্দ্রর চরিত্রে সবচাইতে বড় গুণ ছিল, সে দুটির একটিও ছিল না পুরন্দরের চরিত্রে।

শুধু তাই নয়, পুরন্দরের চিরদিনই প্রচণ্ড একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল যেমন করেই হোক, যে কোন উপায়ে বড়লোক বা ধনী হবার। ছোটবেলায় মা-বাপকে হারিয়ে পুরন্দর মানুষ হয়েছিলেন এক গরীব কেরানী মাতুলের আশ্রয়ে।

থার্ড ইয়ারে পড়তে পড়তেই হঠাৎ সেই মাতুল মারা গেলেন। সংসার হল অচল। পুরন্দরের পড়াশুনাও বন্ধ হল।

কলেজ ছেড়ে পুরন্দর এদিক-ওদিক কিছুদিন চাকরির চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোথাও বিশেষ কিছু সুবিধা হল না।

এমন সময় হঠাৎ ডকে এক জাহাজের মেটের সঙ্গে ঘটনাচক্রে পুরন্দরের আলাপ হয়।

ইদ্রিস্ মিঞা।

বর্মা মুলুকে গিয়ে অনেকের বরাতের চাকা নাকি ঘুরে গেছে। এ ধরনের দু-চারটে সরস গল্প এ-ওর কাছে পুরন্দর চৌধুরী শোনা অবধি ওই সময় প্রায়ই তিনি ডক অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতেন, যদি কাউকে ধরে কোনমতে জাহাজে চেপে বিনা পয়সায় সেই সব জায়গায় যাওয়া যায় একবার।

কোনক্রমে একবার সেখানে গিয়ে সে পৌঁছতে পারলে সে ঠিক তার ভাগ্যের চাকাটা ঘুরিয়ে দেবে!

ইদ্রিস্ মিঞা জাহাজে বয়লারের খালাসীর চাকরি দিয়ে বর্মায় নিয়ে যাবার নাম করে পুরন্দরকে। পুরন্দর সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যান এবং নির্দিষ্ট দিনে জাহাজে উঠে পড়েন। সেবার জাহাজটা চায়নায় যাচ্ছিল মাল নিয়ে। জাহাজটা ছিল মালটানা জাহাজ। কার্গো জাহাজ। জাহাজটা সিংগাপুর ঘুরে যাচ্ছিল, সিংগাপুরে থামতেই পুরন্দর কিন্তু বন্দরে নেমে গেলে আর উঠলেন না জাহাজে, কেন না, দিন দশেক বয়লার ঘরের প্রচণ্ড তাপের মধ্যে কয়লা ঠেলে হাতে ফোস্কা তো পড়েছিলই, শরীরও প্রায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছিল গরমে আর পরিশ্রমে। হাতে মাত্র পাঁচটি টাকা, গায়ে খালাসীর নীল পোশাক। পুরন্দর পথে পথে ঘুরতে লাগলেন যা হোক কোন একটা চাকরির সন্ধানে।

কিন্তু একজন বিদেশীর পক্ষে চাকরি পাওয়া অত সহজ নয়।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন হোটেলে এক বাঙালী প্রৌঢ়ের সঙ্গে আলাপ হয়। শোনা গেল, সেও নাকি একদা এসেছিল ভাগ্যান্বেষণে সিংগাপুরে। সেই তাকে এক রবার গুডসের ফ্যাক্টরীতে চাকরি করে দেয়। এবং সেখানেই আলাপ হয় বছর দেড়েক বাদে এক চীনা ভদ্রলোকের সঙ্গে। নাম তার লিং সিং।

লিং সিংয়ের দেহে পুরোপুরি চীনের রক্ত ছিল না। তার মা ছিল চীনা, আর বাপ ছিল অ্যাংলো মালয়ী।

শহরের মধ্যেই লিং সিংয়ের ছিল একটা কিউরিও শপ্।

লোকজনের মধ্যে লিং সিং ও তার স্ত্রী—কু-সি।

দুজনেরই বয়স হয়েছে।

শহরের একটা হোটেলে সাধারণতঃ যেখানে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাই যাতায়াত করত, লিং সিং-ও সেখানে যেত।

পুরন্দর চৌধুরীও সেই হোটেলে মধ্যে মধ্যে যেতেন।

সেইখানেই আলাপ হয় দুজনার।

লিং সিংকে মধ্যে মধ্যে পুরন্দর চৌধুরী কোথাও একটা ভাল চাকরি করে দেবার জন্য বলতেন।

লিং সিং আশ্বাস দিত সে চেষ্টা করবে।

শেষে একদিন লিং সিং তাঁকে বললে, সত্যিই যদি সে চাকরি করতে চায় তো যেন সে আজ সন্ধ্যার পর তার কিউরিও শপে যায়। ঠিকানা দিয়ে দিল লিং সিং পুরন্দরকে তার দোকানের।

সেই দিনই সন্ধ্যার পর পুরন্দর লিং সিংয়ের কিউরিও শপে গেলেন তার সঙ্গে দেখা করতে।

এ-কথা সে-কথার পর লিং সিং এক সময় বললে, সে এবং তার স্ত্রীর দুজনারই বয়স হয়েছে। তাদের কোন ছেলেমেয়ে বা আত্মীয়স্বজনও কেউ নেই। তারা একজন পুরন্দরের মতই বিশ্বাসী ও কর্মঠ লোক খুঁজছে, তাদের দোকানে থাকবে, দোকান দেখা-শোনা করবে, খাওয়া থাকা ছাড়াও একশো ডলার করে মাসে মাহিনা পাবে।

মাত্র পঞ্চাশ ডলার করে মাইনে পাচ্ছিলেন পুরন্দর ফ্যাক্টারীতে; সানন্দে তিনি রাজী হয়ে গেলেন। এবং পরের দিন থেকেই লিং সিংয়ের কিউরিও শপে কাজে লেগে গেলেন।

তারপর? মিঃ বসাক শুধালেন।

তারপর?

হ্যাঁ—

॥ ১৬ ॥

পুরন্দর চৌধুরী আবার বলতে লাগলেন।

মাসখানেকের মধ্যেই পুরন্দর চৌধুরী দেখলেন এবং বুঝতেও পারলেন, লিং সিংয়ের দোকানটা বাইরে থেকে একটা কিউরিও শপ মনে হলেও এবং সেখানে বহু বিচিত্র খরিদ্দারদের নিত্য আনাগোনা থাকলেও, আসলে সেটা একটা কোন দুষ্প্রাপ্য অথচ রহস্যপূর্ণ চোরাই মাদক দ্রব্য কারবারেরই আড্ডা।

লিং সিংয়ের কিউরিওর বেচা-কেনাটা একটা আসলে বাইরের ঠাট্ মাত্র। এবং চোরাই মাদক দ্রব্যের কারবারটাই ছিল লিং সিংয়ের আসল কারবার। কিন্তু সদা সতর্ক ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেও পুরন্দর কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত জানতেই পারেন নি যে, লিং সিংয়ের সেই মাদক দ্রব্যটি আসলে কি? এবং কোথায় তা রাখা হয় বা কি ভাবে বিক্রী করা হয়।

মধ্যে মধ্যে পুরন্দর কেবল শুনতেন, এক আধজন খরিদ্দার এসে বলত আসল সিঙ্গাপুরী মুক্তা চায়।...

লিং সিং তখন তাঁকে দোতলায় তার শয়ন ঘরের সংলগ্ন ছোট্ট একটি কামরার মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে কামরার দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিত। মিনিট পনের কুড়ি পরে খরিদ্দার ও লিং সিং কামরা থেকে বের হয়ে আসত।

অবশেষে পুরন্দরের কেমন যেন সন্দেহ হয় ওই সিগংাপুরী সজ্জার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন রহস্য রয়েছে। নচেৎ ওই মুক্তার ব্যাপারে লিং সিংয়ের অত সতর্কতা কেন।

ফলে পুরন্দর কাজ করতেন, কিন্তু তাঁর সজাগ সতর্ক দৃষ্টি সর্বদা মেলে রাখতেন যেমন করেই হোক সিংগাপুরী আসল মুক্তা রহস্যটা জানবার জন্য।

আরও একটা ব্যাপার পুরন্দর লক্ষ্য করেছিলেন, লিং সিংয়ের কিউরিও শপে বেচা কেনা যা হত, সেটা এমন বিশেষ কিছুই নয় যার দ্বারা লিং সিংয়ের একটা মোটা রকমের আয় হতে পারে।

এবং লিং সিঙের অবস্থা যে বেশ সচ্ছল, সেটা বুঝতে অন্ধেরও কষ্ট হত না।

পুরন্দর চৌধুরী লক্ষ্য করেছিলেন, মুক্তা সন্ধানী যারা সাধারণতঃ কিউরিও শপে লিং সিংয়ের কাছে আসত তারা সাধারণতঃ স্থানীয় লোক নয়।

চীন, মালয়, জাভা, সুমাত্রা, ভারতবর্ষ প্রভৃতি জায়গা থেকেই সব খরিদ্দারেরা আসত।

তারা আসত জাহাজে চেপে, কিন্তু সিংগাপুরে থাকত না তারা।

পুরন্দর চৌধুরী চাকরি করতেন বটে লিং সিংয়ের ওখানে, কিন্তু একতলা ছেড়ে দোতলায় উঠবার তাঁর কোন অধিকার ছিল না।

লিং সিংয়ের বউ-ই সাধারণতঃ নিচে পুরন্দরের খাবার পৌঁছে দিয়ে যেত প্রত্যহ।

যেদিন সে আসতেন না, যে ছোকরা মালয়ী চাকরটা ওখানে কাজ করত সেই নিয়ে আসত তাঁর খাবার।

এমনি করে দীর্ঘ আট মাস কেটে গেল।

এমন সময় হঠাৎ লিং সিং অসুস্থ হয়ে পড়ল ক'দিন।

লিং সিং আর নিচে নামে না।

পুরন্দর একা একাই লিং সিংয়ের কিউরিও শপ দেখাশোনা করেন।

সকাল থেকেই সেদিন আকাশটা ছিল মেঘলা, টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। পুরন্দর একা কাউণ্টারের ওপাশে বসে একটা ইংরেজী নভেল পড়ছেন। এমন সময় দীর্ঘকায় এক সাহেবী পোশাক পরিহিত, মাথায় ফেল্টক্যাপ, গায়ে বর্ষাতি এক আগন্তুক এসে দোকানে প্রবেশ করল।

গুড মর্ণিং!

পুরন্দর বই থেকে মুখ তুলে তাকালেন। আগন্তুকের তামাটে মুখের রঙ সাক্ষ্য দিচ্ছে বহু রৌদ্র-জলের ইতিহাসের। মুখে তামাটে রঙের চাপদাড়ি

ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে আগন্তুক জিজ্ঞাসা করল, লিং সিং কোথায়?

পুরন্দর বললেন, যা বলবার তিনি তার কাছেই বলতে পারেন, কারণ লিং সিং অসুস্থ।

আগন্তুক বললে তার কিছু সিংগাপুরী মুক্তার প্রয়োজন।

সিংগাপুরী মুক্তা! সঙ্গে সঙ্গে একটা মতলব পুরন্দরের মনের মধ্যে স্থান পায়।

আগন্তুককে অপেক্ষা করতে বলে পুরন্দর এগিয়ে গিয়ে দরজার পাশে কলিং বেলটা টিপলেন।

একটু পরেই লিং সিংয়ের স্ত্রীর মুখ সিঁড়ির 'পরে দেখা গেল।

পুরন্দর বললেন, তোমার স্বামীকে বলো সিংগাপুরী মুক্তার একজন খরিদ্দার এসেছে।

খানিক পরে লিং সিংয়ের স্ত্রী এসে আগন্তুক ও পুরন্দর দুজনকেই উপরে ডেকে নিয়ে গেল লিং সিংয়ের শয়নঘরে। এই সর্বপ্রথম লিং সিংয়ের বাড়ির

দোতলায় উঠলেন পুরন্দর এখানে আসবার পর। শয্যার উপরে লিং সিং শুয়ে ছিল।

পুরন্দরের সামনেই লিং সিং তার শয্যার তলা থেকে একটা চৌকো কাঠের বাক্স বের করে ডালাটা খুলতেই পুরন্দর দেখলেন সত্যিই বাক্সে ভর্তি ছোট ছোট সব শাদা মুক্তো।

একটা প্যাকেটে করে কিছু মুক্তা নিয়ে পরিবর্তে একগোছা নোট গুণে দিয়ে আগন্তুক চলে গেল।

সেই রাত্রেই আবার পুরন্দরের ডাক এল লিং সিংয়ের শয়নঘরে দোতলায়।

আমাকে ডেকেছ?

হ্যাঁ, বসো। শয্যার পাশেই লিং সিং একটা খালি চেয়ার দেখিয়ে দিল পুরন্দরকে বসবার জন্য।

পুরন্দর বসলেন।

ঘরের মধ্যে একটা টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে। বাইরে শুরু হয়েছে ঝোড়ো হাওয়া। ঘরের বন্ধ কাচের জানালা সেই হাওয়ায় থর থর করে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

লিং সিংয়ের পায়ের কাছে তার প্রৌঢ়া স্ত্রী নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার ঈষৎ হলদে চ্যাপ্টা মুখে বাতির আলো কেমন ম্লান দেখায়।

দেখ পুরন্দর, লিং সিং বলতে লাগল, তোমাকে আমি এখানে এনেছিলাম সামান্য ঐ একশো ডলার মাইনের চাকরির জন্যে নয়। আমার এবং আমার স্ত্রীর বয়স হয়েছে, ক্রমশঃ দেহের শক্তিও আমাদের কমে আসছে৭ আমাদের কোন ছেলেপিলে নেই। তাই আমি এমন একজন লোক কিছুদিন থেকে খুঁজছিলাম যাকে পুরোপুরি আমরা বিশ্বাস করতে পারি। হোটেলে তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় হওয়ার পর থেকেই তোমার উপরে আমার নজর পড়েছিল। তোমাকে আমি যাচাই করছিলাম। দেখলাম, তোমার মধ্যে একটা সৎ অথচ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কষ্টসহিষ্ণু মানুষ আছে। আমাদেরও একজন দেখাশোনা করবার মত সৎ ও বিশ্বাসী লোক চাই। মনে হল, তোমাকে দিয়ে হয়তো আমাদের সে আশা যেন মিটতে পারে। চাকরি দিয়ে তোমাকে তাই নিয়ে এলাম। দীর্ঘ আটমাস তোমাকে দিনের পর দিন আমি পরীক্ষা করেছি। বুঝেছি, লোক নির্বাচনে আমি ঠকি নি।

এই পর্যন্ত একটানা কথাগুলো বলে লিং সিং পরিশ্রমে যেন হাঁপাতে লাগল।

পুরন্দর বললেন, লিং সিং, তুমি এখন অসুস্থ। পরে এসব কথা হবে। আজ থাক।

না। আমার যা বলবার আজই আগাগোড়া সব তোমাকে আমি বলব বলেই ডেকে এনেছি এখানে। শোন পুরন্দর। কিওরিও শপটাই আমার আসল ব্যবসা নয়। আমার আসল ব্যবসাটি হচ্ছে বিচিত্র এক প্রকার মিশ্র মাদক দ্রব্য বেচা। বিশেষ সেই দ্রব্যটি এমনি প্রক্রিয়ায় তৈরী যে, একবার তাতে মানুষ অভ্যস্ত হলে পরবর্তী জীবনে আর তাকে ছাড়তে পারবে না। এবং তখন যে কোন মূল্যের বিনিময়েও তাকে সেই মাদক দ্রব্যটি সংগ্রহ করতেই হবে। বিশেষ ঐ বিচিত্র মাদক দ্রব্যটির তৈরীর প্রক্রিয়া আমি শিখেছিলাম আমার ঐ স্ত্রীর বাপের কাছ থেকে। মরবার আগে সে আমাকে প্রক্রিয়াটি শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। সেইটি তোমাকে আমি শিখিয়ে দিয়ে যাব, কিন্তু তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যতদিন আমরা বেঁচে থাকব আমাদের দেখাশোনা তুমি করবে। আমাদের মৃত্যুর পর অবশ্য তুমি হবে সব কিছুর মালিক।

পুরন্দর জবাবে বললেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের দেখব। তুমি আমাকে বিশেষ ওই মাদক দ্রব্য তৈরীর প্রক্রিয়া শিখিয়ে না দিলেও তোমাদের আমি দেখতাম এবং দেখবও।

আমি জানি পুরন্দর। তোমাকে আমি চিনতে পেরেছি বলেই তোমাকে আমার ঘরে এনে আমি স্থান দিয়েছি, হ্যাঁ শোন, যে মাদক দ্রব্যটির কথা বলছিলাম তারই নাম সিংগাপুরী মুক্তা। কয়েক প্রকার বুনো গাছের ছাল, শিকড়, আফিং ও সর্পবিষ দিয়ে তৈরী করতে হয় সেই বিশেষ আশ্চর্য মাদক দ্রব্যটি। এবং পরে জিলাটিন দিয়ে কোটিং দিয়ে তাকে মুক্তার আকার দিই।

॥ ১৭ ॥

পুরন্দর চৌধুরী বলতে লাগলেন, লিং সিংয়ের মৃত্যুর পর সেই মাদক দ্রব্য বেচে আমি অর্থোপার্জন করতে লাগলাম।

ঐভাবে ব্যবসা করতে করতে একদিন আমার মনে হল, শুধু ঐভাবে

সিংগাপুরে বসে কেন, আমি তো মধ্যে মধ্যে কলকাতা এসেও ঐ মাদক দ্রব্যের ব্যবসা করতে পারি। তাতে করে আমার আয় আরও বেড়ে যাবে। এলাম কলকাতা। কলকাতায় এসেই কয়েকটি শাঁসালো পুরাতন বন্ধুকে খুঁজে খুঁজে বের করলাম। যাদের অর্থ আছে, শখ আছে। ঠিক সেই সময় একদিন মার্কেটে বিনয়েন্দ্রর সঙ্গে বহুকাল পরে আমার দেখা হল।

বহুদিন পরে দুই পুরোন দিনের বন্ধুর দেখা। সে আমায় তার এই বাড়িতে টেনে নিয়ে এলো। দেখলাম বিনয়েন্দ্র প্রভূত অর্থের মালিক হয়েছে তার মাতামহের দৌলতে। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হল, এই বিনয়েন্দ্রকে যদি আমি গাঁথতে পারি তো বেশ মোটা টাকা উপার্জ্জন করতে পারব। বিনয়েন্দ্র দিবারাত্রই বলতে গেলে তার গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত। এবং প্রচুর পরিশ্রম করতে হয় বলে রাত্রে শয়নের পূর্বে সে সামান্য একটু ড্রিঙ্ক করত। তাকে বোঝালাম, নেশাই যদি করতে হয় তো লিকার কেন। লিকার বড় বদ নেশা ক্রমে ক্রমে লিভারটি একেবারে নষ্ট করে ফেলবে। বিনয়েন্দ্র তাতে জবাব দিল, কি করি ভাই বল। শুধু যে পরিশ্রমের জন্যই আমি ড্রিঙ্ক করি তা নয়। যতক্ষণ নিজের গবেষণা ও পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকি, বেশ থাকি। কিন্তু নির্জন অবসর মুহূর্তগুলি যেন কাটতেই চায় না। নিজের এমন একাকীত্ব যেন জগদ্দল পাথরের মত আমাকে চেপে ধরে। আপন জন থেকেও আমার কেউ নেই। জীবনে বিয়ে-থা করি নি, একদিন যারা ছিল আমার আপনার, যাদের ভালবেসে, যাদের নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলাম, যাদের আঁকড়ে ধরে ভেবেছিলাম এ জীবনটা কাটিয়ে দেব, তারাও আজ আমাকে ভুল বুঝে দূরে সরে গিয়েছে। দেখা করা তো দূরে থাক, একটা খোঁজ পর্যন্ত তারা আমার নেয় না, বেঁচে আছি কি মরে গেছি। এও একপক্ষে আমার ভাগ্যের নির্মম পরিহাস ছাড়া কিছুই নয়। না হলে দাদামশাই বা তাঁর উইলটা বিচিত্র করে যাবেন কেন! আর করেই যদি গেলেন তো তারাই বা আমাকে ভুল বুঝে দূরে সরে যাবে কেন! আমাকে অনাত্মীয়ের মত ত্যাগ করবে কেন! অথচ তারা ছাড়া তো আমার এ সংসারে আপনার জনও আর কেউ নেই। আমার মৃত্যুর পর তারাই তো সব কিছু পাবে। সবই হবে, অথচ আমি যতদিন বেঁচে থাকব তারা আমার কাছেও আসবে না। এই সব নানা কারণেই ড্রিঙ্ক করে আমি ভুলে থাকি অবসর সময়টা। আমি তখন তাকে বললাম, বেশ তো. ঐ লিকার ছাড়া ভুলে থাকবার আরও পথ আছে। তখন আমিই নিজের তাগিদে তাকে সিংগাপুরী মুক্তার সঙ্গে পরিচয়

করালাম। প্রথমটায় অনিচ্ছার সঙ্গেই সে আমার প্রস্তাবে ঠিক রাজী নয়, তবে নিমরাজী হয়েছিল। পরে হল সে ক্রমে ক্রমে আমার ক্রীতদাস। সম্পূর্ণ আমার মুঠোর মধ্যে সে এল। ধীরে ধীরে তাকে গ্রাস করতে শুরু করলাম। কলকাতার তিনখানা বাড়ি তো গেলই—নগদ টাকাতেও টান পড়ল তার।

মিঃ বসাক পুরন্দর চৌধুরী বর্ণিত কাহিনী শুনে স্তম্ভিত হয়ে যান। লোকটা শুধু শয়তানই নয়, পিশাচ। অবলীলাক্রমে সে তার দুষ্কৃতির নোংরা কাহিনী বর্ণনা করে গেল।

পুরন্দর চৌধুরী তাঁর কাহিনী শেষ করে নিঃশব্দে বসেছিলেন।

ধীরে ধীরে আবার এক সময় মাথাটা তুললেন, অর্থের নেশায় বুঁদ হয়ে অন্যায় ও পাপের মধ্যে বুঝতে পারে নি এতদিন যে, আমার সমস্ত অন্যায়, সমস্ত দুষ্কৃতি একজনের অদৃশ্য জমাখরচের খাতায় সব জমা হয়ে চলেছে। সকল কিছুর হিসাবনিকাশের দিন আমার আসন্ন হয়ে উঠেছে। কড়ায় গণ্ডায় সব—সব আমাকে শোধ দিতে হবে।

কথাগুলো বলতে বলতে শেষের দিকে পুরন্দর চৌধুরীর গলাটা ধরে এল। কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে যেন তিনি বুকের মধ্যের উদ্বেলিত ঝড়টাকে একটু প্রশমিত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

আরও কিছুক্ষণ পরে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন, জন্মের পর জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গেই দুঃখ ও দারিদ্র্য আমার পদে পদে পথ রোধ করেছে। তাই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, ছলে-বলে-কৌশলে যেমন করে হোক অর্থ উপার্জন করতেই হবে। আশ্রয়দাতা লিং সিংয়ের দয়ায় সেই অর্থ যখন আমার হাতে এল, বাংলা দেশে এসে বেলাকে আমি বিবাহ করে সঙ্গে করে সিংগাপুর নিয়ে গেলাম।

বেলা আমার প্রতিবেশী গাঁয়ের এক অত্যন্ত গরীব ব্রাহ্মণের মেয়ে। বেলাকে আমি ভালবাসতাম এবং বেলাও আমাকে ভালবাসত। চিরদিনের মত শেষবার গ্রামে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে যখন চলে আসি, তাকে বলে এসেছিলাম, যদি কোনদিন ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে ফেলতে পারি এবং তখনও সে যদি আমার জন্য অপেক্ষা করে তো ফিরে এসে তাকে আমি তখন বিয়ে করব।

কলকাতা ছাড়বার চার বছর পরে ভাগ্য যখন ফিরল বেলার বাবাকে

একটি চিঠি দিলাম। চিঠির জবাবে জানলাম, বেলার বাপ মারা গেছে, বেলা তখন তার এক দূর-সম্পর্কীয় কাকার সংসারে দাসীবৃত্তি করে দিন কাটাচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে এলাম কলকাতায় ও গ্রামে গিয়ে বেলাকে বিবাহ করলাম।

জীবন আমার আনন্দে ভরে উঠল।

দু'বছর বাদে আমাদের খোকা হল। সুখের পিয়ালা কানায় কানায় ভরে উঠল।

ভেবেছিলাম, এমনি করেই বুঝি আনন্দ আর সৌভাগ্যের মধ্যে বাকি জীবনটা আমার কেটে যাবে।

বেলা কিন্তু মধ্যে মধ্যে আমাকে বলতো, ওই মাদক দ্রব্যের ব্যবসা ছেড়ে দিতে। কিন্তু দুষ্কৃতির নেশা তখন মদের নেশার মতই আমার দেহের কোষে কোষে ছড়িয়ে গিয়েছে। তা থেকে তখন আর মুক্তি কোথায়! তাছাড়া পাপের দণ্ড। কতকজনকে হৃতসর্বস্ব করেছি, কতকজনকে জোঁকের মত শুষে শুষে রক্তশূন্য করে তিলে তিলে চরম সর্বনাশের মধ্যে ঠেলে দিয়েছি, তার ফল ভোগ করতে হবে না!

আবার একটু থেমে যেন নিজেকে একটু সামলে নিয়ে পুরন্দর বলতে লাগলেন, পূর্বেই আপনাকে বলেছি ইনস্পেক্টার, ওই সিংগাপুরী মুক্তা তৈরী করবার জন্য সর্পবিষ বা স্নেক-ভেনমের প্রয়োজন হতো। সেই কারণে জ্যান্ত সাপই খাঁচায় রেখে দিতাম।

সাপের বিষ-থলি থেকে বিষ সংগ্রহ করতাম। সিংগাপুরে ভাল বিষাক্ত সাপ তেমন মিলত না বলে জাভা, স্থমাত্রা ও বোর্ণিয়োর জঙ্গল থেকে বিষধর সব সাপ একজন চীনা মধ্যে মধ্যে ধরে এনে আমার কাছে বিক্রী করে যেত। সেবারে সে একটা প্রকাণ্ড গোখরো সাপ দিয়ে গেল। অত বড় জাতের গোখরো ইতিপূর্বে আমি বড় একটা দেখি নি। খাঁচার মধ্যে সাপটার সে কি গর্জন। মনে হচ্ছিল ছোবল দিয়ে দিয়ে খাঁচাটা বুঝি ভেঙেই ফেলবে।

চীনাটা বারবার আমাকে সতর্ক করে গিয়েছিল যে সাপটা একটু নিস্তেজ না হওয়ার আগে যেন তার বিষ সংগ্রহের আমি চেষ্টা না করি।

উপরের তলার একটা ছোট ঘরে সিংগাপুরী মুক্তা তৈরীর সব মালমশলা ও সাপের খাঁচাগুলো থাকত। সাধারণতঃ সে ঘরটা সর্বদা তালা দেওয়াই থাকতো।

যে দিনকার কথা বলছি সে দিন কি কাজে সেই ঘরে ঢুকছি এমন সময়

একজন খরিদ্দার আসায় তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেছি এবং তাড়াহুড়ায় সেই ঘরের তালাটা বন্ধ করতে ভুলে গেছি। খরিদ্দারটি আমার অনেক দিনকার জানাশোনা। সে মধ্যে মধ্যে এসে অনেক টাকার মুক্তা নিয়ে যেত। সে বললে, এখুনি তার সঙ্গে যেতে হবে একটা হোটেলে। একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাকে আলাপ করিয়ে দেবে, যে লোকটি আমার সঙ্গে মুক্তোর কারবার করতে চায়। গাড়ি নিয়েই এসেছিল খরিদ্দারটি। আমার স্ত্রী রান্নাঘরে ছিল, তাকে বলে খরিদ্দারটির সঙ্গে বের হয়ে গেলাম।

বের হবার সময়ও ভুলে গেলাম যে সেই ঘরটায় তালা দিতে হবে। ফিরতে প্রায় ঘণ্টা দুই দেরী হয়ে গেল। যে কাজে গিয়েছিলাম তাতে সফল হয়ে পকেট ভর্তি নোট নিয়ে বাড়ি ফেরবার পথে ভাবতে ভাবতে আসছিলাম, এবারে আর মাসকয়েক কারবার করে স্ত্রীপুত্রকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসব এবং কারবার একেবারে গুটিয়ে ফেলব। কিছুদিন থেকেই বেলা বলছিল কলকাতায় ফিরে যাবার জন্য। এখানে তার কোন সঙ্গী সাথী ছিল না, একা একা। তার দিন যে খুব কষ্টে কাটে তা বুঝতে পারছিলাম।

বাড়িতে ঢুকেই উচ্চকণ্ঠে ডাকলাম, বেলা! বেলা!

কিন্তু বেলার কোন সাড়া পাওয়া গেল না। বাচ্চা চাকরটা আমার ডাক শুনে উপর থেকে ছুটতে ছুটতে এসে বললে, সর্বনাশ হয়ে গেছে! দেখবেন চলুন।

সে বেচারীও কিছু জানত না। বেলা তাকে কি কিনতে যেন বাজারে পাঠিয়েছিল, সে আমার মিনিট পনের আগে মাত্র ফিরেছে।

চাকরটার সঙ্গে ছুটতে ছুটতে উপরে গেলাম।

কি থেকে কী ভাবে দুর্ঘটনা ঘটেছিল সে-ও জানে না, আমিও আজ পর্যন্ত জানি না।

তবে যে ঘরে সাপগুলো থাকত সে-ঘরে ঢুকে দেখি, বেলা আর খোকন মেঝেতে মরে পড়ে আছে।

সর্বাঙ্গ তাদের নীল হয়ে গেছে। আর নতুন কেনা গোখরো সাপটা যে খাঁচার মধ্যে ছিল, সেটা মেঝেতে উল্টে পড়ে আছে এবং সেই সাপটা ঘরের মধ্যে কোথাও নেই।

কয়েকটা মুহূর্ত আমার কণ্ঠ দিয়ে কোন শব্দ বের হল না।

ঘটনার আকস্মিকতায় ও আতঙ্কে আমি যেন একদম বোবা হয়ে গিয়েছিলাম।

কাঁদবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কাঁদতে পারলাম না।

সমস্ত জীবনটাই এক মুহূর্তে আমার কাছে মিথ্যে হয়ে গেল। সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চাওয়া-পাওয়ার যেন একেবারে শেষ হয়ে গেল। গত সাত বছর ধরে এই যে তিলে তিলে অর্থ সংগ্রহ করে ভাগ্যকে জয় করবার দুস্তর প্রচেষ্টা সব—সব যেন মনে হল শেষ হয়ে গেছে।

বেলাকে স্ত্রীরূপে পেয়ে জীবন আমার ভরে গিয়েছিল। জীবনে খোকন এনেছিল এক অনাস্বাদিত আনন্দ, এক মুহূর্তে ঈশ্বর যেন তাদের দু জনকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমাকে জগতের সর্বাপেক্ষা নিঃস্ব ও রিক্ত করে ভিক্ষুকেরও অধম করে দিয়ে গেলেন। সমস্ত দিন সেই দুটি বিষ-জর্জরিত নীল মৃতদেহকে সামনে নিয়ে হতবাক্, মুহ্যমানের মত বসে রইলাম।

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল।

ছোক্‌রা চাকরটাও বোধ হয় কেমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। উপরের সিঁড়িতে রেলিং-এর গায়ে হেলান দিয়ে বসে থাকতে থাকতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ধীরে ধীরে মৃতদেহের পাশ থেকে এক সময় উঠে দাঁড়ালাম। অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে বেলা ও খোকনের।

পুলিশ জানতে পারলে ময়না ঘরে টেনে নিয়ে যাবে। নিষ্ঠুরের মত ডাক্তার বেলার ঐ দেহে এবং আমার এত সাধের খোকনের নবনীত ঐ দেহে ছুরি চালাবে। সহ্য করতে পারব না।

তারপর শুধু তাই নয়, ক্রিমেশন গ্রাউণ্ডে নিয়ে গিয়ে তাদের শেষ কাজ করতে হবে। তার জন্যও তো কোন ডাক্তারের সার্টিফিকেট চাই। এবং আরও আছে, জানাজানি হলে ব্যাপারটা পুলিশে আসবে। তখন নানা গোলমালও শুরু হবে। তার চাইতে এই বাড়ির উঠানেই মা ও ছেলেকে মাটির নিচে শুইয়ে রেখে দিই।

আমার জীবনের সবচাইতে দুটি প্রিয়জন আমার বাড়ির মধ্যেই মাটির নিচে শুয়ে থাক। ঘুমিয়ে থাক।

চাকরটাকে জাগিয়ে নিচে নেমে এলাম।

কখন এক সময় বৃষ্টি থেমে গেছে। বর্ষণক্লান্ত আকাশে এখনও এদিক

ওদিক টুকরো টুকরো মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। তারই ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটি তারা উঁকি দিচ্ছে।

চাকরটার সাহায্যে দুজনে মিলে উঠানের এক কোণে যে বড় ইউক্যালিপ্টাস্ গাছটা ছিল তার নিচে পাশাপাশি দুটি গর্ত খুঁড়লাম। তারপর সেই গর্তের মধ্যে পাশাপাশি শুইয়ে দিলাম বেলা আর খোকনকে।

মাটি চাপা দিয়ে গর্ত দুটো যখন ভরাট হয়ে গেল, তখন রাত্রি-শেষের আকাশ ফিকে আলোয় আসন্ন প্রভাতের ইঙ্গিত জানাচ্ছে।

তারপর সাতটা দিন সাতটা রাত কোথা দিয়ে কেমন করে যে কেটে গেল বুঝতেও পারলাম না।

সমস্ত জীবনটাই যেন মিথ্যা হয়ে গেছে।

কিছুই আর ভাল লাগে না।

আর কি হবে এই দূর দেশে একা একা পড়ে থেকে। ব্যবসা-পত্র সব বন্ধ করে দিয়েছি।

মাঝে মাঝে খরিদ্দার এলে তাদের ফিরিয়ে দিই।

দোকান সর্বদা বন্ধই থাকে।

মনের যখন এই রকম অবস্থা, উত্তরপাড়া থেকে বিনয়েন্দ্রর চিঠি পেলাম। জরুরী চিঠি চলে আসবার জন্য।

পরের দিনই প্লেনে একটা সীট পেয়ে গেলাম। রওনা হয়ে পড়লাম। মনে মনে ঠিক করলাম, এখানে এসে একটা ব্যবস্থা করে দু'চার দিনের মধ্যেই আবার সিংগাপুর ফিরে সেখানকার সব কাজ কারবার বন্ধ করে চিরদিনের মত এখানে চলে আসব।

কিন্তু হায়! তখন কি জানতাম যে, এখানে এসে এবাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই এই দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে যাব!

এই পর্যন্ত বলে পুরন্দর চৌধুরী যেন একটা বড় রকমের দীর্ঘশ্বাস কোনমতে রোধ করলেন।

॥ ১৮ ॥

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আবার এক সময় পুরন্দর চৌধুরী বললেন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারছি না ইনস্‌পেক্টার, সত্যি কথা বলতে কি, এ দুর্ঘটনা কি করে ঘটল। আপনি বলছেন, বিনয়েন্দ্রকে কেউ হত্যা করেছে।

কিন্তু আমি তো বুঝেই উঠতে পারছি না বিনয়েন্দ্রকে কেউ হত্যা করতে পারে। এ যেন কেমন অবিশ্বাস্য বলে এখনও আমার মনে হচ্ছে।

কেন বলুন তো? ইনস্পেক্টার প্রশ্ন করলেন।

প্রথমতঃ বিনয়েন্দ্রকে আমি খুব ভাল করেই জানতাম। ইদানীং বিনয়েন্দ্র আমার প্ররোচনায় মুক্তার নেশায় জড়িয়ে পড়েছিল সত্য, কিন্তু ওই একটি মাত্র নেশার বদ অভ্যাস ছাড়া তার চরিত্রে আর কোন দোষই তো ছিল না। মিতভাষী, সংযমী, স্নেহপ্রবণ, সমঝদার এবং যথেষ্ট বুদ্ধিমান লোক ছিল সে। এবং যতদূর জানি, তার কোন শত্রুও এ দুনিয়ায় কেউ ছিল বলে তো মনে হয় না। তার জীবনের অনেক গোপন কথাও আমার অজানা নয়—তবু বলব, তাকে কেউ হত্যা করতে পারে এ যেন সম্পূর্ণ-ই অবিশ্বাস্য।

আচ্ছা পুরন্দরবাবু, ইনস্পেক্টার প্রশ্ন করলেন, এ বাড়ির পুরাতন ভৃত্য রামচরণের মুখে যে বিশেষ একটি মহিলার কথা শুনলাম, তার সম্পর্কে কোন কিছু আপনি বলতে পারেন?

কি আপনি ঠিক জানতে চাইছেন ইনস্পেক্টার?

কথাটা আমার কি খুব অস্পষ্ট বলে বোধ হচ্ছে পুরন্দরবাবু?

মিঃ বসাকের কথায় কিছুক্ষণ পুরন্দর চৌধুরী তাঁর মুখের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলেন। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললেন, না ইনস্পেক্টার।

আপনি যা সন্দেহ করছেন বিনয়েন্দ্রর সে রকম কোন দুর্বলতাই ছিল না।

প্রত্যুত্তরে এবারে ইনস্পেক্টার আর কোন কথা বললেন না, কেবল মৃদু একটা হাসি তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে জেগে উঠল।

পুরন্দর চৌধুরীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না ইনস্পেক্টারের ওষ্ঠপ্রান্তের ক্ষীণহাসির আভাসটা।

তিনি বললেন, আপনি বোধ হয় আমার কথাটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারলেন না ইনস্পেক্টার। কিন্তু সত্যিই আমি বলছি দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব আমাদের। তাকে আমি খুব ভালভাবেই জানতাম। স্ত্রীলোকের ব্যাপারে তার, সত্যি বলছি, কোন প্রকার দুর্বলতাই ছিল না।

এবারে মৃদু কণ্ঠে বসাক বললেন, তবু আপনার কথা আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারলাম না পুরন্দরবাবু।

কেন বলুন তো?

নেশার কাছে যে মানুষ নিজেকে বিক্রি করতে পারে তার মধ্যে আর যে গুণই থাক না কেন, নারীর প্রতি তার দুর্বলতা কখনও জাগবে না এ যেন

বিশ্বাস করতেই মন চায় না। কিন্তু যাক সে কথা। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম, সেই মিষ্টিরিয়াস স্ত্রীলোকটি সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন কিনা।

খুব বেশি জানবার অবকাশও আমার হয় নি। কারণ বেশিক্ষণ তাকে দেখবার আমার অবকাশও হয় নি এবং তার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগও আমি পাই নি।

আপনি তাকে এবাড়িতে দেখেছিলেন তাহলে ?

হ্যাঁ।

কবে ?

মাসদেড়েক আগে বিশেষ একটা কাজে কয়েক ঘণ্টার জন্য আমাকে কলকাতায় আসতে হয় সেই সময়।

তাহলে মাসদেড়েক আগে আপনি আর একবার কলকাতায় এসেছিলেন এর আগে ?

হ্যাঁ।

তারপর ?

সেই সময় রাত, বোধ করি, তখন দশটা হবে। বিনয়েন্দ্রর সঙ্গে এখানে দেখা করতে আসি।

অত রাত্রে এসেছিলেন যে ?

পরের দিনই ভোরের প্লেনে চলে যাব, তাছাড়া সমস্ত দিনটাই কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তাই রাত্রে ছাড়া সময় করে উঠতে পারি নি।

আচ্ছা, আপনি যে সে দিন রাত্রে এসেছিলেন এবাড়িতে রামচরণ জানত ?

হ্যাঁ। জানে বৈকি। সে-ই তো আমার আসার সংবাদ বিনয়েন্দ্রকে দেয় রাত্রে।

যাক। তারপর বলুন।

বিনয়েন্দ্র আমাকে এই ঘরেই ডেকে পাঠায়। ইদানীং বৎসর খানেক ধরে বিনয়েন্দ্র একটা বিশেষ কি গবেষণা নিয়ে সর্বদাই ব্যস্ত থাকত, কিন্তু ঘরে ঢুকে দেখলাম—

এই পর্যন্ত বলে পুরন্দর চৌধুরী যেন একটু ইতস্ততঃ করতে লাগলেন।

বলুন। থামলেন কেন ?

এই ঘরে ঢুকে দেখলাম ঘরের এক কোণে একটা আরাম কেদারার

উপর বিনয়েন্দ্র গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে পড়ে আছে। আর একটি ২৩।২৪ বছরের তরুণী অ্যাপ্রন গায়ে ঐ টেবিলটার সামনে দাঁড়িয়ে কী যেন একটা এক্সপেরিমেণ্ট করছেন হাতে একটা তরল পদার্থপূর্ণ টেষ্ট টিউব নিয়ে। আমার প্রবেশ ও পদশব্দ পেয়েও বিনয়েন্দ্র কোন সাড়া না দেওয়ায় আমিই তার সামনে এগিয়ে গেলাম। ডাকলাম, বিনু!

কে? ও, পুরন্দর। এসো। তারপর কী সংবাদ? বলে অদূরে কার্যরত তরুণীকে সম্বোধন করে বললে, লতা, সলুশনটা হল?

সম্বোধিতা তরুণী বিনয়েন্দ্রর ডাকে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, না। এখনও সেডিমেণ্ট পড়ছে।

কথাটা বলে তরুণী আবার নিজের কাজে মনঃসংযোগ করলেন।

বসো পুরন্দর। দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বিনয়েন্দ্র বললে।

ঘরের মধ্যে উজ্জ্বল আলো জ্বলছিল। সেই আলোয় বিনয়েন্দ্রর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম।

চোখ দুটো বোজা। সমস্ত মুখখানিতে যেন একটা ক্লান্ত অবসন্নতা। চোখ খুলে যেন তাকাতেও তার কষ্ট হচ্ছে।

বুঝতে আমার দেরী হল না, আমারই জোগান দেওয়া সিংহলী মুক্তার নেশায় আপাততঃ বিনয়েন্দ্র বুঁদ হয়ে আছে।

শুধু তাই নয়, মাস চারেক আগে শেষবার যে বিনয়েন্দ্রকে আমি দেখেছিলাম এ যেন সে বিনয়েন্দ্র নয়। তার সঙ্গে এর প্রচুর প্রভেদ আছে।

আরো একটু কৃশ, আরো একটু কালো হয়েছে সে। চোখের কোলে একটা কালো দাগ গভীর হয়ে বসেছে। কপালের দুপাশে শিরাগুলো একটু যেন স্ফীত। নাকটা যেন আরও একটু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কেন জানি না ঠিক ঐ মুহূর্তে বিনয়েন্দ্রকে দেখে আনন্দ হওয়ার চাইতে মনে আমার একটু যেন দুঃখই হল।

বুঝলাম, পুরোপুরি ভাবেই আজ বিনয়েন্দ্র নেশার কবলিত। এর আগে দেখেছি, সে রাত বারটা সাড়ে বারটার পর শুতে যাবার পূর্বে সাধারণতঃ নেশা করত কিন্তু এখন দেখছি সে সময়ের নিয়ম-পালন বা মর্যাদা আর অক্ষুণ্ণ নেই। এতদিন নেশা ছিল তার সময়বাঁধা, ইচ্ছাধীন। এখন সেই হয়েছে নেশার ইচ্ছাধীন। নেশার গ্রাসে সে আজ কবলিত।

বিনয়েন্দ্র আমাকে বসতে বললে বটে, কিন্তু তার তখন আলোচনা কিছু করবার বা কথা বলবার মত অবস্থা নয়।

কিছুক্ষণ বসে থেকে আবার ডাকলাম, বিনু!

অ্যাঁ? অতি কষ্টে যেন চোখ মেলে তাকাল বিনয়েন্দ্র। তারপর বললে, তুমি তো রাতটা আছ। খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নাও। কাল সকালে শুনব তোমার কথা।

বললাম, না, রাত্রে আমি থাকব না। এখুনি চলে যাব।

ও, চলে যাবে। যাও—এবারে কিছু বেশী করে পার্লস পাঠিয়ে দিও তো, একটা দুটোয় আজকাল আর শানাচ্ছে না হে।

বিনয়েন্দ্রর কথায় চমকে উঠলাম। এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ফিরে তাকালাম অদূরে দণ্ডায়মান সেই তরুণীর দিকে।

তরুণীর দিকে তাকাতেই স্পষ্ট দেখলাম, সে যেন আমাদের দিকেই তাকিয়ে ছিল, অন্যদিকে মুখটা ঘুরিয়ে নিল। সে যে আমাদের কথাবার্তা শুনছিল বুঝতে আমার কষ্ট হল না।

নেশার ঘোরে আবার হয়তো বেফাঁস কি বলে বসবে বিনয়েন্দ্র, তাই আর দেরি না করে ফিরে আসবার জন্য চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই বিনয়েন্দ্র আবার চোখ মেলে তাকিয়ে বললে, চললে নাকি পুরন্দর?

হ্যাঁ। ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখেছি। তাছাড়া কাল খুব ভোরে আমার প্লেন ছাড়ছে।

তা যাও। তবে বলছিলাম—

কী?

দামটা কিছু কমাও না। একেবারে যে চীনে জোঁকের মত শুষে নিচ্ছ। এমন বেকায়দায় তুমি ফেলবে জানলে কোন্ আহাম্মক তোমার ঐ ফাঁদে পা দিত!

ছেড়ে দিলেই তো পার। কথাটা কেমন যেন আমার আপনা থেকেই মুখ দিয়ে হঠাৎ বের হয়ে গেল।

কি বললে! ছেড়ে দেব? হ্যাঁ, এইবার খাঁটি ব্যবসাদারী কথা বলেছ। কি করব, অনেক চেষ্টা করলাম কিন্তু কিছুতেই নেশাটা ছাড়তে পারলাম না। নইলে দেখিয়ে দিতাম তোমায়।

বিনয়েন্দ্রর কথায় দুঃখও হল, হাসিও পেল।

কিন্তু বুঝতে পারছিলাম ঘরের মধ্যে উপস্থিত ঐ মুহূর্তে তৃতীয় ব্যক্তিটি আর যাই করুক, কাজের ভান করলেও তার সমস্ত শ্রবণেন্দ্রিয় প্রখর করে আমাদের উভয়ের কথাগুলো শুনছে।

তাড়াতাড়ি তাই কথা আর না বাড়তে দিয়ে দরজার দিকে অগ্রসর হলাম।

দরজা বরাবর এসে কি জানি কেন নিজের কৌতূহলকে আর দাবিয়ে রাখতে পারলাম না। ফিরে তাকালাম।

সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম এক জোড়া শাণিত ছুরির ফলার মত দৃষ্টি আমার দিকে নিবদ্ধ। দরজা খুলে বের হয়ে এলাম, কিন্তু মনে হতে লাগল, সেই শাণিত ছুরির ফলার মত চোখের দৃষ্টিটা যেন আমার পিছনে পিছনে আসছে।

কথাগুলো একটানা বলে পুরন্দর চৌধুরী থামলেন।

তারপর?

তারপর? আবার বলতে শুরু করলেন, সেই কয়েক মুহূর্তের জন্য তাকে দেখেছিলাম। আর দেখি নি। এবং ঐ কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখাই। পরিচয় হয় নি। এবং পরিচয়ের অবকাশও ঘটে নি। তারপর তো এবারে এসে শুনলাম, কিছুদিন আগে হঠাৎ তিনি কাউকে কিছু না জানিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছেন।

এবারে ইনস্‌পেক্টার কথা বললেন, যাক্। তবু সেই মিষ্টিরিয়াস ভদ্রমহিলাটির নামের একটা হদিস পাওয়া গেল। আর একটা কথা মিঃ চৌধুরী?

বলুন।

এতরাত্রে আপনি এ ঘরে এসেছিলেন কেন চোরের মত গোপনে, সন্তর্পণে?

সবই যখন আপনাকে বলেছি সেটুকু বলবারও আমার আর আপত্তি থাকবার কি থাকতে পারে ইনস্‌পেক্টার। বুঝতেই হয়তো পারছেন, আমি এসেছিলাম সেই সিংহলী মুক্তা যদি এখনও কিছু অবশিষ্ট পড়ে থাকে তো সেগুলো গোপনে সরিয়ে ফেলবার জন্য। কারণ মাত্র দিন কুড়ি আগে একটা পার্সেল ডাকযোগে আমি পাঠিয়েছিলাম। ঠিক আমার স্ত্রী ও পুত্র যেদিন সর্পাঘাতে মারা যায় তারই আগের দিন সকালবেলা।

পুরন্দর চৌধুরীর কথা শুনে ইনস্‌পেক্টার কয়েকটা মুহূর্ত আবার ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর মৃদু কণ্ঠে বললেন, কিন্তু আপনার মুখেই একটু আগে শুনেছি মিঃ চৌধুরী, সেগুলো এমনি হঠাৎ দেখলে কারও পক্ষেই সাধারণ বড় আকারের মুক্তা ছাড়া অন্য কিছুই ভাবা সম্ভব

নয়; তবে আপনি সেগুলো সরাবার জন্য এত ব্যস্ত হয়েছিলেন কেন? আর এ ঘরেই যে সেগুলো পাবেন তাই বা আপনি ভাবলেন কি করে?

এ তো খুব স্বাভাবিক ইন্‌সপেক্টার। এই ল্যাবোরেটারী ঘরের মধ্যেই তার বেশির ভাগ সময় দিন ও রাত্রি কাটত। তাছাড়া এই ঘরে আলমারিতে তার গবেষণার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নানা প্রকার ঔষধপত্র থাকত, সেদিক দিয়ে সেগুলো এখানে রাখাই তো স্বাভাবিক।

হুঁ। একেবারে অসম্ভব নয়।

আর তাছাড়া হঠাৎ ঔষধপত্রের মধ্যে ঐ মুক্তা জাতীয় বস্তুগুলো কেউ দেখতে পেলে পুলিশের পক্ষে সন্দেহ জাগাও কি স্বাভাবিক নয়?

পুরন্দর চৌধুরীর যুক্তিটা খুব ধারালো না হলেও ইনস্‌পেক্টার আর কোন তর্কের মধ্যে গেলেন না। ইতিমধ্যে রাত্রিও প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল।

খোলা জানালা পথে অন্ধকারমুক্ত আকাশের গায়ে আলো একটু একটু করে তখন ফুটে উঠছে।

ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিয়ে দুজনে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন।

বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই ঝিরঝিরে প্রথম ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া জাগরণক্লান্ত চোখে-মুখে যেন স্নিগ্ধ চন্দন স্পর্শের মত মনে হল ইনস্‌পেক্টারের।

ক্ষণপূর্বে শোনা পুরন্দর চৌধুরীর বিচিত্র কাহিনীটা তখনও তাঁর মস্তিষ্কের মধ্যে পাক খেয়ে খেয়ে ফিরছে। সত্য হোক বা মিথ্যা হোক, সত্যিই পুরন্দর চৌধুরীর কাহিনী বিচিত্র।

বাড়ির কেউ হয়তো এখনও জাগে নি। সকলেই যে যার শয্যায় ঘুমিয়ে।

পুরন্দর চৌধুরীকে সত্যিই বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। তিনি ইনস্‌পেক্টারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধীর মন্থর পদে তাঁর নির্দিষ্ট ঘরের দিকে চলে গেলেন।

রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি মাথার মধ্যে তখনও যেন কেমন দপ্ দপ্ করছে। একাকী দোতলার বারান্দায় পায়চারি করতে করতে ইনস্‌পেক্টার আগাগোড়া সমগ্র ঘটনাটা যেন পুনরায় ভাববার চেষ্টা করতে লাগলেন। এবং তখনও সেই চিন্তার সবটুকু জুড়েই যেন পুরন্দর চৌধুরীর বর্ণিত কাহিনীটাই আনাগোনা করতে থাকে।

বিনয়েন্দ্র রায়ের হত্যার ব্যাপারটা মিঃ বসাক যতটা সহজ ভেবেছিলেন, এখন যেন ক্রমেই মনে হচ্ছে ততটা সহজ নয়। রীতিমত জটিল।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ে কেটে যাচ্ছিল দিন, অবিবাহিত বিনয়েন্দ্রর এবং একটিমাত্র রহস্যময়ী নারীর মাস দুয়েকের সংস্পর্শ ব্যতীত অন্য কোন নারীঘটিত ব্যাপারের কোন হদিসই আপাততঃ পাওয়া যাচ্ছে না। এবং সেই রহস্যময়ী নারীটির সঙ্গে তার কতখানি ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল এবং আগে কোন ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল কিনা তারও কোন সঠিক সংবাদ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

বিনয়েন্দ্রর অর্থের অভাব ছিল না।

এবং বিশেষ করে ব্যাচিলর অবস্থায় প্রচুর অর্থ হাতে থাকায় সাধারণতঃ যে দুটি দোষ সংক্রামক ব্যাধির মতই সঙ্গে দেখা দেয় প্রায় সর্বক্ষেত্রেই নারী ও নেশা, তার প্রথমটি সম্পর্কে কোন কিছু এখন পর্যন্ত সঠিক না জানা গেলেও শেষোক্তটি সম্পর্কে জানা যাচ্ছে সে-ব্যাধিটির কবলিত বেশ রীতিমত ভাবেই হয়েছিলেন বিনয়েন্দ্র। এবং সে ব্যাপারের জন্য মূলতঃ দায়ী তারই অন্যতম কলেজ-জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ঐ পুরন্দর চৌধুরী।

পুরন্দর চৌধুরী!

সঙ্গে সঙ্গেই যেন নতুন করে আবার পুরন্দর চৌধুরীর চিন্তাটা মনের মধ্যে জেগে ওঠে ইনস্‌পেক্টারের। লোকটার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, ধূর্ত, সতর্ক এবং প্রচণ্ড সুবিধাবাদী ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ।

প্রথম দিকে ভদ্রলোক একেবারেই মুখ খোলেন নি বা খুলতে চান নি।

অতর্কিতে ল্যাব্রোটারী ঘরে রাত্রের অভিসারে ধরা পড়ে গিয়েই তবে মুখ খুলেছেন। এবং শুধু মুখ খোলাই নয়, বিচিত্র এক কাহিনীও শুনিয়েছেন।

লোকটা কিন্তু তথাপি এত সহজ বা সরল মনে হচ্ছে না ইনস্‌পেক্টারের।

সহসা এমন সময় ইনস্‌পেক্টারের চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে গেল সিঁড়িতে একটা দ্রুত স্খলিত পদশব্দ শুনে। কে যেন সিঁড়িপথে উঠে আসছে।

ফিরে তাকালেন ইনস্‌পেক্টার সিঁড়ির দিকে।

॥ ১৯ ॥

যে ব্যক্তিটি সিঁড়ি দিয়ে উঠে ভোরের আলোয় তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল সে আর কেউ নয় ঐ বাড়িরই একজন ভৃত্য রেবতী।

রেবতীর চোখে মুখে একটা স্পষ্ট ব্যস্ততা ও আতঙ্ক।

রেবতীই কথা বললে প্রথম উত্তেজিত কণ্ঠে, ইনস্‌পেক্টার সাহেব, রামচরণ বোধ হয় মারা গেছে।

কথাটা শুনেই মিঃ বসাক রীতিমত যেন চম্‌কে ওঠেন। তাঁর বিস্মিত কণ্ঠ হতে আপনা হতেই যেন কথাগুলো বের হয়ে এল, মারা গেছে রামচরণ! সে কি!

হ্যাঁ। আপনি একবার শীগগিরই নিচে চলুন।

চল্‌ তো দেখি।

কোনরূপ সময়ক্ষেপ না করে রেবতীর পিছু পিছু সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন ইনস্‌পেক্টার। একতলার একেবারে দক্ষিণ প্রান্তের শেষ ঘরটির দরজাটা তখনও খোলাই ছিল।

রেবতীই প্রথমে গিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল খোলা দরজাপথে।

মিঃ বসাক তার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন।

ঘরের আলোটা তখনও জ্বলছে। যদিও পশ্চাতের বাগানের দিককার খোলা জানালা পথে ভোরের পর্যাপ্ত আলো ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করেছে।

ভোরের সেই স্পষ্ট আলোয় যে দৃশ্যটি ইনস্‌পেক্টারের চোখে পড়ল ঘরে প্রবেশ করেই, তা যেমন বীভৎস তেমনি করুণ।

জানালার প্রায় লাগোয়া একটা চৌকির উপরে রামচরণের দেহটা চিত হয়ে পড়ে আছে।

মুখটা দরজার দিকেও একটু কাত হয়ে আছে।

চোখের পাতা খোলা, চোখের মণি দুটো যেন ঠেলে বের হয়ে এসেছে।

মুখটা ঈষৎ হাঁ হয়ে আছে। এবং সেই দ্বিধাবিভক্ত, হাঁ করা ওষ্ঠের প্রান্ত বেয়ে নেমে এসেছে লালামিশ্রিত ক্ষীণ একটা রক্তের ধারা।

সমস্ত মুখখানা যেন নীল হয়ে আছে। খালি গা, পরিধানে একটি পরিষ্কার ধুতি, প্রসারিত দুটি বাহু শয্যার উপরে মুষ্টিবদ্ধ।

প্রথম দর্শনেই বোঝা যায় সে দেহে প্রাণ নেই।

কয়েকটা মুহূর্ত সেই বীভৎস দৃশ্যের সামনে নির্বাক স্থাণুর মতই দাঁড়িয়ে রইলেন মিঃ বসাক।

এ যেন সেই গতকাল সকালের বীভৎস করুণ দৃশ্যেরই হুবহু পুনরাবৃত্তি।

আশ্চর্য, চব্বিশ ঘণ্টাও গেল না প্রথম বাড়ির মালিক তারপর বাড়ির পুরাতন ভৃত্য সম্ভবতঃ একই ভাবে নিষ্ঠুর হত্যার কবলিত হল।

কে জানত গতকাল রাত্রে এগারটার সময় সকলকে খাইয়ে দাইয়ে যে লোকটা সকলের শয়নের ব্যবস্থা পর্যন্ত করে দিয়ে বিদায় নিয়ে এসেছিল তার মৃত্যু এত নিকটে ঘনিয়ে এসেছে।

কে জানত মৃত্যু তার একেবারে ঠিক পশ্চাতে এসে মুখব্যাদান করে দাঁড়িয়েছে! প্রসারিত করেছে তার করাল বাহু!

আকস্মিক ঘটনা পরিস্থিতির বিহ্বলতাটা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন ইনস্‌পেক্টার তাঁর প্রায় পার্শ্বেই দণ্ডায়মান রেবতীর দিকে।

রেবতী, কখন তুমি জানতে পেরেছ এই ব্যাপারটা?

সকালে উঠেই এঘরে ঢুকে।

সকালে উঠেই এঘরে এসেছিলে কেন?

উনুনে আগুন দিয়ে চায়ের ব্যবস্থা করব কিনা জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলাম।

ঘরের দরজাটা খোলাই ছিল?

হ্যাঁ। তবে কপাট দুটো ভেজান ছিল।

রামচরণ কি সাধারণতঃ ঘরের দরজা খুলেই শুত রেবতী?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তুমি কোন ঘরে থাক?

ঠিক এর পাশের ঘরটাতেই।

কাল রাত্রে শেষ কখন তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল রামরচণের, রেবতী?

কত রাত তখন ঠিক আমি বলতে পারব না, আপনাদের খাওয়াদাওয়ার পরই রামচরণ রান্নাঘরে আসে, আমি তখন রান্নাঘর পরিষ্কার করছিলাম। আমাকে ডেকে বললে, তার শরীরটা নাকি তেমন ভাল নয়, আর ক্ষুধাও নেই, সে শুতে যাচ্ছে।

বলেছিল তার শরীরটা ভাল নয়?

হ্যাঁ। অবিশ্যি কথাটা শুনে আমি একটু অবাকই হয়েছিলাম সাহেব।

কেন বল তো?

তা আজ্ঞে, আজ পাঁচ বছর হল এ বাড়িতে আমি আছি, কখনও তো রামচরণকে অসুস্থ হতে দেখি নি। তবে কাল রাত্রে বোধ হয়—

কথাটা সম্পূর্ণ শেষ না করে যেন একটু ইতস্তত করেই থেমে গেল রেবতী।

কাল রাত্রে বোধ হয় কী রেবতী? চুপ করলে কেন?

আজ্ঞে, রামচরণ নেশা করত।

নেশা করত? কতকটা যেন চমকিত ভাবেই ইনস্‌পেক্টার প্রশ্নটা করলেন রেবতীকে। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল সিংহলী মুক্তার কথা।

প্রভু ভৃত্য দু'জনাই কি তবে মুক্তার নেশায় অভ্যস্ত ছিল নাকি!

কি নেশা করত রামচরণ?

আজ্ঞে, রামচরণ আফিং খেত।

আফিং! কথাটা বলে মিঃ বসাক তাকালেন রেবতীর মুখের দিকে।

আজ্ঞে হ্যাঁ। সন্ধ্যার দিকে তাকে রোজ একটা মটরের দানার মত আফিং খেতে দেখতাম। তবে কাল রাত্রে বোধ হয় তার আফিংয়ের মাত্রাটা একটু বেশীই হয়েছিল আমার মনে হয়।

কি করে বুঝলে?

কাল যেন রামচরণের একটু ঝিম্ ঝিম্ ভাব দেখেছি।

ইনস্‌পেক্টার কিছুক্ষণ অতঃপর চুপ করে কি যেন ভাবলেন।

তারপর আবার প্রশ্ন শুরু করলেন, তুমি তো পাশের ঘরেই ছিলে রেবতী, রাত্রে কোন রকম শব্দ বা গোলমাল কিছু শুনেছ?

আজ্ঞে না।

কোন কিছুই শোন নি?

না।

কাল কত রাত্রে শুতে গিয়েছিলে ঘরে?

রামচরণ কথা বলে চলে আসবার পরই খাওয়াদাওয়া সেরে এসে শুয়ে পড়ি।

একটা চাদর দিয়ে রামচরণের মৃতদেহটা ঢেকে রেবতীকে নিয়ে ইনস্‌পেক্টার বসাক ঘর থেকে বের হয়ে এলেন।

দরজাটা বন্ধ করে রেবতীকে বললেন, ঠাকুর আর করালীকে ডেকে নিয়ে তুমি উপরে এস রেবতী।

দোতলায় এসে ইনস্‌পেক্টার দেখলেন মধ্যবয়স্ক একজন ভদ্রলোক দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। উভয়ের চোখাচোখি হল। দোহারা চেহারা হলেও বেশ বলিষ্ঠ গঠন ভদ্রলোকের।

মাথার এক তৃতীয়াংশ জুড়ে বেশ মসৃণ চক্‌চকে একখানি টাক।

মাথার বাকি অংশে যে কেশ তাও বিরল হয়ে এসেছে।

উঁচু খাঁড়ার মত নাক। প্রশস্ত কপাল। ভাঙা গাল, গালের হনু ছুটো যেন ব'য়ের আকারে ঠেলে উঠেছে। গোল গোল চোখ। চোখে কালো মোটা ফ্রেমের সেলুলয়েড়ের চশমা। পুরু লেন্সের ওধার হতে তাকিয়ে আছেন ভদ্রলোক।

উপরের ওষ্ঠ পুরু এক জোড়া গোঁফে প্রায় ঢাকা বললেও অত্যুক্তি হয় না।

নিচের পুরু কালচে বর্ণের ওষ্ঠটা যেন একটু উল্টে আছে। পুরুষ্টু গোঁফের অন্তরাল হতেও দেখা যায় উপরের দাঁতের সারি। উঁচু দাঁত। পরিধানে ধুতি ও গলাবন্ধ মুগার চায়না কোট। পায়ে চকচকে কালো রংয়ের ডার্বি সু।

আপনি? প্রথমেই প্রশ্ন করলেন ইনস্‌পেক্টার।

আমার নাম প্রতুল বোস। এ বাড়ির সরকার। আপনি বোধ হয় পুলিশের কেউ হবেন?

হ্যাঁ। পুলিশ ইনস্‌পেক্টার প্রশান্ত বসাক।

গেটেই পুলিশ প্রহরী মোতায়েন দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। তার মুখেই একটু আগে সব শুনে এলাম, কিন্তু ব্যাপারটা যে কিছুতেই এখনও বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না ইনস্‌পেক্টার। সত্যিই কি বিনয়েন্দ্রবাবুকে কেউ মার্ডার করেছে?

হ্যাঁ। ব্যাপারটা যতই অবিশ্বাস্য হোক, সত্যি। আর শুধু তাই নয় প্রতুলবাবু, গত রাত্রে ইতিমধ্যেই আরও একটি হত্যাকাণ্ড এ বাড়িতে সংঘটিত হয়েছে।

তার মানে! কী আপনি বলছেন ইনস্‌পেক্টার? আবার কাকে কে হত্যা করল কাল রাত্রে এ বাড়িতে!

কে হত্যা করেছে তা জানি না। তবে হত্যা করেছে এ বাড়ির পুরাতন ভৃত্যকে।

কে! রামচরণ!

হ্যাঁ। সে-ই নিহত হয়েছে।

এ সব আপনি কি বলছেন ইনস্‌পেক্টার! বাড়ির চার পাশে পুলিশ প্রহরী, আপনি নিজে উপস্থিত ছিলেন এখানে; এমন দুঃসাহস!

দুঃসাহসই বটে প্রতুলবাবু।

ইনস্‌পেক্টার বসাকের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় দরজা খুলে প্রথমে রজত ও তারপরেই সুজাতা যে-যার নির্দিষ্ট ঘর থেকে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

বসাকের শেষের কথাটা রজতের কানে গিয়েছিল, সে এগিয়ে আসতে আসতে প্রশ্ন করল, কি দুঃসাহসের কথা বলছিলেন ইনস্‌পেক্টার ?

এই যে রজতবাবু! আসুন—কাল রাত্রেও আবার একটি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে এ বাড়িতে।

সে কি! অর্ধস্ফুট আর্ত চিৎকারে কথাটা বলে রজত, আবার! আবার কে নিহত হল ?

রামচরণ।

রামচরণ!

হ্যাঁ।

সুজাতার মুখ দিয়ে কোন কথাই বের হয় না। সে ফ্যাল ফ্যাল করে সদ্য ঘুমভাঙা চোখে বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

এবং হঠাৎ যেন কেমন তার মাথাটা ঘুরে ওঠে। ঢুলে পড়ে যাচ্ছিল সুজাতা, ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গেই ইনস্‌পেক্টার বসাক চকিতে এগিয়ে এসে দু'হাত বাড়িয়ে সুজাতার পতনোন্মুখ দেহটা সযত্নে ধরে ফেললেন।

কী হল! কী হল সুজাতা! সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসে রজতও। সুজাতার দুচোখের পাতা যেন নিমীলিত। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল। ইতিমধ্যে ইনস্‌পেক্টার বসাক পাঁজা-কোলে সুজাতার শিথিল দেহটা প্রায় বুকের উপর তুলে নিয়ে এগিয়ে যান সামনের খোলা দরজাপথে ঘরের মধ্যে।

ঘরের মধ্যে খাটের উপরে পাতা শয্যাটার উপরে এসে সযত্নে ইনস্‌পেক্টার সুজাতার দেহটা শুইয়ে দিলেন।

রজত পাশেই এসে দাঁড়িয়েছিল। তার দিকে তাকিয়ে ইনস্‌পেক্টার বললেন, দেখুন তো ঘরের কোণে ঐ কুঁজোতে বোধ হয় জল আছে।

কুঁজোর পাশেই একটা কাচের গ্লাস ছিল, প্রতুলবাবুই গ্লাসে করে তাড়াতাড়ি কুঁজো থেকে জল ঢেলে এনে দিলেন।

কী হল! একজন ডাক্তার কাউকে ডাকলে হত না? রজত ব্যগ্র কণ্ঠে বলে।

গ্লাস থেকে জল নিয়ে শায়িত সুজাতার চোখে-মুখে জলের মৃদু ঝাপটা

দিতে দিতে—সুজাতার নিমীলিত চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ইনস্‌পেক্টার বসাক বললেন, না। ব্যস্ত হবেন না রজতবাবু। একে গতকালের ব্যাপার থেকে হয়তো স্ট্রেন যাচ্ছিল, তার উপর আজকের নিউজটা একটা শক্‌ দিয়েছে। তাই হয়তো জ্ঞান হারিয়েছেন। আপনি বরং পাখার সুইচটা অনুগ্রহ করে অন্‌ করে দিন।

রজত এগিয়ে গিয়ে পাখার সুইচটা অন করে দিল।

মৃদু মিষ্টি একটা ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ নাসারন্ধ্রে এসে প্রবেশ করছে। জলবিন্দু শোভিত কোমল চারু কপালটি, তার আশেপাশে চূর্ণ কুন্তলের দু' এক গাছি স্থানভ্রষ্ট হয়ে জলের সঙ্গে কপালে জড়িয়ে গিয়েছে। নিমীলিত আঁখির জলসিক্ত পাতা দুটি মৃদু মৃদু কাঁপছে। বাম গণ্ডের উপরে কালো ছোট্ট তিলটি।

অনিমেষে চেয়ে থাকেন ইনস্‌পেক্টার বসাক মুখখানির দিকে। শুধু কি মুখখানিই!

নিটোল চিবুক, ঠিক তার নিচে শঙ্খের মত সুন্দর গ্রীবা। গ্রীবাকে বেষ্টন করে চিক্‌ চিক্‌ করছে সরু সোনার একটি বিছে হার।

গলাকাটা ব্লাউজের সীমানা ভেদ করে থেকে থেকে নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলিত হচ্ছে—যেন সুধাভরা দুটি স্বর্ণকুম্ভ।

চোখের দৃষ্টি যেন ঘুরিয়ে নিতে পারেন না ইনস্‌পেক্টার বসাক। সত্যিই আজ বুঝি সুপ্রভাত।

সব কিছু ভুলে গিয়ে যেন ইনস্‌পেক্টার চেয়ে রইলেন বসে সেই মুখখানির দিকে।

এবং বেশ কিছুক্ষণ পরে কম্পিত ভীরু চোখের পাতা দুটি খুলে তাকাল সুজাতা।

সুজাতা দেবী! স্নিগ্ধ কণ্ঠে ডাকেন ইনস্‌পেক্টার বসাক।

বিস্রস্ত বেশ ঠিক করে উঠে বসবার চেষ্টা করে সুজাতা, কিন্তু বাধা দেন ইনসপেক্টার বসাক, উঠবেন না, আর একটু শুয়ে থাকুন। চলুন রজত বাবু, আমরা বাইরে যাই। উনি একটু বিশ্রাম নিন।

ইনস্‌পেক্টার বসাকের ইঙ্গিতে সকলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

দরজাটা নিঃশব্দে ভেজিয়ে দিলেন বসাক।

॥ ২১ ॥

গত রাত্রে নিচের তলায় যে ঘরে বসে সকলের কথাবার্তা হয়েছিল ইনস্‌পেক্টার বসাক সেই ঘরেই এসে প্রতুল বোস ও রজতকে নিয়ে প্রবেশ করলেন।

রেবতীর মুখেই ইতিমধ্যে সংবাদটা ড্রাইভার করালী, পাচক লছমন ও দরোয়ান ধনবাহাদুর জানতে পেরেছিল।

তারাও এসে দরজার বাইরে ভিড় করে দাঁড়ায় ইতিমধ্যে। ঐ সঙ্গে প্রহরারত একজন বাঙালী কনেষ্টবল মহেশও দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ায়।

সর্বাগ্রে মহেশকে ডেকে মিঃ বসাক থানায় রামানন্দ সেনকে তখুনি একটা সংবাদ দিতে বললেন, সংবাদ পাওয়ামাত্রই নীল কুঠীতে চলে আসবার জন্য। মৃতদেহটার একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

রেবতীকে যা জিজ্ঞাসাবাদ করবার করা হয়ে গিয়েছিল বলে ইনস্‌পেক্টার বসাক প্রথমেই ডাকলেন লছমনকে। লছমন সাধারণতঃ একটু ভীতু প্রকৃতির লোক। তার উপরে রেবতীর মুখে রামচরণের খুন হবার সংবাদ পাওয়া অবধি সে যেন আর তার মধ্যেই ছিল না। ইনস্‌পেক্টারের আহ্বানে সে যখন তার সামনে এসে দাঁড়াল তার গলা দিয়ে স্বর বেরুবার মত অবস্থাও তখন আর তার নেই।

নাম কি তোর?

গোটা দুই ঢোঁক গিলে কোনমতে লছমন নামটা তার উচ্চারণ করে।

কাল রাত্রে কখন শুতে গিয়েছিলি?

লছমনের যদিও মুঙ্গের জিলায় বাড়ি, দশ বৎসর বাংলাদেশে থেকে বেশ ভালই বাংলা ভাষাতে কথাবার্তা বলতে পারে।

সে আবার কোন মতে একটা ঢোঁক গিলে বললে, রাত এগারটার পরই হবে সাহেব।

শুনলাম, কাল রাত্রে নাকি রামচরণ কিছু খায় নি, সত্যি?

হ্যাঁ সাহেব। রামচরণ কাল রাত্রে কিছুই খায় নি।

কেন খায় নি জানিস কিছু?

না। বলতে পারি না সাহেব।

রামচরণ রোজ আফিম খেত, জানিস?

আজ্ঞে হ্যাঁ, দেখেছি তাকে খেতে।

তুই দেখেছিস ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

হুঁ, কাল রাত্রে তুই একটানাই ঘুমিয়েছিলি না এক আধবার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল ?

একবার মাঝরাত্রে উঠেছিলাম বাইরে যাবার জন্য।

সেই সময় কোন শব্দ বা কিছু শুনেছিস ?

আজ্ঞে—

লছমন যেন কেমন একটু ইতস্তত: করতে থাকে।

এবারে একটু চড়া স্বরে মিঃ বসাক বললেন, চুপ করে রইলি কেন ? যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দে।

আজ্ঞে আমি যখন বাইরে থেকে ঘুরে আবার ঘরে ঢুকতে যাব—

কী ? আবার থামল দেখ। বল্—

তখন যেন মনে হল কে একজন শাদা চাদরে গা ঢেকে রামচরণের ঘর থেকে বের হয়ে রান্নাঘরের সামনে যে সরু ফালি বারান্দাটা সেই দিকে চট্ করে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ভয়ে বাবু তখন আমার গলা শুকিয়ে এসেছে, তাড়াতাড়ি উঠি কি পড়ি কোন মতে নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকে খিল তুলে দিই।

কেন, ভেবেছিলি বুঝি ভূত ?

আজ্ঞে সাহেব। গত মাস খানেক ধরেই রামচরণের মুখে যে শুনেছি—

কি শুনেছিস ?

বুড়োকর্তা বাবু নাকি ভূত হয়ে এ বাড়িতে রাত্রে ঘুরে বেড়ায় মধ্যে মধ্যে।

কি বললি ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আমাদের বাবুও নাকি তাকে—ঐ বুড়ো কর্তা বাবুর ভূতকে অনেক রাত্রে উপরের বারান্দায় ঘুরে বেড়াতে দেখেছেন।

রামচরণ তোকে ঐ কথা বলেছিল ?

হ্যাঁ।

শুধু তোদের কর্তাবাবুই বুড়ো কর্তার ভূত দেখেছিলেন না তোরাও কেউ কেউ এর আগে দেখেছিস ?

আমি বা রামচরণ কখনও দেখি নি তবে করালী নাকি বার দু-তিন দেখেছিল।

ভূত তুই বিশ্বাস করিস্ ?

কি যে বলেন বাবু! সিয়ারাম! সিয়ারাম! ভূত প্রেত তেনারা আছেন বৈকি!

রেবতী, করালী ওদের তোর কেমন লোক বলে মনে হয়?

রেবতীও আমারই মত ভীতু বাবু, তবে করালীর খুব সাহস।

মৃদু হেসে ইনস্‌পেক্টার এবারে বললেন, আচ্ছা যা। করালীকে এঘরে পাঠিয়ে দে।

নমস্কার জানিয়ে লছমন ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

তার মুখ দেখে মনে হল সে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

ইনস্‌পেক্টার বসাক লছমনকে প্রশ্ন করতে করতে তাঁর ডাইরীতে মধ্যে মধ্যে নোট করে নিচ্ছিলেন

রজত স্তব্ধ হয়ে পাশেই একটা চেয়ারে বসেছিল।

এমন সময় আবার ঘরের বাইরে জুতোর শব্দ পাওয়া গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই বলতে গেলে স্থানীয় থানা ইনচার্জ রামানন্দ সেন ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন।

॥ ২২ ॥

আবার কি হল স্যার? রামানন্দ সেন প্রশ্ন করলেন।

এই যে মিঃ সেন, আসুন। বসুন—

মুখ তুলে আহ্বান জানালেন ইনস্‌পেক্টার রামানন্দ সেনকে।

রামানন্দ সেন একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন।

This time poor রামচরণ!

বলেন কি, মানে সেই বৃদ্ধ পুরাতন ভৃত্য—সত্যি—

হ্যাঁ। তারপর একটু থেমে আবার বললেন, কিছুটা এখন অবশ্য বুঝতে পারছি আমারই অসাবধানতার জন্যে বেচারীকে প্রাণ দিতে হল।

কি বলছেন স্যার!

ঠিকই বলছি মিঃ সেন। রামচরণের কথাবার্তা শুনেই কাল মনে হয়েছিল স্বেচ্ছায় আমার প্রশ্নের জেরায় পড়ে যতটুকু সে স্বীকার করেছে, সেটাই সব নয়। যে কোন কারণেই হোক অনেক কথাই সে গোপন করে গিয়েছে। তাই কাল মনে মনে ভেবে রেখেছিলাম একদিনেই আর বেশি চাপ দেব না।

আজ রইয়ে সইয়ে আবার জিজ্ঞাসবাদ করব। এবং আমার অনুমান যে একেবারে মিথ্যা নয়, তার মৃত্যুই সেটা প্রমাণ করে দিয়ে গেল। তাই বলছিলাম কাল যদি একটু রামচরণ সম্পর্কে সতর্ক থাকতাম এবং তার উপরে আরো একটু নজর রাখতাম, তবে হয়তো এমনি করে তাকে নিহত হতে হত না।

আপনি কি বলতে চান স্যার বিনয়েন্দ্রবাবুর হত্যাকারীই তবে রামচরণকেও হত্যা করেছে!

নিশ্চয়ই। একই কালো হাতের কাজ। এবং এ বিষয়ও আমি স্থির নিশ্চয়ই যে বিনয়েন্দ্রর হত্যার ব্যাপার অনেক কিছু জানত বলেই সেই বেচারীকে হত্যাকারীর হাতে এইভাবে এত তাড়াতাড়ি প্রাণ দিতে হল। অনেক কথাই বিনয়েন্দ্রবাবু সম্পর্কে আমাকে সে গতকাল বলেছিল, আরও বেশী কিছু না প্রকাশ করে বসে যাতে করে হত্যাকারীর বিপদ ঘটতে পারে, সেই আশঙ্কাতেই হয়তো হত্যাকারী এত তাড়াতাড়ি তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলল। এবং—

কথাটা ইনস্‌পেক্টার শেষ করতে পারলেন না হঠাৎ তিনি থেমে গেলেন। বললেন, কে?

একটা মুখ দরজা পথে উঁকি দিয়েছিল।

ইনস্‌পেক্টারের প্রশ্নে ঘরের অন্যান্য সকলেরই দৃষ্টি সেইদিকে আকর্ষিত হয়।

একটা ভাঙা কর্কশ গলায় প্রশ্নোত্তর এল, আজ্ঞে, আমি করালী।

এসো, ভিতরে এসো।

করালী ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল।

লোকটা দেখতে রোগা লম্বা কালো পালিশ করা গায়ের রং। মুখভর্তি বসন্তের বিশ্রী ক্ষতচিহ্ন। নাকটা একটু চাপা। পুরু ঠোঁট অত্যধিক ধূম্রপানে একেবারে কালচে হয়ে গেছে।

মাথার চুল পর্যাপ্ত, তেল চক্ চক্ করছে। এলবার্ট তেড়ি।

পরিধানে সাধারণ একটা ধোপ-দুরস্ত ধুতি ও গায়ে একটা শাদা অনুরূপ সিল্ক টুইলের হাফসার্ট।

আমাকে ডেকেছিলেন স্যার?

হ্যাঁ। কিন্তু ঘরে না ঢুকে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে উঁকি মারছিলে কেন?

আজ্ঞে উঁকি তো মারি নি, ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখলাম আপনারা কথা বলছেন, তাই ঢুকতে একটু ইতস্ততঃ করছিলাম।

হুঁ, তুমি তো এই নিচের তলাতেই লছমনের ঘরের পাশের ঘরটাতেই থাক?

আজ্ঞে।

কাল রাত্রে কখন ঘুমিয়েছিলে?

আজ্ঞে, শরীরটা আমার কয়দিন থেকেই ভাল যাচ্ছিল না বলে কাল রাতে আর কিছু খাই নি, সাড়ে ন'টার মধ্যেই ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম।

শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়েছিলে?

আজ্ঞে একরকম তাই, আমার তো বিছানায় শোওয়া আর ঘুমান।

রাত্রে আর ঘুম ভাঙে নি?

না।

কিন্তু ওই একটি মাত্র উচ্চারিত শব্দও যেন ইনস্‌পেক্টারের মনে হল, করালী একটু ইতস্তত: করেই উচ্চারণ করল।

কাল রাত্রে তাহলে কোন রকম শব্দ বা চিৎকার শোন নি?

শব্দ? চিৎকার? কই না।

হুঁ। ইনস্‌পেক্টার কি যেন ভাবতে লাগলেন।

তারপর হঠাৎ আবার প্রশ্ন শুরু করলেন, করালী, তুমি তো বছরখানেক মাত্র এখানে চাকরি নিয়েছ, তাই না?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

এর আগে কোথায় কাজ করতে?

কোথাও দু'চার দিনের বেশি একটা ঠিকে কাজ ছাড়া করি নি, একমাত্র এই বাড়িতেই এই একবছর একটানা কাজ করছি।

তোমার ড্রাইভিং লাইসেন্স কত দিনের?

চার বছরের।

চার বছর লাইসেন্স পেয়েছ, অথচ কোথাও এর আগে বড় একটা কাজ করো নি। কি করে তাহলে দিন চালাতে?

তা আর চলতো কই স্যার। আজকাল ভাল সুপারিশপত্র না হলে প্রাইভেট গাড়ি চালাবার কাজ কি বিশ্বাস করে কেউ দিতে চায় স্যার? কাজের সন্ধান নিয়ে কারও কাছে গেলেই অমনি সকলে প্রশ্ন করবেন, আগে কোথায় কাজ করেছো, কেমন কাজ করতে তার সার্টিফিকেট দেখাও।

হুঁ। তা বিনয়েন্দ্রবাবু সে রকম কিছু দেখতে চান নি তোমার কাছে?

আজ্ঞে না। আজ্ঞে তিনি ছিলেন সত্যিকারের গুণী। বললেন, ড্রাইভ

কর দেখি, কাজ দেখে তবে কাজে বহাল করব। বললাম, এই তো বাবু কথার মত কথা। নিয়ে গেলাম গাড়িতে চাপিয়ে। আপনাদের আশীর্বাদে স্যার যে কোন মেক্ বা মডেলের গাড়ি দিন না, জলের মত চালিয়ে নিয়ে যাব। আমার গাড়ি চালানো দেখে বাবুও খুশি হয়ে গেলেন। তিনি সেই দিনই কাজে বহাল করে নিলেন আমাকে।

ইনস্‌পেক্টার বুঝতে পারেন, লোকটা একটু বেশিই কথা বলে।

বাবু তাহলে তোমার গাড়ি চালনায় খুশীই ছিলেন বল ?

আজ্ঞে, নিজমুখে আর কি বলব স্যার, বলবেন অহঙ্কার, দেমাক ; তবে হ্যাঁ, বাবু বেঁচে থাকলে তাঁরই মুখে শুনতে পারতেন। তবে তিনি বলতেন, করালী, তোমার হাতে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমান যায়।

হুঁ। ভাল কথা। দেখ করালী, কাল তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করা হয় নি।

বলুন স্যার।

তোমার আপনার জন আর কে কে আছে ?

আজ্ঞে স্যার, সে কথা আর বলবেন না। ভাল করে জ্ঞান হবার আগেই মা-বাপকে হারিয়েছি ; তারপর লালন-পালন করলে এক পিসি ; তা সে-ও বছর দশেক আগে মারা গেছে। সব ধুয়ে মুছে গেছে। একা স্যার—একেবারে একা।

বিয়ে করো নি ?

বিয়ে থা আর কে দেবে বলুন স্যার। এতদিন তো ক্যাঁ ক্যাঁ করে ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়িয়েছি—এই তো সবে যাহোক একটা কাজ জুটেছিল। দেখুন না, তাও বরাতে সইল না। এবারে আবার সেই রাস্তা আর কলের জল।

কেন হে, এখানে তো শুনলাম দেড়শত টাকা মাইনে পেতে, থাকা খাওয়াও লাগত না, এ ক'বছরে কিছুই জমাতে পার নি ?

আজ্ঞে না স্যার। জমলো আর কোথায়! আগের কিছু ধার-দেনা ছিল, তাই শোধ দিতে দিতেই সব বেরিয়ে যেত মাসে মাসে—জমাব কি করে আর।

আচ্ছা করালী, তুমি যেতে পার। হ্যাঁ, ভাল কথা, না বলে কোথায় বেরিও না যেন।

আজ্ঞে না স্যার, কোথাও বড় একটা আমি বের হই না।

করালী ঘর ছেড়ে চলে গেল।

॥ ২৩ ॥

ইনস্‌পেক্টার বসাক থানা ইনচার্জ রামানন্দ সেনের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, কিছু বুঝতে পারলেন সেন?

একেবারেই যে কিছু বুঝি নি তা নয় স্যার। বেশ গভীর জলের মাছ বলেই মনে হল।

হঠাৎ রজত কথা বললে, ঠিকই বলেছেন মিঃ সেন। লোকটার চোখ দুটো যেন ঠিক সাপের চোখের মত। একেবারে পলক পড়ে না। তা ছাড়া লোকটার মুখের দিকে তাকালেই যেন কেমন গা ঘিন্‌ ঘিন্‌ করে। আশ্চর্য! লোকটাকে ছোট্‌কা যে কি করে টলারেট্‌ করতেন তাই ভাবছি।

ইনস্‌পেক্টার রজতের কথায় মৃদু হাসলেন মাত্র, কোন জবাব দিলেন না।

হাসিটা রজতের দৃষ্টি এড়ায় না। সে বলে, হাসছেন আপনি ইনস্‌পেক্টার, কিন্তু লোকটার মুখের দিকে তাকালেই কি মনে হয় না—ঠিক যেন একটা snake!

ইনস্‌পেক্টার রজতের প্রশ্নের এবারেও কোন জবাব দিলেন না, কেবল রামানন্দ সেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, মৃতদেহটা একবার দেখবেন নাকি?

হ্যাঁ, একবার যাই, দেখে আসি। একটা ডাইরী আবার পাঠাতে হবে তো।

যান।

রামানন্দ সেন ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

ইনস্‌পেক্টার এবারে রজতের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, আপনারা যখন এসে গেছেন রজতবাবু, মৃতদেহের মানে আপনাদের কাকার সৎকার করবেন তো?

তা করতে হবে বইকি।

তাহলে আর দেরি করবেন না। রামানন্দবাবুর কাছ থেকে একটা Order নিয়ে কলকাতায় চলে যান।

রামচরণের মৃতদেহটা মর্গে পাঠাবার একটা ব্যবস্থা করে রামানন্দ সেন থানায় ফিরে গেলেন। চা পান করে রজতও বিনয়েন্দ্রবাবুর মৃতদেহ কলকাতার মর্গ থেকে নিয়ে সৎকারের একটা ব্যবস্থা করবার জন্য বের হয়ে গেল।

একজন কনষ্টেবলকে নিচের তলায় প্রহরায় রেখে ইনস্‌পেক্টার বসাক উপরে চললেন।

প্রথমেই পুরন্দর চৌধুরীর সংবাদ নেবার জন্য তাঁর ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলেন।

পুরন্দর চৌধুরী শয্যার উপরে শুয়ে গভীর নিদ্রায় মগ্ন তখনও।

ধীরে ধীরে ঘরের দরজাটা টেনে দিয়ে, ঘর থেকে বের হয়ে এলেন ইনস্‌পেক্টার।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, বেলা প্রায় সাড়ে দশটা বাজে। সুজাতা দেবীর একটা সংবাদ নেওয়া প্রয়োজন।

এগিয়ে চললেন ইনস্‌পেক্টার সুজাতার ঘরের দিকে।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কিছুটা ইতস্ততঃ করলেন, তারপর আঙুল দিয়ে টুক্‌ টুক্‌ করে ভেজান দরজার গায়ে মৃদু 'নক্‌' করলেন।

কিন্তু কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না।

প্রথমে ভাবলেন সুজাতা ঘুমাচ্ছে হয়তো, তারপরেই আবার কি ভেবে মৃদু একটু ঠেলা দিয়ে ভেজান দরজাটা ঈষৎ একটু ফাঁক করে ঘরের ভিতরে দৃষ্টিপাত করলেন।

দেখতে পেলেন, সুজাতা নিঃশব্দে খোলা জানালার সামনে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে।

বিস্রস্ত চুলের রাশ সারা পিঠ ব্যেপে ছড়িয়ে আছে। হাওয়ায় চূর্ণ কুন্তল উড়ছে। বেশেও কেমন একটা শিথিল এলোমেলো ভাব।

আবার দরজার গায়ে নক্‌ করলেন টুক্‌ টুক্‌ করে।

কে? ভিতর থেকে সুজাতার গলার প্রশ্ন ভেসে এল।

ভিতরে আসতে পারি কি?

আসুন।

দরজা ঠেলে ইনস্‌পেক্টার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

সুজাতা ঘুরে দাঁড়াল: আসুন।

এখন একটু সুস্থ বোধ করছেন তো মিস্‌ রয়?

হ্যাঁ।

একটু চা বা গরম দুধ এক গ্লাস খেলে পারতেন। বলি না দিতে রেবতীকে ডেকে?

বলতে হবে না। রেবতী কিছুক্ষণ আগে নিজেই এসে আমাকে চা দিয়ে

গিয়েছে। চা খেয়েছি। কিন্তু আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন মিঃ বসাক? বসুন না ঐ চেয়ারটার 'পরে।

হ্যাঁ, বসি। পাশেই একটা চেয়ার ছিল, টেনে নিয়ে ইনস্‌পেক্টার উপবেশন করলেন: আপনিও বসুন মিস্ রয়।

সুজাতা খাটের উপরেই শয্যায় উপবেশন করে।

কিছুক্ষণ দুজনার কেউ কোন কথা বলে না। স্তব্ধতার মধ্যেই কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল।

এবং স্তব্ধতা ভঙ্গ করে প্রথমেই কথা বললেন ইনস্‌পেক্টার, আপনি কি তাহলে কলকাতায়ই ফিরে যাবেন ঠিক করলেন, মিস্ রয়?

সুজাতা নিঃশব্দে মুখ তুলে তাকাল ইনস্‌পেক্টারের মুখের দিকে।

রজতদা কোথায়? সুজাতা প্রশ্ন করে।

রজতবাবু তো এই কিছুক্ষণ আগে কলকাতায় গেলেন।

কলকাতায় কেন?

বিনয়েন্দ্রবাবুর মৃতদেহের সৎকারের একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো, তাই।

সুজাতা আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, আমি যদি লক্ষ্ণৌয়ে ফিরে যাই, আপনার কোন আপত্তি আছে কি?

না। আপত্তি আর কি, তবে আপনার কাকার সলিসিটারকে একটা সংবাদ পাঠাতে বলেছি প্রতুলবাবুকে, আজই সন্ধ্যার সময় এখানে এসে একবার দেখা করবার জন্য।

সলিসিটারকে কেন?

আপনার কাকার উইল-টুইল যদি কিছু থাকে, তা সেটা তো আপনাদের জানা প্রয়োজন।

থাকলেও আমার সে বিষয়ে কোন interestই নেই জানবেন, মিঃ বসাক। সুজাতা যেন মৃদু ও নিরাসক্ত কণ্ঠে কথাটা বললে।

বিস্মিত ইনস্‌পেক্টার সুজাতার মুখের দিকে তাকালেন।

হ্যাঁ। তাঁর সম্পত্তি যার ইচ্ছা সে নিক। আমার তাতে কোন প্রয়োজনই নেই। চাই না আমি সেই অর্থের এক কপর্দকও, এবং নেবও না। পূর্ববৎ নিরাসক্ত কণ্ঠেই কথাগুলো বলে গেল সুজাতা।

সে তো পরের কথা পরে। আগে দেখুন তাঁর কোন উইল আছে কিনা। উইলে যদি আপনাদেরই সব দিয়ে গিয়ে থাকেন তো ভালই, নচেৎ উইল না

থাকলেও তাঁর সব কিছুর একমাত্র ওয়ারিশন তো আপনারাই, আর কিছু যদি আপনি না নেনই—যাকে খুশি সব দানও করতে পারবেন।

না না। তাঁর স্বোপার্জিত অর্থ তো নয়, সবই তো সেই বাবার দাদামশাইয়ের অর্থ। যে লোক মরবার সময় পর্যন্ত তাঁর নাতি-নাতনীদের মুখ দেখেন নি, তাঁর সম্পত্তি লাখ টাকা হলেও আর যেই নিক আমি একটি কপর্দকও স্পর্শ করব না তা জানবেন।

কি বলছেন আপনি মিস্ রয়?

ঠিকই বলছি। আপনি তো জানেন না আমার পিতামহকে। অনাদি চক্রবর্তী তাঁর একমাত্র জামাই হওয়া সত্ত্বেও সব কিছু থেকে তাঁকে তিনি বঞ্চিত করে গিয়েছিলেন। আর শুধু কি তিনিই, শুনেছি আমার পিতামহীরও এমন অহমিকা ছিল ধনী-কন্যা বলে যে, আমার পিতামহকে যাচ্ছেতাই করে অপমান করতেও একদিন দ্বিধাবোধ করেন নি। বাবা বলেছিলেন একদিন, সুজাতা, যদি কখনও ভিক্ষা করেও খেতে হয় তবু যেন অনাদি চক্রবর্তীর এক কপর্দকও গ্রহণ কর না। এমন কি তিনি যেচে দিতে এলেও জেন যে, অর্থ বিবাহিতা স্ত্রীকে পর্যন্ত স্বামীর কাছ থেকে দূরে ঠেলে দেয়, সে অর্থ মানুষের জীবনে আর যাই দিক মঙ্গল আনতে পারে না। আমি এখানে এসেছিলাম শুধু তাকে একটিবার দেখব বলে. অন্যথায় আসতামই না।

॥ ২৪ ॥

একটানা সুজাতা কথাগুলো বলে গেল।

মিঃ বসাকের বুঝতে কষ্ট হয় না. সুজাতা দেবী সত্যি সত্যিই তার মৃত ছোট্‌কাকে গভীর শ্রদ্ধা ও স্নেহ করত। এবং তাই ছোট্‌কার মৃত্যু-সংবাদটা তার বুকে শেলের মতই আঘাত হেনেছে।

একটু থেমে সুজাতা আবার বলতে লাগল. আমার ও ছোট্‌কার মধ্যে ঠিক যে কী সম্পর্ক ছিল, আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না মিঃ বসাক। তাছাড়া আপনি হয়তো বুঝবেনও না। ছোট বেলায় মা-বাবাকে হারিয়েছি। মানুষ হয়েছি রজতদার মা-জেঠাইমার স্নেহ ও ভালবাসাতেই। কিন্তু সেদিনকার আমার বালিকা মনের খুব নিকটে যাকে আপনার করে পেয়েছিলাম, সে হচ্ছে আমার ছোট্‌কাই।

বলতে বলতে সুজাতার গলাটা যেন কেমন জড়িয়ে আসে।

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে আবার বলতে শুরু করে, ছোট্‌কা ছিল আমাদের, বিশেষ করে আমার, জীবনে একাধারে বন্ধু ও সর্ব ব্যাপারে একমাত্র সাথী। তাই যেদিন তিনি তাঁর দাদামশাইয়ের জরুরী একটা চিঠি পেয়ে হঠাৎ কাউকে কিছু না জানিয়েই এ বাড়িতে চলে এলেন, এবং তারপর যে কারণেই হোক আর তিনি আমাদের কাছে ফিরে গেলেন না, তারপর থেকে রজতদা ও জেঠাইমা তাঁর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলেও আমি তা পারি নি। তাঁদের সঙ্গে একমত না হতে পারলেও অবিশ্যি তাঁদের বিরুদ্ধেও যেতে পারি নি। তাই মনে মনে ছোট্‌কার সঙ্গে দেখা করবার খুব বেশী একটা ইচ্ছা থাকলেও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি নি সেদিন।

একটু থেমে সুজাতা আবার বলতে লাগল, তারপর হঠাৎ এমন কতকগুলো কথা ছোট্‌কার নামে আমার কানে গেল যে, পরে আর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতে ইচ্ছাও হয় নি।

কিছু যদি না মনে করেন তো একটা কথা জিজ্ঞাসা করি সুজাতা দেবী। কী এমন কথা আপনার ছোট্‌কার সম্পর্কে, কার মুখে আপনি শুনেছিলেন বলতে আপনার যদি আপত্তি না থাকে।

— না। আপত্তি কি। কথাটা শুনেছিলাম রজতদার মুখেই। তার সঙ্গে নাকি হঠাৎ একদিন ছোট্‌কার রাস্তায় দেখা হয়েছিল, তখন ছোট্‌কা নাকি রজতদা কথা বলা সত্ত্বেও তাকে চিনতে পারে নি। তাই ভয় হয়েছিল রজতদার মত আমাকেও যদি ছোট্‌কা আর না চিনতে পারেন।

সুজাতার মুখে কথাটা শুনে মিঃ বসাক কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। একটা কথা সুজাতাকে ঐ সম্পর্কে খুবই ইচ্ছা হচ্ছিল বলবার কিন্তু ইচ্ছা করেই শেষ পর্যন্ত বললেন না। এমন সময় রেবতী এসে ঘরে ঢুকল।

কি খবর রেবতী ?

বাবু, ঠাকুর বলল খাবার তৈরী।

ঠিক আছে, ঠাকুরকে টেবিলে খাবার দিতে বল। আর অমনি দেখ পুরন্দর বাবু উঠেছেন কিনা।

রেবতী চলে গেল।

উঠুন সুজাতা দেবী। স্নান করবেন তো করে নিন।

হ্যাঁ, আমি স্নান করব।

খাবার টেবিলে বসে সুজাতা কিন্তু এক গ্লাস সরবৎ ছাড়া কিছুই খেতে চাইল না। না খেলেও খাবার টেবিলেই বসে রইল।

মিঃ বসাক ও পুরন্দর চৌধুরী খেতে লাগলেন।

একসময় মিঃ বসাক বললেন, আপনি কি তাহলে আজই চলে যেতে চান, মিস্ রয়?

রজতদা ফিরে আসুক। কাল সকালেই যাব।

কালই তাহলে লক্ষ্ণৌ রওনা হচ্ছেন?

না। দু একদিন পরে রওনা হব।

আহারাদির পর সুজাতা ও পুরন্দর চৌধুরী যে যার ঘরে বিশ্রাম নিতে চলে গেলেন। মিঃ বসাক নিচে এলেন।

যে ঘরে রামচরণ নিহত হয়েছিল সেই ঘরে এসে ঢুকলেন।

ঘণ্টাখানেক আগে মৃতদেহ মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘরটা খালি।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন।

ঘরের জানালাগুলো ভেজান ছিল, এগিয়ে গিয়ে ঘরের পশ্চাতে বাগানের দিককার দুটো জানালাই খুলে দিলেন। দ্বিপ্রহরের পর্যাপ্ত আলোয় স্বল্পান্ধকার ঘরটা আলোকিত ও স্পষ্ট হয়ে উঠল।

ঘরের দেওয়ালে পেরেকের সাহায্যে দড়ি টাঙিয়ে তার উপরে খান দুই পরিষ্কার পাটকরা ধুতি ঝুলছে। একপাশে একটা তোয়ালে। একটা শার্ট ও গোটা দুই গেঞ্জিও দড়িতে ঝোলান রয়েছে।

এক কোণে একটা কালো মাঝারি আকারের রঙ ওঠা স্টীল ট্রাঙ্ক। দেওয়ালে একটা আর্সী ও তার পিছনে গোঁজা একটি চিরুনি। আর্সীটার পাশেই দেওয়ালে টাঙানো একটি ফোটো। ফোটোটার সামনে এগিয়ে গেলেন মিঃ বসাক।

পাঁচ-ছয় বছরের একটি শিশুর ছোট ফোটো। অনেক দিন আগেকার তোলা ফোটো হবে। কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

ফোটোটা দেখতে দেখতে হঠাৎ তার পাশেই দেওয়ালে টাঙানো আর্সীটার পিছনে গোঁজা চিরুনিটার দিকে নজর পড়তেই একটা জিনিস তাঁর দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে।

চিরুনিটার সরু দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে কয়েকগাছি কেশ তখনও আটকে আছে। বিশেষ করে কয়েকগাছি কেশই তাঁর দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে।

॥ ২৫ ॥

হাত বাড়িয়ে চিরুনিটা হাতে নিলেন মিঃ বসাক।

চার-পাঁচ গাছি কেশ আটকে রয়েছে চিরুনির সরু দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে। এবং কেশগুলি লম্বায় হাতখানেকের চাইতে একটু বেশীই হবে। আর সেগুলো সামান্য একটু কোঁকড়ান এবং রংও তার ঠিক কালো নয়, কেমন একটু কটা কটা।

ধীরে ধীরে কেশগুলি চিরুনির দাঁত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আরও ভাল করে পরীক্ষা করতে লাগলেন মিঃ বসাক।

রামচরণের নিত্য ব্যবহৃত এই চিরুনি তাতে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে এখনও মিঃ বসাকের, রামচরণের কেশের রং কুচ্‌কুচে কালোই ছিল ; যদিচ অনেক কেশেই তার পাক ধরেছিল। বিশেষ করে, তার কেশ দৈর্ঘ্যে এতখানি হওয়াও অসম্ভব। মোট কথা, চিরুনির এই কেশ আদপেই রামচরণের মাথার নয়।

এবং কেশের দৈর্ঘ্য দেখে মনে হয়, এ কোন রমণীর মাথার কেশ হবে। কোন পুরুষের মাথার কেশ এ নয়।

এবং কোন নারীরই মাথার কেশ যদি হবে, তবে এই চিরুনীতে এ কেশ এল কোথা থেকে ?

এ বাড়িতে তো কোন নারীর অস্তিত্বই নেই এবং ছিল না বলেই তো তিনি শুনেছেন। একমাত্র লতা, তাও সেদিন যার আগেই এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। সে ক্ষেত্রে চিরুনির দাঁতে নারীর কেশ দেখে মনে হচ্ছে, গতকাল দিনে বা রাত্রে নিশ্চয়ই কেউ এক সময়ে এই চিরুনির সাহায্যে তার কেশ প্রসাধন করেছিল যিনি কোন পুরুষ নন, নারীই। এ বাড়িতে একমাত্র বর্তমানে উপস্থিত নারী সুজাতা দেবীই। সুজাতা দেবী নিশ্চয়ই রামচরণের ঘরে এসে তাঁর চিরুনি দিয়ে কেশ প্রসাধন করেন নি। আর করলেও সুজাতা দেবীর কেশ এ ধরণের নয়। তাঁর কেশ দৈর্ঘ্যে আরও বড় ও কালো কুচ্‌কুচে। আদপেই কোঁকড়ান নয়।

তবে কে সেই নারী যার কেশ প্রসাধনের চিহ্ন এখনও এই চিরুনির দাঁতে রয়ে গিয়েছে !

আরও মনে হয়, যেই কেশ প্রসাধন করে থাকুক—রামচরণের দৃষ্টিতে নিশ্চয়ই ব্যাপারটা পড়ে নি, নচেৎ রামচরণের মত ছিমছাম প্রকৃতির লোকের

চিরুনিতে এগুলো আটকে থাকা সম্ভব হত না একবার তার দৃষ্টি চিরুনিতে আকৃষ্ট হলে।

তবে কি রামচরণের অজ্ঞাতেই কেউ তার চিরুনির সাহায্যে কেশ প্রসাধন করেছিল! সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা মনে হয় মিঃ বসাকের, গত রাত্রে রামচরণ যখন তাঁদের আহার্য পরিবেশন করছিল তখনও তো তিনি লক্ষ্য করেছেন, তার মাথার কেশ পরিপাটি করে আঁচড়ান ছিল। যাতে করে তাঁর মনে হয়েছিল, বৈকালের পরে কোন এক সময় সে তার কেশ প্রসাধন করেছিল। অতএব কি দাঁড়াচ্ছে তাহলে?

সন্ধ্যার পর রাত্রে কোন এক সময়ে কোন না কোন নারীই এই ঘরে এসে রামচরণের এই চিরুনির সাহায্যে তার কেশ প্রসাধন নিশ্চয়ই করেছিল। যার সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত প্রমাণ এখনো এই চিরুনির দাঁতে কয়েকগাছি কেশে বর্তমান। এবং এ থেকে সহজেই অনুমান হয় কোন নারী তাহলে গতরাত্রে এ-কক্ষে এসেছিল। কিন্তু কথা হচ্ছে, রামচরণের জ্ঞাতে না অজ্ঞাতে।

আরও একটা কথা সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, যে নারী গত রাত্রে এই ঘরে এসেছিল সে রামচরণের পরিচিতও হতে পারে, অপরিচিতও হতে পারে।

এবং শুধু তাই নয় রামচরণের হত্যার ব্যাপারে সেই নারীর প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ কোন যোগাযোগ ছিল কিনা তাই বা কে জানে!

মোট কথা, কোন এক নারীর এই কক্ষমধ্যে গত রাত্রে পদার্পণ ঘটেছিল। এবং সে বিষয়ে যখন কোন সন্দেহই থাকছে না তখন সেই নারীর এই কক্ষমধ্যে আবির্ভাবের ব্যাপারটাই রামচরণের হত্যার মতই বিস্ময়কর মনে হয়।

বাড়ির চারিদিকে কাল সতর্ক পুলিস প্রহরী ছিল, তার মধ্যেই অন্যের দৃষ্টি এড়িয়ে কী করে এক নারীর এ বাড়িতে প্রবেশ সম্ভবপর হয়!

তবে কি সেই নারীই রামচরণের হত্যাকারী!

কথাটা ভাবতে গিয়েও যেন মিঃ বসাকের লজ্জার অবধি থাকে না। তাঁদের এতগুলো পুরুষের জাগ্রত ও সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁক দিয়ে শেষ পর্যন্ত কিনা সামান্য এক নারী নিঃশব্দে এসে রামচরণকে হত্যা করে চলে গেল! এতগুলো লোক কেউ কিছু জানতেও পারল না!

কিন্তু এলোই বা সে এ বাড়িতে কোন্ পথে, আবার ফিরে গেলই বা কোন্ পথে?

অথচ কিছুক্ষণ পূর্বে পর্যন্ত কেন যেন মিঃ বসাকের ধারণা হয়েছিল, গত

রাত্রে রামচরণের হত্যাকারী এ বাড়ির মধ্যে যারা উপস্থিত ছিল গত রাত্রে তাদের মধ্যেই কেউ না কেউ হতে পারে। এখন মনে হচ্ছে তা নাও হয়তো হতে পারে।

ভাবতে ভাবতে চকিতে মিঃ বসাকের মনে আর একটা সম্ভাবনার উদয় হয়। এই কেশ যার সেই নারী ও বিনয়েন্দ্রর জীবনে তার ল্যাব্রোটারী অ্যাসিস্‌টেণ্ট হিসাবে যে রহস্যময়ী নারীর অকস্মাৎ আবির্ভাব ঘটেছিল—উভয়েই এক নয় তো!

কিন্তু কথাটার মধ্যে যেন বেশ কোন যুক্তি খুঁজে পান না মিঃ বসাক।

সে না হলেও, কোন এক নারী কাল রাত্রে এ ঘরে এসেছিল ঠিকই এবং যে প্রমাণ একমাত্র যার পক্ষে আজ দেওয়া সম্ভব ছিল সে রামচরণ, কিন্তু সে আজ মৃত।

যে রহস্যের উপর আলোকপাত সম্ভব হত আজ আর তার কাছ থেকে পাওয়ার কোন উপায়ই নেই, তার মুখ আজ চিরদিনের জন্যই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আর সে কথা বলবে না।

আবার মনে হয়, তবে কি বিনয়েন্দ্রবাবুর হত্যাকারীও সে-ই: তাই সে এত তাড়াতাড়ি রামচরণের কণ্ঠও চিরতরে বন্ধ করে দিয়ে গেল, পাছে রামচরণ তার সমস্ত রহস্য ফাঁস করে দেয়!

আবার সেই রহস্যময়ীর কথাই মনের মধ্যে নূতন করে এসে উদয় হয়।

সমস্ত ব্যাপারটাই ক্রমে যেন আরো জটিল হয়ে উঠছে

সব যেন কেমন বিশ্রী ভাবে জড়িয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু সে যাই হোক, এই কয়েকগাছি কেশের মধ্যে নিঃসন্দেহে যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

যত্নসহকারে পকেট থেকে একটা কাগজ বের করেন মিঃ বসাক। এবং কাগজের মধ্যে কেশ কয়গাছি রেখে ভাঁজ করে সযত্নে পকেটের মধ্যে রেখে দিলেন।

তার পর রামচরণের স্টীল ট্রাঙ্কটা খুলবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তালা দেওয়া। খোলা গেল না। চাবিটা কিন্তু বিশেষ খুঁজতে হল না। রাম-চরণের শয্যার নিচে তোশকের তলাতেই পাওয়া গেল। চাবির সাহায্যে মিঃ বসাক তালা খুলে ফেললেন।

বাক্সটা খুলে ডালাটা তুললেন। ট্রাঙ্কের মধ্যে বিশেষ কিছু এমন পাওয়া গেল না। খান কয়েক ধুতি পাট করা, গোটা দুই জামা। একটা ব্যাগের

মধ্যে গোটা ত্রিশেক টাকা ও কিছু খুচরো পয়সা। একটা ছোট কৌটার মধ্যে খানিকটা আফিং এবং খানকয়েক চিঠি ও মনি অর্ডারের রসিদ।

রসিদগুলো ফেরত আসছে কোন এক শ্যামসুন্দর ঘোষের কাছ থেকে।

চিঠিগুলোও সেই শ্যামসুন্দরেরই লেখা। চিঠি পড়ে বোঝা গেল, সম্পর্কে সেই শ্যামসুন্দর রামচরণের ভাইপো হয়। থাকে মেদিনীপুর। আর পাওয়া গেল একটা পোস্ট-অফিসের পাশ-বই।

পাশ-বইটা উলটে-পালটে দেখা গেল, তার মধ্যে প্রায় শ-চারেক টাকা আজ পর্যন্ত জমা দেওয়া আছে। মধ্যে মধ্যে অবিশ্যি ৫।১০ টাকা করে তোলার নিদর্শনও আছে। লোকটা দেখা যাচ্ছে তাহলে কিছুটা সঞ্চয়ীও ছিল।

বাক্সটা বন্ধ করে পুনরায় তালায় চাবি দিয়ে মিঃ বসাক রামচরণের ঘর থেকে বের হয়ে এলেন।

দ্বিপ্রহরের রৌদ্র তাপ তখন অনেকটা ঝিমিয়ে এসেছে।

প্রশান্ত বসাক নিচের তলায় যে ঘরটায় গত দু দিন ধরে অফিস করেছিলেন সেই ঘরেই এসে প্রবেশ করলেন।

॥ ২৬ ॥

ঘরের মধ্যে ঢুকতেই চোখাচোখি হয়ে গেল প্রতুলবাবুর সঙ্গে।

প্রতুলবাবু বোধ হয় কিছুক্ষণ আগে এসেছেন, ঐ ঘরে ইনস্‌পেক্টারের অপেক্ষায় বসেছিলেন।

প্রতুলবাবুর পাশেই চেয়ারে স্যুট পরিহিত সুশ্রী আর একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক বসেছিলেন।

এই যে প্রতুলবাবু! কতক্ষণ এসেছেন?

এই কিছুক্ষণ হল। আলাপ করিয়ে দিই ইনস্‌পেক্টার সাহেব, ইনি মিঃ চট্টরাজ, বিনয়েন্দ্রবাবুর অ্যাটর্নী। আর ইনি ইনস্‌পেক্টার মিঃ প্রশান্ত বসাক।

উভয়ে উভয়কে নমস্কার ও প্রতিনমস্কার জানান।

কথা বললেন তারপর প্রথমে মিঃ চট্টরাজই, আমাকে আপনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন মিঃ বসাক?

হ্যাঁ। বিনয়েন্দ্রবাবুর কোন উইল আছে কিনা সেইটাই আমি জানবার জন্য আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম মিঃ চট্টরাজ।

না। উইল তিনি কোন কিছু করে যান নি।

কোন উইলই নেই ?

না।

উইলের কোন কথাবার্তাও হয় নি কখনও তাঁর আপনার সঙ্গে ?

মাস পাঁচ ছয় আগে একবার তিনি আমাদের অফিসে যান, সেই সময় কথায় কথায় একবার বলেছিলেন উইল একটা তিনি করবেন—

সে উইল কী ভাবে হবে সে সম্পর্কে কোন কথাবার্তা হয় নি ?

হ্যাঁ, বলেছিলেন, তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি একমাত্র হাজার দশেক নগদ টাকা ছাড়া তিনি তাঁর ভাইঝি কে এক সুজাতা দেবীকেই নাকি দিয়ে যেতে চান।

একমাত্র দশ হাজার টাকা ব্যতীত সব কিছু সুজাতা দেবীকেই দিয়ে যাবেন বলেছিলেন ?

হ্যাঁ।

রজতবাবু তাঁর একমাত্র ভাইপোর সম্পর্কে কোন ব্যবস্থাই করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন নি ?

হ্যাঁ, করেছিলেন, ঐ নগদ দশ হাজার টাকা মাত্র। আর কিছু নয়।

হুঁ। ক্ষণকাল চুপচাপ বসে কি যেন ভাবলেন মিঃ বসাক, তারপর মৃদু কণ্ঠে বললেন, একটা কথা মিঃ চট্টরাজ, বিনয়েন্দ্রবাবুর প্রপার্টির ভ্যালুয়েশন কত হবে নিশ্চয়ই জানেন ?

ইদানিং অনেক কিছুই হস্তান্তরিত হয়েছিল। কলকাতার তিনখানা বাড়ি, ফিক্সড ডিপোজিটের সুদ বাবদ যা পেয়েছেন সবই গিয়েছিল খরচ হয়ে—তা হলেও এখনও যা প্রপার্টি আছে তার ভ্যালুয়েশন তা ধরুন, লাখ দুয়েক তো হবেই। তাছাড়া ব্যাঙ্কেও নগদ হাজার পঞ্চাশ এখনও আছে।

সম্পত্তির পরিমাণ তাহলে নেহাৎ কম নয়। বেশ লোভনীয়ই যে যে-কোন ব্যক্তির পক্ষে।

মিঃ চট্টরাজ বললেন, এ আর কি, একদিন চক্রবর্তীদের সম্পত্তির পরিমাণ পনের বিশ লাখ টাকা ছিল; যা কাগজপত্রে পাওয়া যায়। নানা ভাবে কমতে কমতে এখন কলকাতার পার্ক স্ট্রীটের বাড়ি, এই নীলকুঠি ও টালিগঞ্জ অঞ্চলে কিছু জমি ও ব্যাঙ্কে যা নগদ আছে।

এখন তাহলে বিনয়েন্দ্রবাবুর সমস্ত সম্পত্তি কে পাচ্ছে মিঃ চট্টরাজ ?

উইল যখন কিছু নেই তখন রজতবাবু ও সুজাতা দেবীই সব সমান ভাগে পাবেন; কেন না একমাত্র ওঁরাই দুজনে আজ বিনয়েন্দ্রবাবুর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

রেবতী এসে ঘরে প্রবেশ করল এবং প্রতুলবাবুকে সম্বোধন করে বললে, বাবু, চাল ডাল তেল ঘির ব্যবস্থা করে দিয়ে যাবেন।

এতদিন, এমন কি কাল রাত পর্যন্তও রামচরণের ঘাড়েই ঐ সব কিছুর দায়িত্ব গত বিশ বছর ধরে চাপান ছিল। এখন অন্য কোন রকম ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত রেবতীকেই চালাতে হবে।

প্রতুলবাবু বললেন, যাবার আগে টাকা দিয়ে যাব। এখন যা যা দরকার মতি স্টোর্স থেকে এবাড়ির অ্যাকাউন্টে গিয়ে নিয়ে আয়।

রেবতী মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

প্রতুলবাবু তখন চট্টরাজকে সম্বোধন করে বললেন, টাকার ব্যবস্থা কিছু আপনাকে শীগগিরই করতে হবে মিঃ চট্টরাজ। আমার ক্যাশেও সামান্যই আছে আর।

সামনের মাসের টাকাটা এ মাসের দশ তারিখেই তুলে রেখেছিলাম ব্যাঙ্ক থেকে। কাল সে টাকাটা পাঠিয়ে দেব। তারপর রেবতীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, এঁদের চা দাও রেবতী।

রেবতী বললে, চা প্রায় হয়ে এসেছে। এখুনি আনছে।

রেবতী ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

প্রতি মাসে সাধারণতঃ কত সংসার-খরচ বলে আসত মিঃ চট্টরাজ?

কলকাতার পার্ক স্ট্রীটের ফ্ল্যাট সিসটেমের বাড়িটা থেকে ভাড়া বাবদ ৬০০৲ টাকা পাওয়া যায় আর ব্যাঙ্ক থেকে ৬০০৲। এই বারশত করে প্রতি মাসে আসত। তাছাড়া ৪০০৲।৫০০৲ প্রতি মাসেই বেশী চেয়ে পাঠাতেন যেটা আবার তুলে দেওয়া হত ব্যাঙ্ক থেকেই।

ব্যাঙ্ক থেকে অত টাকা তুলতেন প্রতি মাসে? প্রশান্ত বসাক প্রশ্ন করেন চট্টরাজকে।

হ্যাঁ, ইদানিং বছর দেড়েক থেকেই তো অমনি টাকা খরচ হচ্ছিল।

তার আগে?

বাড়িভাড়ার টাকাতেই চলে যেত।

তা ইদানিং বছর দেড়েক ধরে এমন কি খরচ বেড়েছিল মিঃ চট্টরাজ, যে বিনয়েন্দ্র বাবুর অত টাকার প্রয়োজন হত?

তা কেমন করে বলব বলুন। টাকা তিনি চাইতেন, আমরা পাঠিয়ে দিতাম মাত্র। তাঁর অর্থ তিনি ব্যয় করবেন তাতে আমাদের কি বলবার থাকতে পারে বলুন? শুধু ঐ কেন, গত এক বৎসরের মধ্যেই তো তাঁর

কলকাতার আরও যে দুখানা ছোট বাড়ি ছিল তাও তিনি বিক্রি করেছেন।

এবার মিঃ বসাক ঘুরে তাকালেন প্রতুলবাবুর মুখের দিকে এবং প্রশ্ন করলেন, কেন অত টাকার প্রয়োজন হত ইদানিং তাঁর, সে সম্পর্কে আপনি কিছু বলতে পারেন প্রতুলবাবু?

আজ্ঞে না, তাঁর একান্ত নিজস্ব ব্যাপার কেউ ঘুণাক্ষরেও কিছু জানতে পেত না। কাউকে তিনি কিছু বলতেনও না।

আচ্ছা মিঃ চট্টরাজ, বিনয়েন্দ্রবাবুর সঙ্গে আপনার কি রকম পরিচয় ছিল?

বিশেষ কিছুই না বলতে গেলে। বেশীর ভাগ তাঁর যা কিছু বলবার তিনি চিঠিতে বা ফোনেই জানাতেন।

এ বাড়িতে ফোন আছে নাকি! কই দেখি নি তো। বললেন প্রশান্ত বসাক।

জবাব দিলেন প্রতুলবাবু, আছে ল্যাব্রোটারী ঘরের মধ্যে।

বাইরে এমন সময় জুতোর শব্দ পাওয়া গেল। পুরন্দর চৌধুরী এসে ঘরে প্রবেশ করলেন।

- আসুন পুরন্দর বাবু, বিশ্রাম নেওয়া হল?

হ্যাঁ। আমাকে তাহলে অনুগ্রহ করে এবারে যাবার অনুমতি দিন ইনস্পেক্টার। কথা দিচ্ছি আপনাকে আমি, ডাকামাত্রই আবার আমি এসে হাজির হব।

আমি এখুনি একবার কলকাতায় যাব। ফিরে এসে আপনাকে বলব কখন আপনাকে ছেড়ে দিতে পারব মিঃ চৌধুরী। জবাব দিলেন ইনস্পেক্টার।

রেবতী চায়ের ট্রে হাতে ঘরে এসে প্রবেশ করল।

॥ ২৭ ॥

লালবাজারে কিছু কাজ ছিল, সে কাজ শেষ করে মিঃ বসাক সোজা সেখান থেকে কিরীটীর টালিগঞ্জ ভবনে এসে হাজির হলেন।

কিরীটী তাঁর দোতলার বসবার ঘরে আলো জেলে বসে একখানা জ্যোতিষ চর্চার বই নিয়ে পড়ছিল।

জংলী এসে সংবাদ দিল, ইনস্পেক্টার বসাক এসেছেন।

নিয়ে আয় এই ঘরেই। বই থেকে না মুখ তুলেই কিরীটী বললে।

একটু পরে প্রশান্ত বসাকের পদশব্দে পূর্ববৎ বই হতে না মুখ তুলেই একটা শাদা কাগজের বুকে একটা কুষ্ঠির ছকের পাশে কি সব লিখতে লিখতে আহ্বান জানাল কিরীটী, আসুন মিঃ বসাক, বসুন। সপ্তম স্থানে রাহু, অষ্টমে বুধ।

মিঃ বসাক বসতে বসতে বললেন, জ্যোতিষ চর্চা আবার শুরু করলেন কবে থেকে?

ভারতের বহু পুরাতন ও অবহেলিত অদ্ভুত সায়েন্স এই জ্যোতিষ চর্চার ব্যাপার মিঃ বসাক। এবং সময় ও নক্ষত্র যদি ঠিক ঠিক হয় তো অনেক কিছুই দেখবেন, নির্ভুল পাবেন আপনি গণনায়। অঙ্ক শাস্ত্রের মত ঠিক হলে শুদ্ধ উত্তর ঠিক আপনি পাবেনই।

জ্যোতিষ চর্চাটাকে সত্যি সত্যিই তাহলে আপনি বিশ্বাস করেন মিঃ রায়?

নিশ্চয়ই, এ একটা অত্যাশ্চর্য সায়েন্স। আর বিশ্বাসের কথা বলছেন, এ তো আপনি বিশ্বাস করেন যে চন্দ্রের কলাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নদীর জোয়ার-ভাটার পরিবর্তন হয়?

তা অবিশ্যি করি।

তবে কেন আপনার বিশ্বাস করতে বাধে মানুষের দেহের উপরেও গ্রহ-উপগ্রহের প্রভাব আছে? জানেন না আপনি, ভৃগুর কি অসাধারণ ক্ষমতা। আমি এ যতই পড়ছি এবং যতই মনে মনে বিশ্লেষণ করছি ততই বিস্ময় যেন আমার বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। কুষ্ঠির ছকটা আর কিছুই নয়, মানুষের বহু বিচিত্র রহস্যময় অজ্ঞাত জীবনের কতকগুলো সত্য ও অবধারিত সূত্র একত্রে গ্রথিত একটা সংকেত মাত্র। সূত্রগুলির সঠিক পাঠোদ্ধার করতে পারলে আপনি সুনিশ্চিত পৌঁছবেন সেই অজানিত সংকেতের নির্ভুল মীমাংসায় আজ উত্তরপাড়ার নীলকুঠির যে হত্যা-রহস্য আপনাকে চিন্তিত করে—

বাধা দিলেন ইনস্‌পেক্টার, আশ্চর্য, কি করে জানলেন যে সেই ব্যাপারেই আপনার কাছে আমি এসেছি!

কিছুটা শুনেছি আজ দুপুরে, আপনাদের হেডকোয়ার্টারে গিয়েছিলাম, সেখানেই। শুনলাম, নীলকুঠির মার্ডারের মোটামুটি কাহিনীটা এবং সেখানেই শুনলাম আপনিই সেই ঘটনাটা তদন্ত করছেন বর্তমানে। তার পরই অকস্মাৎ আপনার আমার কাছে আগমন। ব্যস্‌, একেবারে অঙ্কশাস্ত্রের যোগ-বিয়োগ—উত্তর মিলে গেল।

সত্যি! সেই কারণেই আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি মিঃ রায় এই সময়ে।

না, না—এর মধ্যে বিরক্তির কী আছে। বলুন, শোনা যাক।

প্রশান্ত বসাক সেই একেবারে গোড়া থেকেই সব বলে যেতে লাগলেন।

কিরীটী সোফাটার উপর পা এলিয়ে দু চক্ষু বুজে একটা চুরোট টানতে টানতে শুনতে লাগল।

কাহিনী যখন শেষ হল, কিরীটী তখনও চোখ বুজে পূর্ববৎ সোফার পরে হেলান দিয়েই বসে আছে।

ঘরের মধ্যে একটা স্তব্ধতা যেন থম্ থম্ করছে।

ওয়াল-ক্লকটা ঢং ঢং করে রাত্রি নয়টা ঘোষণা করল।

সময় সংকেতের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় কিরীটী চোখ মেলে তাকাল, এবং মৃদু কণ্ঠে এই সর্বপ্রথম প্রশ্ন করল, আপনি যা বললেন তার মধ্যে কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে।

কী বলুন তো?

প্রথমতঃ ধরুন, সিংগাপুরী মুক্তা।

কিন্তু সিংগাপুরী মুক্তার ব্যাপারটা তো—

হ্যাঁ। যতটুকু মুক্তা সম্পর্কে আপনি জেনেছেন, আমার মনে হচ্ছে, সেটাই সব নয়, আংশিক মাত্র। দ্বিতীয়তঃ সেই রহস্যময়ী নারী—লতা। লতা শব্দের আর একটি অর্থ জানেন তো, সাপ, এবং সেই সাপই শুধু নয়, ইউ, পি, থেকে আগত সেই আগন্তুকের কথাটাও আপনাকে স্মরণ রাখতে হবে। যেমন করে হোক ঐ দুটি ব্যক্তিবিশেষের খুঁটিনাটি কিছু সংবাদ বা পরিচয় আপনাকে জানতে হবে। আর আপনার মুখে সমস্ত কথা শোনবার পর, মনে মনে আমি যে ছকটি গড়ে তুলেছি তা যদি ভুল না হয়, অর্থাৎ আমার অনুমান যদি ভুল না হয়ে থাকে তো জানবেন, এ ক্ষেত্রে হত্যার কারণ বা মোটিভ প্রেম ঘটিত।

প্রেম ঘটিত!

হ্যাঁ, প্রেমেরই যে সর্বাপেক্ষা বিচিত্র গতি। এবং যে প্রেম ক্ষেত্রবিশেষে নিঃস্ব করে আপনাকে বিলিয়ে দিতে পারে, মনে রাখবেন, সেই প্রেমই আবার ভয়াবহ গরল উদ্গীরণ করতে পারে।

আচ্ছা মিঃ রায়, আপনার কি মনে হয় হত্যাকারী কোন পুরুষ না নারী?

পুরুষও হতে পারেন, নারীও হতে পারেন। অথবা উভয়ের একত্রে মিলিত প্রচেষ্টাও থাকতে পারে। কিন্তু সে তো শেষ কথা বর্তমান রহস্যের। তার পূর্বে যে সূত্রগুলি ধরে আপনি অগ্রসর হবেন সেগুলো হচ্ছে, এক নম্বর, প্রত্যেকেরই গত ৪।৫ বৎসরের জীবনের অতীত ইতিহাস। বিনয়েন্দ্র, রজত, সুজাতা দেবী ও পুরন্দর চৌধুরীর। দুই নম্বর, সেই ছায়ামূর্তির অন্বেষণ। যে ছায়ামূর্তিকে ইদানিং বিনয়েন্দ্র রাত্রে নীলকুঠিতে ঘন ঘন দেখতেন এবং রামচরণ ও ড্রাইভার করালীও দেখছে বলে জানা যায়। তিন নম্বর, সেই শ্রীমতী রহস্যময়ী লতা। তাঁকেও খুঁজে বের করতে হবে, এবং সেই সঙ্গে জানতে হবে সেই লতা বিনয়েন্দ্রর কুমার জীবনে কতখানি ঘনিষ্ঠ হয়ে এসেছিল। চার নম্বর, বিনয়েন্দ্রর শনয়কক্ষ ও গবেষণা ঘরটি আর একবার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আপনাকে দেখতে হবে। এই চারটি প্রশ্নের মধ্যেই বিনয়েন্দ্রর হত্যার কারণ বা মোটিভটি জড়িয়ে আছে জানবেন।

প্রশান্ত বসাক গভীর মনোযোগ সহকারে কিরীটীর কথাগুলো শুনতে থাকেন।

কিরীটী একটু থেমে আবার বলে, এবারে হত্যা করা সম্পর্কে যা আমার মনে হচ্ছে, বিনয়েন্দ্রর হত্যার ব্যাপারটি হচ্ছে pre-arranged, premeditative and a well planned murder। খুব ধীরে-সুস্থে, সময় নিয়ে, প্ল্যান করে, এবং ক্ষেত্র তৈরি করে তারপর হত্যা করা হয়েছে বেচারীকে। এবং খুব সম্ভবতঃ, তার কিছুটা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে বেচারী রামচরণ জানতে পারায় হত্যাকারী রামচরণকেও সরিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছে। অতএব সেটাও ইচ্ছাকৃত হত্যা। দুটি নৃশংস হত্যাকাণ্ডের যিনি হোতা, জানবেন, তিনি যেমন ধূর্ত তেমনি সতর্ক, তেমনি শয়তানী বুদ্ধিতে পরিপক্ক। এবং সম্ভবতঃ আজ কাল বা দু চার দিনের মধ্যেই হোক, হত্যাকারী আবার হানবে তার মৃত্যু-ছোবল।

কিরীটীর কথায় প্রশান্ত বসাক যেন চমকে ওঠেন, বলেন, কি বলছেন আপনি মিঃ রায়!

ঠিকই বলছি। আমার calculation যদি মিথ্যা না হয় তো শীঘ্রই আবার একটি বা ততোধিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হবে। অতএব সাবধান। খুব সাবধান। কিন্তু যাক সে কথা, এবারে আসা যাক আপনার সূত্রগুলির মধ্যে। ১নং, ভাঙা ঘড়ি। ২নং, অপহৃত বিনয়েন্দ্রর রবারের চপ্পল জোড়া।

৩নং, রামচরণের ঘরে তার নিত্যব্যবহার্য চিরুনিতে প্রাপ্ত কয়েকগাছি নারীর কেশ। ৪নং, তিনখানি চিঠি।

॥ ২৮ ॥

প্রশান্ত বসাক কিরীটীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, শুভরাত্রি জানিয়ে নিজের গাড়িতে এসে যখন বসলেন, রাত তখন সোয়া দশটা।

ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন উত্তরপাড়া যাবার জন্য।

চলন্ত গাড়ির মধ্যে বসে আর একবার সমস্ত ব্যাপারটা ও কিরীটীর কথাগুলো মনে মনে পর্যালোচনা করতে লাগলেন প্রশান্ত বসাক।

নীলকুঠিতে যখন এসে পৌঁছলেন রাত্রি তখন প্রায় পৌনে এগারটা।

সিঁড়ির মুখেই রেবতীর সঙ্গে প্রশান্ত বসাকের দেখা হয়ে গেল।

এবং রেবতীর কাছেই শুনলেন, এতক্ষণ সকলে ওর জন্য অপেক্ষা করে এই সবে খেতে বসেছেন।

রজতবাবু রাত আটটা নাগাদ ফিরে এসেছেন এবং আরও একটি সংবাদ পেলেন, সুন্দরলাল নামে এক ভদ্রলোক রায়পুর থেকে এসেছেন।

প্রশান্ত বসাক সোজা একেবারে খাবার ঘরেই এসে প্রবেশ করলেন। ঘরের মধ্যে টেবিলের সামনে বসে সবেমাত্র সকলে তখন আহার শুরু করেছেন।

ঘরের মধ্যে উপস্থিত চারটি প্রাণী—সুজাতা, রজত, পুরন্দর চৌধুরী ওঁদের তো চেনেনই প্রশান্ত বসাক, চেনেন না কেবল চতুর্থ ব্যক্তিকে। পরিধানে তাঁর স্যুট, মাথায় পাঞ্জাবীদের মত পাগড়ি এবং চোখে কালো লেন্সের চশমা। বুঝলেন, উনিই আগন্তুক সুন্দরলাল।

প্রশান্ত বসাকের পদশব্দে সকলেই মুখ ফিরিয়ে তাকালেন।

রজত ও সুজাতা পাশাপাশি একদিকে ও অন্যদিকে টেবিলের পাশাপাশি বসে পুরন্দর চৌধুরী ও সুন্দরলাল।

প্রশান্ত বসাক ঘরে প্রবেশের মুখেই লক্ষ্য করেছিলেন, রজত ও সুজাতা নিম্নকণ্ঠে পরস্পরের সঙ্গে কী যেন কথাবার্তা বলছে। আর সুন্দরলাল ও পুরন্দর চৌধুরী দুজনে কথাবার্তা বলছেন। ইনস্পেক্টারকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে সর্বাগ্রে রজতই তাঁকে আহ্বান জানাল, আসুন মিঃ বসাক, আপনার জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করে থেকে এইমাত্র আমরা সকলে বসলাম।

না, না—তাতে কি হয়েছে, বেশ করেছেন। বলতে বলতে এগিয়ে এসে একটা খালি চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন প্রশান্ত বসাক, তারপর বললেন, দাহ হয়ে গেল ?

হ্যাঁ।

রেবতী এসে ইনস্‌পেক্টারের সামনে দাঁড়িয়ে বললে, আপনার খাবার দিতে বলি ?

হ্যাঁ, বল।

ওঁকে আপনি বোধ হয় চিনতে পারছেন না মিঃ বসাক ? সুন্দরলালকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে প্রশ্ন করল রজত।

না : মানে—

সুন্দরলালই জবাব দিলেন ইংরেজীতে, My name is Sundar Lall Jha ;

সুস্পষ্ট শুদ্ধ উচ্চারণ। কোথাও এতটুকু জড়তা নেই, এবং গলাটা সরু ও মিষ্টি।

হ্যাঁ, রেবতীই বলছিল আপনার এখানে আসবার কথা এইমাত্র। তা আপনি—

বিনয়েন্দ্রবাবু আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিলাম। কিন্তু এখানে পৌঁছে এঁদের মুখে সব শুনে তো একেবারে তাজ্জব ব'নে গেছি ইনস্‌পেক্টার, how horrible, how absurd !

ইনস্‌পেক্টার কিন্তু কোন জবাব দেন না। তাঁর মনে পড়ে ঘণ্টাখানেক আগে কিরীটীর সেই কথাগুলো—pre-arranged, pre-meditative and a well planned murder !

সুন্দরলাল আবার বললেন, এতক্ষণ আমি চলেই যেতাম, কেবল আপনার সঙ্গে দেখা করব বলেই যাই নি। তাছাড়া ওঁরা বিশেষ করে বললেন ডিনারটা খেয়ে যেতে—

সে তো ভালই করেছেন, মৃদুকণ্ঠে ইনস্‌পেক্টার বলেন, তা উঠেছেন কোথায় ?

কলকাতায়, তাজ হোটেলে।

আপনি যখন বিনয়েন্দ্রবাবুর বিশেষ পরিচিত তখন হয়তো তাঁর সম্পর্কে একটু খোঁজখবরও পাব আপনার কাছে। প্রশান্ত বসাক বললেন।

তাঁর সঙ্গে আলাপ আমার ইদানিং ঘনিষ্ঠ হলেও পরিচয় আমার তাঁর সঙ্গে

একপক্ষে তাঁর থার্ড ইয়ারে ছাত্রজীবনে কয়েক মাস সহপাঠী হিসাবেই হয়। তারপর পড়া ছেড়ে দিয়ে আমার এক আত্মীয়ের কাছে নাগপুরে গিয়ে ব্যবসা শুরু করি। দীর্ঘকাল পরে আবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা এই কলকাতায়ই একটা বিজ্ঞান সভায়। তারপর বার দু-তিন নাগপুর থেকে কলকাতায় এলেই আমি এখানে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করে যেতাম। সেদিক দিয়ে তাঁর পার্সোন্যাল ব্যাপারের বিশেষ তেমন কিছুই আমি জানি না। তাই সেরকম সাহায্য আপনাকে করতে পারব বলে তো আমার মনে হয় না, মিঃ বসাক।

আপনি বিনয়েন্দ্রবাবুর সহপাঠী যখন, তখন পুরন্দরবাবুর সঙ্গেও বোধ হয় আপনার সেই সময়েই আলাপ মিঃ ঝা?

প্রশান্ত বসাকের আকস্মিক প্রশ্নে চকিতে সুন্দরলাল তাঁর পার্শ্বেই উপবিষ্ট পুরন্দর চৌধুরীর দিকে একবার তাকালেন। তারপর মৃদু স্মিতকণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ, ওঁর সঙ্গেও আমার আলাপ আছে।

মিঃ বসাক সুন্দরলালের সঙ্গে এমনি ঘরোয়া সহজভাবে কথাবার্তা বলতে বলতেই তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টিতে সুন্দরলালকে দেখছিলেন।

বয়েস যাই হোক না কেন, সুন্দরলালকে কিন্তু পুরন্দর চৌধুরী ও বিনয়েন্দ্র রায়ের সহপাঠী হিসাবে যথেষ্ট কম বয়েস বলেই মনে হচ্ছিল।

তাই শুধু নয়, মুখে যেন কেমন একটা রমণী-সুলভ কমনীয়তা। দাড়ি নিখুঁতভাবে কামান, সরু গোঁফ।

দেহের গঠনটাও ভারী সুশ্রী—লম্বা, খুব রোগাও নয়, আবার মোটাও নয়।

কাঁটা-চামচের সাহায্যে আহার করছিলেন সুন্দরলাল, হাতের আঙুলগুলো লম্বা লম্বা সরু সরু।

ডান হাতের অনামিকায় ও মধ্যাঙ্গুষ্ঠে দুটি পাথর বসানো স্বর্ণ-অঙ্গুরীয়। একটি পাথর, প্রবাল। অন্যটি বোধ হয় হীরা।

ঘরের আলোয় আংটির হীরাটি ঝিলমিল করছিল।

টেবিলে বসে খেতে খেতেই নানাবিধ আলোচনা চলতে লাগল অতঃপর।

আহারাদির পর পুনরায় আগামী কাল আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সুন্দরলাল বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

রজত অসুস্থ ছিল, সেও শুতে গেল।

সুজাতার ঘুম আসছিল না বলে তিন তলার ছাতে বেড়াতে গেল।

কেবল একটা টর্চ ও লোডেড পিস্তল পকেটে নিয়ে প্রশান্ত বসাক বাড়ির পশ্চাতের বাগানে গিয়ে প্রবেশ করলেন।

চাঁদ উঠতে আজ অনেক দেরি। অন্ধকার আকাশে এক ঝাঁক তারা জ্বল জ্বল করছে।

দীর্ঘ দিনের অযত্নে বাগানের চারিদিকে প্রচুর আগাছা নির্বিবাদে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকার রাত্রি যেন চারিদিককার আগাছা ও জঙ্গলের মধ্যে লুকোচুরি খেলছে। প্রাচীরের সীমানা ঘেঁষে বড় বড় দুটি কনকচাঁপার গাছ। ডালে ডালে তার অজস্র বিকশিত পুষ্প-গন্ধ বাতাসে যেন ম-ম করছে।

পায়ে-চলা একটা অপ্রশস্ত পথ বাগানের মধ্যে দিয়ে বরাবর চলে গিয়েছে প্রাচীর সীমানার গেট পর্যন্ত, সেই পথটা ধরেই এগিয়ে চললেন প্রশান্ত বসাক।

॥ ২৯ ॥

সুজাতা একাকী তিন তলার ছাদে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আজ যেন কোথায়ও হাওয়া এতটুকুও নেই। অসহ্য একটা গুমোট ভাব।

কালই সকালে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে মনস্থ করেছিল সুজাতা। এবং যাবার জন্য গতকাল দ্বিপ্রহর পর্যন্ত তার মনের মধ্যে একটা আগ্রহও যেন তাকে তাড়না করছিল। কিন্তু এখন সে তাড়নাটা যেন আর তত তীব্র নেই।

ছোট্‌কার আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে যে বিহ্বলতা এসেছিল সেটাও যেন কেমন থিতিয়ে এসেছে। নিজেকে কেমন যেন দুর্বল মনে হয়।

বিশেষ একখানি মুখ মনের মধ্যে যেন কেবলই ভেসে ভেসে ওঠে। মনে হয় সত্যিই তো, এত তাড়াতাড়ি লক্ষ্ণৌ ফিরে গিয়ে কি হবে! সেই তো দৈনন্দিনের রুটিন-বাঁধা একঘেয়ে শিক্ষয়িত্রীর জীবন।

একই বহুবার পঠিত বইয়ের পাতাগুলি একের পর এক উল্টে যাওয়া, একই কথা, একই লেখা, কোন বৈচিত্র্য নেই। কোন নূতনত্ব বা কোন আবিষ্কারের আনন্দ বা উত্তেজনা নেই।

সেই স্কুল, সেই বাসা।

বহু পরিচিত লক্ষ্ণৌ শহরের সেই রাস্তাঘাটগুলো।

সীমাবদ্ধ একটা গণ্ডির মধ্যে কেবলই চোখ-বাঁধা বলদের মত পাক খাওয়া।

এই জীবন তো সুজাতা কোনদিন চায় নি। কল্পনাও তো কখনো করে নি। সারাটা জীবন ধরে এমনি করেই সে রুক্ষ এক মরুভূমির মধ্যে ঘুরে ঘুরেই বেড়াবে!

সেও তো কতদিন স্বপ্ন দেখেছে, জীবনের পাত্রখানি তাঁর একদিন সুধারসে কানায় কানায় ভরে উঠবে। জীবন-মাধুর্য পরিপূর্ণতায় উপচে পড়বে।

জীবনের ত্রিশটা বছর কোথা দিয়ে কেমন করে যে কেটে গেল!

কোথা থেকে এত মিষ্টি চাঁপা ফুলের গন্ধ আসছে! মনে পড়ল আজই সকালে জানালার ভিতর দিয়ে সে দেখেছে বাগানের প্রাচীর সীমানার ধার ঘেঁষে বড় বড় দুটি কনক চাঁপার গাছ অজস্র স্বর্ণ-ফুলে যেন ছেয়ে আছে। এ তারই গন্ধ।

ত্রয়োদশীর ক্ষীণ চাঁদ দেখা দিল আকাশ-দিগন্তে। আবছা মৃদু কোমল আলোর একটি আভাস যেন চারিদিকে ছড়িয়ে গেল।

কত রাত হয়েছে, কে জানে!

সুজাতা সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

শেষ সিঁড়িতে পা দিয়ে সামনের দিকে তাকাতেই আপনার অজ্ঞাতেই যেন থম্‌কে দাঁড়িয়ে যায় সুজাতা।

ওকি! ওটা কি!

চাঁদের আবছা আলোয় বারান্দায় দীর্ঘ শ্বেত বস্ত্রাবৃত ওটা কি!

ভয়ে আতঙ্কে স্থান কাল ভুলে দীর্ণ আর্ত একটা চিৎকার করে উঠল সুজাতা এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সিঁড়ির শেষ ধাপের উপরে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল।

প্রশান্ত বসাকও তখন সবেমাত্র বাগান থেকে ফিরে দোতলায় উঠবার প্রথম ধাপে পা দিয়েছেন। সুজাতার কণ্ঠনিঃসৃত আর্ত সেই তীক্ষ্ণ চিৎকারের শব্দটা তাঁর কানে যেতেই তিনি চম্‌কে ওঠেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পান যেন একটা দ্রুত পদধ্বনি উপরের বারান্দায় মিলিয়ে গেল। এক মুহূর্তও আর দেরি করলেন না প্রশান্ত বসাক।

প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে দু'তিনটা সিঁড়ি এক একবারে অতিক্রম করে ছুটলেন উপরের দিকে।

বারান্দায় এসে যখন পৌঁছালেন, দেখলেন পুরন্দর চৌধুরীও ইতিমধ্যে তাঁর ঘর থেকে বের হয়ে এসেছেন।

কি! কি ব্যাপার! কে যেন চিৎকার করল! পুরন্দর চৌধুরী সামনেই প্রশান্ত বসাককে দেখে প্রশ্ন করলেন।

হ্যাঁ, আমিও শুনেছি সে চিৎকার। বলতে বলতেই হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল তিনতলায় ছাতে উঠবার সিঁড়িটার মুখেই কী যেন একটা পড়ে আছে।

ছুটেই একপ্রকার সিঁড়ির কাছে পৌঁছে প্রশান্ত যেন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। সেই ক্ষীণ চন্দ্রালোকেও সুজাতাকে চিনিতে তাঁর কষ্ট হয় না।

পুরন্দর চৌধুরীও প্রশান্ত বসাকের পিছনে এসে গিয়েছিলেন এবং তিনিও সুজাতাকে চিনতে পেরেছিলেন। বিস্মিতকণ্ঠে তিনি বললেন, একি, সুজাতা দেবী এখানে পড়ে!

প্রশান্ত বসাক ততক্ষণ সুজাতার জ্ঞানহীন দেহটা পরম স্নেহে দুই হাতে তুলে নিয়েছেন। সুজাতার ঘরের দিকে এগুতে এগুতে বললেন, ছাতের সিঁড়ির দরজাটায় শিকল তুলে দিন তো মিঃ চৌধুরী।

সুজাতার ঘরে প্রবেশ করে তার শয্যার উপরেই ধীরে ধীরে শুইয়ে দিলেন সুজাতাকে।

চোখে মুখে জলের ছিটে দিতেই সুজাতার লুপ্ত জ্ঞান ফিরে এল।

চোখ মেলে তাকাল সে।

সুজাতা দেবী!

কে?

আমি প্রশান্ত সুজাতা দেবী।

আমি—

একটু চুপ করে থাকুন।

কিন্তু সুজাতা চুপ করে থাকে না। বলে, এ বাড়িতে নিশ্চয়ই ভূত আছে প্রশান্তবাবু।

ভূত!

হ্যাঁ। স্পষ্ট বারান্দায় আমি হেঁটে বেড়াতে দেখেছি।

ইতিমধ্যে পুরন্দর চৌধুরী রজতকে ডেকে তুলেছিলেন। রজতও এসে কক্ষে প্রবেশ করে বলে, ব্যাপার কি, কি হয়েছে সুজাতা?

প্রশান্ত বসাক আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কী ঠিক দেখেছেন বলুন তো সুজাতা দেবী?

শাদা চাদরে সর্বাঙ্গ ঢাকা একটা মূর্তি বারান্দায় হেঁটে বেড়াচ্ছিল। আমাকে দেখেই ছুটে সেই মূর্তিটা যেন ল্যাব্রোটারী ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

প্রশান্ত বসাককে মনে হল যেন অত্যন্ত চিন্তিত।

রজত আবার কথা বলে, তাহলে রেবতী যে ছায়ামূর্তির কথা এ বাড়িতে মধ্যে মধ্যে রাত্রে দেখা দেয় বলেছিল তা দেখছি মিথ্যা নয়।

ছায়ামূর্তি! সে আবার কি? পুরন্দর চৌধুরী প্রশ্ন করলেন রজতকে।

হ্যাঁ, আপনি শোনেন নি?

কই, না তো।

যাকগে সে কথা। রজতবাবু, এ ঘরে আপনি ততক্ষণ একটু বসুন, আমি আসছি।

কথাটা বলে হঠাৎ যেন প্রশান্ত বসাক ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

॥ ৩০ ॥

প্রশান্ত বসাক সুজাতার ঘর থেকে বের হয়ে সোজা ল্যাব্রোটারী ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করে সুইচ টিপে ঘরের আলোটা জ্বালালেন।

কিরীটীর কথাটাই তাঁর ঐ মুহূর্তে নতুন করে মনে পড়েছিল, সে বলেছিল ল্যাব্রোটারী ঘরটা আর একবার ভাল করে দেখতে।

শূন্য ঘর। কোথাও কিছু নেই।

তবু সমস্ত ল্যাব্রোটারী ঘর ও তৎসংলগ্ন বিনয়েন্দ্রর শূন্য শয়ন ঘরটা তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন।

কিন্তু কোথায়ও কিছু নেই। আবার ল্যাব্রোটারী ঘরে ফিরে এলেন।

হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল ল্যাব্রোটারীর মধ্যস্থিত বাথরুমের দরজাটা হাঁ হাঁ করছে খোলা।

এগিয়ে গেলেন প্রশান্ত বসাক বাথরুমের দিকে।

কিন্তু বাথরুমের দরজা পথে প্রবেশ করতে গিয়েই যেন দরজার সামনে থমকে দাঁড়ালেন। দরজার সামনে কতকগুলো অস্পষ্ট জলসিক্ত পায়ের ছাপ। ছাপগুলো ঘরের মধ্যে এসে যেন বাথরুম থেকে প্রবেশ করেছে। খালি পায়ের ছাপ। বাথরুমের খোলা দরজা পথে প্রশান্ত বসাক ভিতরে উঁকি দিলেন, বাথরুমের মেঝেতে জল জমে আছে, বুঝলেন ঐ জল লেগেই পায়ের ছাপ ফেলেছে এ ঘরে।

প্রশান্ত বসাক এবারে বাথরুমের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

বাথরুমে একটি মাত্রই কাচের জানালা। ঠিক ল্যাব্রোটারী ঘরেরই জানালার অনুরূপ।

লোহার ফ্রেম ঘষা কাচ বসানো একটি মাত্রই পাল্লা। এবং সেই পাল্লাটি ঠিক মধ্যস্থলে একটি ফালক্রামের সাহায্যে দড়ি দিয়ে ওঠা নামা করা যায়।

প্রশান্ত বসাক বাথরুমের মধ্যে ঢুকে দেখলেন, জানালার পাল্লাটি ওঠান।

হস্তধৃত টর্চের আলোর সাহায্যে বাথরুমের আলোর সুইচটা খুঁজে নিয়ে আলোটা জ্বালালেন মিঃ বসাক।

বাথরুমটা আলোয় ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখতে গিয়ে প্রশান্তর মনে হল ঘরের সংলগ্ন ঐ বাথরুমটি যেন বরাবর ছিল না। পরে তৈরি করে নেওয়া হয়েছে। অথবা এমনও হতে পারে ঐ বড় হল-ঘরটির সংলগ্ন এই ছোট ঘরটি পূর্বে অন্য কোন ব্যাপারে ব্যবহার করা হত, বিনয়েন্দ্র পরে সেটিকে নিজের সুবিধার জন্য বাথরুমে পরিণত করে নিয়েছিলেন।

প্রশান্তর বুঝতে কষ্ট হয় না, বাথরুমের ঐ জানালা পথেই কেউ এ ঘরে প্রবেশ করেছিল।' কিন্তু কি ভাবে এল জানালা পথে!

কাচের জানালার পাল্লাটার তলা দিয়ে উঁকি দিলেন। নীলকুঠির পশ্চাতের বাগানের খানিকটা অংশ চোখে পড়ল।

আরও একটু ঝুঁকে পড়ে ভাল করে পরীক্ষা করতে গিয়ে চোখে পড়ল জানালার ঠিক নীচেই চওড়া কার্ণিশ।

সেই কার্ণিশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া যায় বটে, তবে সেটা বেশ বিপদসঙ্কুল এবং শুধু তাই নয় সাহসেরও প্রয়োজন।

আবার ঘরের মেঝেতে জলসিক্ত সেই অস্পষ্ট পদচিহ্নগুলো পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন—যদি কোন বিশেষত্ব থাকে পদচিহ্নগুলোর মধ্যে। কিন্তু তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বিশেষত্বই চোখে পড়ল না প্রশান্ত বসাকের।

বাথরুমের দরজাটা বন্ধ করে একসময় ফিরে এলেন ল্যাব্রোটারী ঘরের মধ্যে প্রশান্ত বসাক।

পূর্বোক্ত ঘরে প্রশান্ত বসাক যখন ফিরে এলেন, রজত সুজাতার পাশে বসে আছে আর জানালার কাছে দাঁড়িয়ে লম্বা সেই বিচিত্র পাইপটায় নিঃশব্দে ধূমপান করছেন পুরন্দর চৌধুরী। সুজাতার জ্ঞান ফিরে এসেছে।

একটা কটু তীব্র তামাকের গন্ধ ঘরের বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

প্রশান্তর পদশব্দে ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলেই যুগপৎ চোখ তুলে দরজার

দিকে তাকাল। পুরন্দর চৌধুরীই প্রথমে কথা বললেন, Anything wrong ইনস্‌পেক্টার ?

না। কিছুই দেখতে পেলাম না।

আমার মনে হয় হঠাৎ উনি কোন রকম ছায়া-টায়া দেখে হয়তো—

পুরন্দর চৌধুরীর কথাটা শেষ হল না। জবাব দিল সুজাতাই, কোন রকম ছায়া যে সেটা নয় সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত মিঃ চৌধুরী। হঠাৎ দেখে আচমকা আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম বটে সত্যি, তবে সে দেখার মধ্যে কোন রকম আমার ভুল হয় নি।

কিন্তু তাই যদি হবে, তবে এত তাড়াতাড়ি সেটা উধাও হয়ই বা কি করে, দোতলা থেকে ? কথাটা বললে রজত।

কিন্তু সেটাই তো আমার না দেখবার বা কিছু একটা ভুল দেখবার একমাত্র যুক্তি নয় রজতদা। জবাবে বলে সুজাতা।

না। উনি ভুল দেখেন নি রজতবাবু। কথাটা বললেন এবারে প্রশান্ত। এবং তাঁর কথায় ও তাঁর গলার স্বরে পুরন্দর চৌধুরী ও রজত দুজনাই যেন যুগপৎ চমকে প্রশান্তর মুখের দিকে তাকাল।

সত্যি বলছেন আপনি মিঃ বসাক ? কথাটা বলে রজত।

হ্যাঁ রজতবাবু, আমি সত্যিই বলছি। কিন্তু রাত প্রায় পৌনে দুটো বাজে, বাকী রাতটুকু আপনারা সকলেই ঘুমবার চেষ্টা দেখুন, আমিও এবারে শুতে যাব, ঘুমে আমার দু'চোখ ভেঙে আসছে।

সমস্ত আলোচনাটার উপরে যেন অকস্মাৎ একটা দাঁড়ি টেনে প্রশান্ত বসাক বোধ হয় ঘর ত্যাগ করে নিজের ঘরে শুতে যাবার জন্যই পা বাড়িয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন। এবং কক্ষ ত্যাগের পূর্বে সুজাতাকে লক্ষ্য করে বললেন, ঘরের দরজায় খিল তুলে দিয়ে শোবেন মিস রয়।

কথাটা শেষ করেই আর মুহূর্তমাত্রও দাঁড়ালেন না ইনস্‌পেক্টার, নিঃশব্দে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

অতঃপর রজত ও পুরন্দর চৌধুরীও যে যার ঘরে শুতে যাবার জন্য পা বাড়াল।

প্রশান্ত নিজের নির্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করে দরজাটা কেবল ভেজিয়ে দিলেন।

ঘুমের কথা বলে আলোচনার সমাপ্তি করে বিদায় নিয়ে এলেও ঘুম কিন্তু প্রশান্ত বসাকের দু'চোখের কোথাও তখন ছিল না।

তিনি কেবল নিজের মনে মনে সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়া আর একবার ভাল করে ভেবে দেখতে চান।

বাথরুমের মেঝেতে, জলসিক্ত পদচিহ্নগুলো সত্যিই তাঁকে বিশেষ ভাবেই যেন বিচলিত করে তুলেছিল। আর কিছু না হোক পদচিহ্নগুলো সুস্পষ্ট ভাবে একটা জিনিস প্রমাণিত করছে, ওই রাত্রে কিছুক্ষণ আগে কোন তৃতীয় ব্যক্তি বিশেষের আবির্ভাব ওই নীলকুঠিতে ঘটেছিল নিঃসন্দেহে। কোন ছায়ার মায়া নয়।

এবং লছমনের মুখে শোনা সেই ভৌতিক আবির্ভাবের সঙ্গে যে আজকের রাত্রে সুজাতা দেবীর দেখা ছায়ামূর্তির বিশেষ এক যোগাযোগ আছে সে বিষয়েও তাঁর যেন কোনই আর সন্দেহ বা দ্বিমত থাকছে না।

আর এও বোঝা যাচ্ছে ভৌতিক ব্যাপারটা এবাড়িতে পূর্বে যারা দেখেছে তাদের সে দেখাটাও যেমন মিথ্যা নয়, তেমনি ব্যাপারটাও সত্যি সত্যিই কিছু আসলে ভৌতিক নয়।

লছমনের মুখ থেকেই তার জবানবন্দীতে শোনা গেছে রামচরণ বিনয়েন্দ্র এবং লছমন নিজেও পূর্বে এ বাড়িতে রাত্রে ওই ছায়ামূর্তি নাকি দেখেছে। অর্থাৎ ব্যাপারটা চলে আসছে বেশ কিছুদিন ধরে।

এবং ছায়ামূর্তির ভৌতিক মুখোসের অন্তরালে যখন সত্যিকারের একটি জলজ্যান্ত মানুষ আছে তখন ওর পশ্চাতে কোন রহস্য যে আছে সেও সুনিশ্চিত।

॥ ৩১ ॥

নীলকুঠির আশেপাশে একমাত্র বামদিকে লাগোয়া একটা দোতলা বাড়ি ভিন্ন আর কোন বাড়ি নেই প্রশান্ত বসাক সেটা পূর্বেই লক্ষ্য করেছিলেন।

জায়গাটার গত কয়েক বৎসরে অনেক কিছু ডেভালপমেণ্ট হলেও ঐ অঞ্চলটির বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয় নি।

ভোরের আলো আকাশে ফুটে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশান্ত বসাক নীলকুঠি থেকে বের হয়ে পড়লেন।

কুঠির আশপাশটা একবার ভাল করে পরীক্ষা করে দেখাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

বাঁ দিককার দোতলা বাড়িটায় একজন প্রফেসার থাকেন, সংসারে তাঁর

এক বৃদ্ধা মা ও স্ত্রী। পূর্বেই সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল গত মাসখানেক ধরে প্রফেসার মা ও স্ত্রীকে নিয়ে পুরীতে চেঞ্জে গেছেন। বর্তমানে বাড়ি দেখাশোনা করে একটি ভৃত্য।

ঘুরতে ঘুরতে প্রশান্ত বসাক নীলকুঠির ডান দিকে এবারে এলেন। সংকীর্ণ একটি গলিপথ। গলিপথটি বড় একটা ব্যবহৃত হয় বলে মনে হয় না। এবং পথটি বরাবর গঙ্গার ধার পর্যন্ত চলে গিয়েছে।

এগিয়ে গেলেন সেই গলিপথ ধরে প্রশান্ত বসাক। গঙ্গার একেবারে ধারে গিয়ে যেখানে পথটা শেষ হয়েছে, বিরাট শাখা-প্রশাখাবহুল একটি পুরাতন অশ্বত্থ বৃক্ষ সেখানে।

ঢালু পাড় বরাবর অশ্বত্থ গাছের তলা থেকে গঙ্গার মধ্যে নেমে গেছে।

অশ্বত্থ তলা থেকে নীলকুঠির লাগোয়া পশ্চাতের বাগানটার সবটাই চোখে পড়ে। এবং বাড়ির পশ্চাতের অংশটাও সবটাই দেখা যায়।

নীলকুঠির দিকে তাকাতেই দোতলার ঐ দিককার একটি খোলা জানালা প্রশান্ত বসাকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

খোলা জানালার সামনে যেন স্থির একটি চিত্র। চিনতে কষ্ট হয় না কার চিত্র সেটা।

সুজাতা।

দৃষ্টি তাঁর সম্মুখের দিকে বোধ হয় গঙ্গাবক্ষেই প্রসারিত ও স্থির। হাওয়ায় মাথার চূর্ণ কুন্তলগুলি উড়ছে।

অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন প্রশান্ত বসাক সেদিকে।

চোখ যেন আর ফিরতে চায় না।

ধীরে ধীরে এক সময় চোখ নামিয়ে পূর্বের পথে আবার ফিরে চললেন প্রশান্ত বসাক।

গলির অন্যদিকে যে সীমানা-প্রাচীর বহু স্থানে তা ভেঙে ভেঙে গিয়েছে।

সেই রকম ভাঙাই একটা জায়গা দিয়ে প্রাচীরের অন্য দিকে গেলেন প্রশান্ত বসাক। প্রায় দু-তিন কাঠা জায়গা প্রাচীরবেষ্টিত।

জীর্ণ একটি একতলা পাকা বাড়ি। গোটা তিনেক দরজা দেখা যাচ্ছে, তার মধ্যে একটি দরজার কড়ার সঙ্গে তালা লাগান।

এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন প্রশান্ত বসাক সেই দরজার সামনে। পাকা ভিতের বহু জায়গায় ফাটল ধরেছে—সিমেণ্ট উঠে গিয়ে তলাকার ইটের গাঁথুনি বিশ্রী ক্ষত-চিহ্নের মত দেখাচ্ছে।

হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল সেই তালা দেওয়া দরজাটার সামনেই জীর্ণ বারান্দার মেঝেতে অনেকগুলো অস্পষ্ট শ্বেত পদচিহ্ন।

এবারে দিনের স্পষ্ট আলোয় পরীক্ষা করে দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না, সেই শ্বেত পদচিহ্নগুলো পড়েছে পায়ে চুন লেগে থাকার দরুন।

এবং এও মনে হয় গত রাত্রে যে পদচিহ্ন অস্পষ্ট জলসিক্ত তিনি বাথরুমে দেখেছেন এগুলো ঠিক তারই অনুরূপ।

ঘরের দরজাটা বন্ধ, তালাটা ধরে টানলেন, কিন্তু ভাল জার্মান তালা, সহজে সে তালা ভাঙবার উপায় নেই।

এমন সময় হঠাৎ তাঁর কানে এল তুলসীদাসের দোঁহা মৃদু কণ্ঠে কে যেন গাইছে।

সামনের দিকে চোখ তুলে তাকালেন, একজন মধ্যবয়সী হিন্দুস্থানী গঙ্গা থেকে সদ্য স্নান করে বোধ হয় হাতে একটা লোটা ঝুলিয়ে তুলসীদাসের দোঁহা গাইতে গাইতে ঐ গৃহের দিকেই আসছে।

হিন্দুস্থানী ব্যক্তিটি দণ্ডায়মান প্রশান্ত বসাকের কাছ বরাবর এসে মুখ তুলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে, কিস্‌কো মাঙতে হে বাবুজী?

এ কোঠিমে আপই রহেতে হে?

হ্যাঁ। লেকেন আপ্ কিস্‌কো মাঙতে হে?

আপকো নাম কেয়া জা?

হরিরাম মিশির।

ব্রাহ্মণ?

হ্যাঁ, কানৌজকা ব্রাহ্মণ।

—হুঁ। এমনি বেড়াতে বেড়াতে চলে এসেছিলাম মিশিরজী। ভেবেছিলাম পোড়ো বাড়ি।

হঠাৎ এমন সময় পাশের একটি বন্ধ দরজা খুলে গেল এবং একটি হিন্দুস্থানী তরুণী আবক্ষ ঘোমটা টেনে বের হয়ে এল।

মিশিরজী তরুণীকে প্রশ্ন করে, কিধার যাতা হায় বেটি? গঙ্গামে?

তরুণী কোন কথা না বলে কেবল মাথা হেলিয়ে গঙ্গার দিকে চলে গেল।

প্রশান্ত বসাক চেয়ে থাকেন সেই দিকে, বিশেষ করে সেই তরুণীর চলার ভঙ্গিটা যেন প্রশান্ত বসাকের চোখের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে।

চোখ যেন ফিরাতে পারেন না।

বাবুজী!

মিশিরজীর ডাকে আবার ফিরে তাকালেন প্রশান্ত বসাক।

বাবুজী কি এই উত্তর পাড়াতেই থাকেন?

অ্যাঁ! না—মানে—

এখানে ঢুকলেন কি করে? গেটে আমার তালা দেওয়া।

না না—গেট দিয়ে আমি ঢুকি নি; ঐ যে ভাঙা প্রাচীর—তারই ফাঁক দিয়ে এসেছি। ভেবেছিলাম পোড়ো বাড়ি।

হ্যাঁ বাবুজী, এতদিন পোড়ো বাড়িই ছিল, মাসখানেকের কিছু বেশী হবে মাত্র আমরা এখানে এসে উঠেছি। তা বাবুজী দাঁড়িয়েই রইলেন, ঘর থেকে একটা চৌকি এনে দিই, বসুন--

না না, মিশিরজী, ব্যস্ত হতে হবে না। আমি এমনিই বেড়াতে চলে এসেছি। এবারে যাই।

প্রশান্ত বসাক তাড়াতাড়ি নেমে যাবার জন্য পা বাড়ালেন।

মিশিরজীও এগিয়ে এল, চলুন বাবুজী, আপনাকে গেট খুলে রাস্তায় দিয়ে আসি।

গেট থেকে বের হয়ে প্রশান্ত বসাক কিন্তু নীলকুঠির দিকে গেলেন না, উলটো পথ ধরে হাঁটতে লাগলেন।

এগিয়ে যেতে যেতে একবার ইচ্ছা হল, পিছন ফিরে তাকান, কিন্তু তাকালেন না। তবে পিছন ফিরে তাকালে দেখতে পেতেন তখনও খোলা গেটের সামনে দাঁড়িয়ে মিশিরজী একদৃষ্টে প্রশান্ত বসাকের গমন পথের দিকেই তাকিয়ে আছে।

তার দু চোখের তারায় ঝক্‌ঝকে শাণিত দৃষ্টি, বহুপূর্বেই তার সহজ সরল বোকা বোকা চোখের দৃষ্টি শাণিত ছোরার ফলার মত প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল।

॥ ৩২ ॥

অনেকটা পথ ঘুরে ক্লান্ত প্রশান্ত বসাক্ যখন নীলকুঠিতে ফিরে এলেন বেলা তখন প্রায় পৌনে আটটা।

দোতলায় চায়ের টেবিলে প্রভাতী চায়ের আসর তখন প্রায় ভাঙার মুখে।

টেবিলের দু পাশে রজত, পুরন্দর চৌধুরী ও সুজাতা বসে এবং শুধু তারাই নয়, গত সন্ধ্যার পরিচিত সেই কালো কাচের চশমা চোখে স্যুটপরিহিত যুবক সুন্দরলালও উপস্থিত।

প্রশান্ত বসাক ঘরে প্রবেশ করতে দেখে সকলেই একসঙ্গে তাঁর মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল। এবং কথা বললে পুরন্দর চৌধুরী, এই যে মিঃ বসাক! সকাল বেলাতেই উঠে কোথায় গিয়েছিলেন?

এই একটু মর্নিংওয়াক করতে গিয়েছিলাম। তারপর মিঃ সুন্দরলাল, আপনি কতক্ষণ?

এই আসছি।

সুজাতা ততক্ষণে উঠে চায়ের কেতলিটার গায়ে হাত দিয়ে তার তাপ অনুভব করে বললে, কেতলির চাটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, আপনি চা খান নি, রেবতীকে বলে আসি কিছু গরম চা দিতে প্রশান্তবাবু।

কথাগুলো বলে এগিয়ে যেতে উদ্যত হতেই সুজাতাকে বাধা দিলেন মিঃ বসাক, না না—আপনি ব্যস্ত হবেন না মিস্ রয়। বসুন আপনি।

সুজাতা স্মিতকণ্ঠে বললে, ব্যস্ত নয়, আমিও আর একটু চা খাব।

গতরাত্রের মত আজও ঘরে প্রবেশ করার মুখে প্রশান্ত বসাক লক্ষ্য করেছিলেন, মিঃ সুন্দরলাল ও পুরন্দর চৌধুরী পাশাপাশি একটু যেন ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেই নিম্ন কণ্ঠে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পর কথা বলছিলেন, এবং প্রশান্ত বসাকের কক্ষমধ্যে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা যেন অকস্মাৎ চুপ করে গেলেন।

সুজাতা ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় দু মিনিট চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে, হঠাৎ কি একটা কথা মনে পড়ায় এখুনি আসছি বলে প্রশান্ত বসাকও বের হয়ে এলেন ঘর থেকে; এবং সোজা নিচে চলে গেলেন।

নিচের তলায় প্রহরারত কনস্টেবল মহেশকে নিম্ন অথচ দ্রুত কণ্ঠে কি কতকগুলো নির্দেশ দিয়ে বললেন, যাও এখুনি, বাইরে গেটের পাশে হরিসাধন আছে সাধারণ পোশাকে, যা যা বললাম তাকে বলবে। যেমন যেমন প্রয়োজন বুঝবে সে যেন করে।

ঠিক আছে, আমি এখনি গিয়ে বলে আসছি।

মহেশ বাইরে চলে গেল।

মহেশকে নির্দেশ দিয়ে প্রশান্ত বসাক যেমন ঘুরে সিঁড়ির দিকে দোতলায় উঠবার জন্য পা বাড়াতে যাবেন, আচমকা তাঁর নজরে পড়ল নিচের একখানি ঘরের ভেজান দুই কবাটের সামান্যতম মধ্যবর্তী ফাঁকের মধ্য দিয়ে এক জোড়া শিকারীর চোখের মত জলজলে চোখের দৃষ্টি যেন চকিতে কবাটের অন্তরালে দেখা দিয়েই আত্মগোপন করল।

থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন প্রশান্ত বসাক।

মুহূর্তকাল ভ্রূকুঞ্চিত করে কি যেন ভাবলেন, তারপর সোজা এগিয়ে গেলেন সেই ঈষন্মুক্ত দ্বারপথের দিকে।

হাত দিয়ে ঠেলে কবাট দুটো খুলে ফেললেন, খালি ঘর, ঘরে কেউ নেই।

চিনতে পারলেন করালীর ঘর ওটা। পাশেই পাচক লছমনের ঘর। দু-ঘরের মধ্যবর্তী দরজাটার দিকে এবারে এগিয়ে গেলেন, কিন্তু দরজার কবাট ঠেলতে গিয়ে বুঝলেন ওপাশ থেকে দরজা বন্ধ। বের হয়ে এলেন করালীর ঘর থেকে প্রশান্ত বসাক। বারান্দা দিয়ে গিয়ে লছমনের ঘরের সামনের দরজা ঠেলতেই ঘরের দরজাটা খুলে গেল। ভিতরে প্রবেশ করলেন। কিন্তু দেখলেন পাচক লছমনের ঘরও খালি। সে ঘরেও কেউ নেই। আরো দেখলেন করালী ও লছমনের ঘরের মধ্যবর্তী দরজার গায়ে সেই ঘর থেকেই খিল তোলা। ঐ ঘরের ঐ মধ্যবর্তী দরজাটি বাদেও আরও দুটি দরজা ছিল। এবং দুই ঘরের মধ্যবর্তী দরজাটি বাদেও অন্য দুটি দরজাই খোলা ছিল।

যার চোখের ক্ষণিক দৃষ্টি ক্ষণপূর্বে মাত্র তিনি পাশের ঘরের উন্মুক্ত দরজা-পথে দেখেছিলেন, সে অনায়াসেই তাহলে এ দ্বিতীয় দরজাটি দিয়ে চলে যেতে পারে।

হঠাৎ ঐ সময় বারান্দার দিকে দ্বিতীয় যে দ্বারটি সেটি খুলে গেল এবং চায়ের কাপ হাতে গুণগুণ করে গান গাইতে গাইতে করালী এসে ঘরে প্রবেশ করেই ঘরের মধ্যে দণ্ডায়মান ইনস্‌পেক্টারকে দেখে যেন থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল, ইনস্‌পেক্টার সাহেব!

হ্যাঁ, তোমার ঘরটা আমি দেখছিলাম করালী।

করালী চা-ভর্তি কাপটা একটা টুলের 'পরে নামিয়ে রেখে সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়াল।

কোথায় ছিলে করালী?

রান্নাঘরে চায়ের জন্য গিয়েছিলাম সাহেব।

রান্নাঘরে আর কে কে আছেন?

লছমন আর নতুন দিদিমণি আছেন।

প্রশান্ত বসাক করালীর সঙ্গে দ্বিতীয় আর কোন কথাবার্তা না বলে

করালী যে পথে ঘরে প্রবেশ করেছিল ক্ষণপূর্বে, সেই খোলা দ্বার দিয়েই বের হয়ে গেলেন। এবং সোজা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলেন।

ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখলেন সুন্দরলাল ঘরে তখন নেই। রজত আর পুরন্দর চৌধুরী বসে বসে গল্প করছেন, আর কেউ ঘরে নেই।

একটু পরেই সুজাতা এসে ঘরে প্রবেশ করল এবং তার পিছনে পিছনেই চায়ের কেতলী নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল রেবতী।

চা পান করতে করতেই সামনাসামনি উপবিষ্ট সুজাতার দিকে তাকিয়ে প্রশান্ত বসাক বলেন, তাহলে আজই আপনি কলকাতায় চলে যাচ্ছেন মিস রয়?

সুজাতা প্রশান্ত বসাকের প্রশ্নে একবার মাত্র তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে মুখটা নামিয়ে নিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললে, তাই ভেবেছিলাম যাব, কিন্তু রজতদা বলছে, দু'চার দিনের মধ্যে ও ফিরে যাবে, সেই সঙ্গেই যাবার জন্যে।

হ্যাঁ, মিঃ বসাক, আমি তাই বলছিলাম সুজাতাকে। যেতে ওকেও হবে, আমাকেও হবে। এদিককার ব্যবস্থাপত্র যাহোক একটা কিছু করে যেতে হবে তো। এবং সেজন্য ওর ও আমার দুজনেরই থাকা প্রয়োজন। আপনি কি বলেন মিঃ বসাক? রজত কথাগুলো বললে।

হ্যাঁ, আপনারাই যখন বিনয়েন্দ্রবাবুর সমস্ত সম্পত্তির ওয়ারিশান তখন—

ইনস্পেক্টারকে বাধা দিল সুজাতা, না, ছোট্‌কার সম্পত্তির এক কপর্দকও আমি স্পর্শ করব না, তা আমি রজতদাকে বলেই দিয়েছি।

হ্যাঁ, সুজাতা তাই বলছিল বটে। কিন্তু মিঃ বসাক, আপনিই বলুন তো তাই কখনও কি হয়। সম্পত্তি ওকেও আমার সঙ্গে সমান ভাগে নিতে হবে বৈকি, কি বলেন?

না, রজতদা, ও আমি স্পর্শও করব না। তুমিই সব নাও।

কিন্তু আমিও বা তোর ন্যায্য সম্পত্তি নিতে যাব কেন? বেশ তো, তোর ভাগ তুই না নিস—যে ভাবে খুশি দান করে যা বা যে কোন একটা ব্যবস্থা করে যা।

বেশ, তাই করে যাব।

এমন সময় প্রতুলবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন।

এই যে প্রতুলবাবু, আসুন। রজত আহ্বান জানাল প্রতুলবাবুকে।

প্রতুলবাবু এগিয়ে এসে একটা খালি চেয়ারে উপবেশন করলেন।

অ্যাটর্নী চট্টরাজকে একবার আজ আসবার জন্য আপনাকে খবর দিতে হবে প্রতুলবাবু। রজত বলে।

প্রতুলবাবু ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে রজতের মুখের দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাকালেন। প্রতুলবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রজত কথাটার আবার পুনরাবৃত্তি করে, ছোট্‌কার অ্যাটর্নী চট্টরাজকে কাল কোন এক সময় আসবার জন্য একটা সংবাদ দেবেন। তাছাড়া, আমিও আর এখানে অনির্দিষ্ট কাল বসে থাকতে পারব না। লাহোরে আমাকে ফিরে যেতে হবে।

প্রতুলবাবু যেন এতক্ষণে ব্যাপারটা কিছু যাহোক বুঝতে পারেন। বললেন, এবাড়িতে তাহলে আপনারা কেউই থাকবেন না রজতবাবু?

কে থাকবে এই চক্রবর্তীদের ভূতুড়ে নীলকুঠিতে বলুন। শেষকালে কি চক্রবর্তীদের প্রেতাত্মার হাতে বেঘোরে প্রাণটা দেব!

তাহলে এবাড়িটার কী ব্যবস্থা হবে?

আপনি রইলেন, বেচে দেবার চেষ্টা করবেন।

কিন্তু আমি তো আর চাকরি করব না রজতবাবু। মৃদু শান্ত কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দিলেন প্রতুলবাবু।

তার মানে, চাকরি ছেড়ে দেবেন?

হ্যাঁ। তাছাড়া, এসব বাড়িঘর-দোর সব যখন আপনারা বেচেই দেবেন তখন আর আমার প্রয়োজনই বা কি! চক্রবর্তী মশাইয়ের মৃত্যুর পর থেকেই এক প্রকার আমার কোন কাজকর্ম ছিল না। তবু চক্রবর্তী মশাই মরবার আগে বিশেষ করে অনুরোধ করে গিয়েছিলেন, বিনয়েন্দ্র-বাবুকে যেন একলা ফেলে আমি না চলে যাই। তাই ছিলাম। তা এখন সে প্রয়োজনও ফুরিয়েছে।

হঠাৎ এমন সময় সুজাতা কথা বলে, এক কাজ করলে হয় না রজতদা?

কী?

ছোট্‌কার ঐ ল্যাব্রোটারীটা প্রাণের চাইতেও প্রিয় ছিল। সমস্ত নীলকুঠিটাকেই একটা গবেষণাগারে পরিণত করে দুঃস্থ বৈজ্ঞানিকদের এখানে গবেষণার একটা ব্যবস্থা করে দিলে হয় না?

কিন্তু আমার তো মনে হয়—

রজতকে বাধা দিয়ে সুজাতা বলে, অবিশ্যি আমি আমার অংশের ব্যবস্থাটা সেই ভাবেই করতে পারি। তবে তুমি—

না না—কথাটা তুই নেহাৎ মন্দ বলিস নি সুজাতা। দেখি ভেবে। হ্যাঁ, প্রতুলবাবু, আপনি যত তাড়াতাড়ি পারেন, কোথায় কার কি দেনা-পাওনা আছে, চাকরবাকরদের মাইনেপত্র কে কি পাবে না পাবে সব একটা হিসাবপত্র করে ফেলুন। যত তাড়াতাড়ি পারি এদিককার সব মিটিয়ে দিয়ে আমাকে একবার লাহোর যেতে হবে।

যে আজ্ঞে। তাই হবে। এখন তাহলে আমি উঠলাম।

প্রতুলবাবু বিদায় নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

॥ ৩৩ ॥

ল্যাব্রোটারী ঘরে একস্‌পেরিমন্ট করবার লম্বা টেবিলের সেল্‌ফেই ফোন ছিল। প্রশান্ত বসাকের সেটা পূর্বেই নজরে পড়েছিল।

ল্যাব্রোটারী ঘরে ঢুকে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে প্রশান্ত বসাক ফোনের রিসিভারটা তুলে নিলেন এবং কিরীটীর ফোন-নম্বরটা চাইলেন একস্‌চেঞ্জে।

একটু পরেই কনেক্‌শন পাওয়া গেল।

হ্যালো! কিরীটী রায় কথা বলছি।

নমস্কার মিঃ রায়। আমি প্রশান্ত বসাক। উত্তরপাড়ার নীলকুঠি থেকে কথা বলছি।

নমস্কার। নীলকুঠিতে ফোন আছে নাকি?

হ্যাঁ।

বেশ। তারপর কি সংবাদ বলুন, any further development?

বসাক তখন ফোনেই সংক্ষেপে অথচ কিছু বাদ না দিয়ে, গত রাত্রে এবাড়িতে ফিরে আসবার পর যা যা ঘটেছে সব একটু একটু করে বলে গেলেন। তারপর বললেন, কোন সঠিক সিদ্ধান্তেই তো এখনও পৌঁছতে পারছি না মিঃ রায়। অথচ এদেরও আর কেমন করে আটকে রাখি বলুন?

ওপাশ থেকে কিরীটীর মৃদু হাসির শব্দ শোনা গেল। সে বললে, নীলকুঠি-রহস্য শেষ ধাপে পৌঁছতে আমার মনে হয় আর খুব বেশী দেরি নেই প্রশান্তবাবু।

কি বলছেন আপনি?

হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। হয়তো বা আজ রাত্রেও আবার সেই ছায়ামূর্তির

আবির্ভাব ঘটতে পারে। আর একান্তই যদি আজ বা কাল না ঘটে, জানবেন দু-চার দিনের মধ্যেই আবির্ভাব তার ঘটবে। কিন্তু তার আগে একটা কথা বলছিলাম—

কী?

সুজাতা দেবী নীলকুঠি থেকে চলে গেলেই ভাল করতেন।

কিরীটীর কথায় প্রশান্ত বসাক যেন অতিমাত্রায় চমকে ওঠেন এবং তার সেই চমকানো গলার স্বরেও ফুটে ওঠে। বলেন কি মিঃ রায়! তবে কি—

হ্যাঁ প্রশান্তবাবু। দিনেরাত্রে সর্বদা সুজাতা দেবীর উপরে তীক্ষ্ণ নজর রাখবেন।

আপনি—আপনি কি তাহলে সত্যি সত্যিই হত্যাকারী কে ধরতে পেরেছেন মিঃ রায়? কিরীটীকে কথাটা আর না জিজ্ঞাসা করে থাকতে পারেন না প্রশান্ত বসাক।

অনুমান করেছি প্রশান্তবাবু।

অনুমান?

হ্যাঁ।

কে? কে তাহলে হত্যাকারী?

মৃদু হাসির একটা শব্দ আবার ভেসে এল এবং সেই সঙ্গে ভেসে এল প্রশ্নোত্তক দুটি কথা: আপনিই বলুন না?

আমি?

হ্যাঁ, আপনি।

কিন্তু আমি তো—

ঠিক এখনও অনুমান করতে পারছেন না। তাই না?

হ্যাঁ, মানে—

শুনুন প্রশান্তবাবু। আপনি ভোলেন নি নিশ্চয়ই, বৈজ্ঞানিক বিনয়েন্দ্রর হত্যা ব্যাপারটা গতকালই আপনাকে বলেছিলাম pre-arranged, pre-meditative and well planned। এবং আমার অনুমান, সেই প্ল্যানের মধ্যে একটি নারী আছে।

নারী?

হ্যাঁ।

You mean তাহলে সেই লতা।

লতা কি পাতা জানি না, তবে একটি নারী এ ব্যাপারের মধ্যে আছে।

তাকে খুঁজে বের করুন, তাহলেই হত্যাকারীকেও সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবেন। আর এও জানবেন, সেই নারী বৈজ্ঞানিক বিনয়েন্দ্রবাবুকে বেশ জোরেই আকর্ষণ করেছিল। জানেন তো—আকর্ষণ মানেই দুর্বলতা। আর দুর্বলতা মানেই—আত্মসমর্পণ। এবং তার পশ্চাতে এসেছে বিষ। আর এ সব কিছুর মূলে বিনয়েন্দ্রবাবুর বিপুল সম্পত্তিও নিশ্চয়ই আছে জানবেন।

কিন্তু সেই নারী ?

চোখ মেলে তাকিয়ে দেখুন। বেশি দূরে নয়, সামনেই হয়তো তিনি আছেন।

সামনেই আছে ?

হ্যাঁ। জানেন, আমাদের বাংলা দেশে এক শ্রেণীর সাপ আছে, যাকে বলা হয় গ্রাম্য ভাষায় লাউডগা সাপ। লাউপাতার সবুজ পত্রের মতই তার গায়ের বর্ণ। এবং সেই কারণেই সাপ যখন লাউ গাছে জড়িয়ে থাকে হঠাৎ বড় একটা চোখে পড়ে না। অথচ সাবধান না হলে দংশন করে।

কিরীটীর শেষের কথায় চকিতে একটা সম্ভাবনা যেন বিদ্যুৎস্ফুরণের মতই প্রশান্ত বসাকের মনের মধ্যে ঝিলমিল করে ওঠে। তবে কি—সঙ্গে সঙ্গেই তারপর প্রায় প্রশান্ত বসাক বলে ওঠেন, বুঝেছি। বুঝেছি আপনার ইঙ্গিত মিঃ রায়। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। আচ্ছা নমস্কার। রিসিভারটা নামিয়ে রেখে প্রশান্ত বসাক কয়েকটা মুহূর্ত মনে মনে কি যেন ভাবলেন। তারপর আবার রিসিভারটা তুলে নিয়ে হেড কোয়ার্টারে কনেক্শন চাইলেন

প্রশান্ত বসাক জিজ্ঞাসা করলেন, যে সংবাদগুলো জানবার জন্য ওয়্যার করতে বলেছিলাম তার জবাব এসেছে কি ?

না, এখনও আসে নি, জবাব এলে—

এলেই আমাকে জানাবেন, এবাড়ির ফোন-নম্বরটা টুকে নিন।

প্রশান্ত বসাক নীলকুঠির ফোন-নম্বরটা দিয়ে দিলেন।

ঐ দিন সমস্ত দ্বিপ্রহরটা মিঃ বসাক তন্ন তন্ন করে ল্যাব্রোটারী ঘরের যাবতীয় সব কিছু নেড়ে-চেড়ে উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগলেন। যদি আর কোন নতুন সূত্র পাওয়া যায়।

ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা ড্রয়ারে আলমারির মধ্যে একটা হাতীর দাঁতের সুদৃশ্য কৌটো পেলেন।

এবং পেলেন একটা নোট-বই। কৌটোটার মধ্যে আট দশটা মুক্তো পাওয়া গেল। বুঝলেন ঐগুলিই সেই সিংগাপুরী মুক্তা। আর কালো

মরোক্কো চামড়ায় বাঁধা ডিমাই সাইজের নোট-বুকটা। নোট-বুকটার প্রায় দুইয়ের তিন অংশ ব্যবহৃত হয়েছে।

নানা ধরণের অঙ্ক, রসায়ন শাস্ত্রের অনধিগম্য অবোধ্য সব ফরমুলা লেখা পাতায় পাতায়।

অন্যমনস্কভাবে নোট-বইয়ের পাতাগুলো উল্টাতে লাগলেন প্রশান্ত বসাক। হঠাৎ শেষের দিকে একটা পাতায় দেখলেন দুর্বোধ্য সব অঙ্কের নিচেই স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লেখা—লতা।

সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ যেন তিনি অত্যন্ত সচেতন হয়ে উঠলেন। অকস্মাৎ তাঁর মনের মধ্যে একটা সরীসৃপ যেন শিরশিরিয়ে উঠেছে।

এবং শুধু লতা শব্দটিই নয়, তার চারিপাশে নানাপ্রকারের বিচিত্র সব কালির আঁকিবুকি কাটা।

আবার পাতা উল্টে চললেন। এবং অন্য আর এক পাতায় দেখলেন লেখা—লতা চলে গেল।

তার নিচে আবার অঙ্ক কষা আছে। আবার পাতা উল্টে চললেন। হঠাৎ আবার শেষের একটা পৃষ্ঠায় নজর আটকে গেল। সেখানে লেখা: লতা কি আর ফিরে কোন দিনই আসবে না! তবে সে কেন এল!

একদৃষ্টে লেখাটার দিকে তাকিয়ে থেকে মনে মনে বার বার লেখাটা পড়তে পড়তে হঠাৎ সম্পূর্ণ অন্য আর একটি কথা মনে পড়ে যায় প্রশান্ত বসাকের।

ভ্রূ দুটো কুঁচকে যায় তাঁর।

যে সম্ভাবনাটা এইমাত্র তাঁর মনে উদয় হয়েছে তার মীমাংসার জন্য তাড়াতাড়ি নোট-বুকটা বন্ধ করে পকেটে পুরে ঘর থেকে বের হয়ে আসেন প্রশান্ত বসাক।

বাইরে বেলা অনেকখানি গড়িয়ে এসেছে। সূর্যের আলো স্তিমিত হয়ে এসেছে।

নিজের নির্দিষ্ট ঘরটার মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন প্রশান্ত বসাক; এবং ঘরে প্রবেশ করে ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

॥ ৩৪ ॥

ঐ দিনই সন্ধ্যার দিকে ডাইনিং হলে সান্ধ্য চা-পানের পর এক সময় প্রশান্ত বসাক তাঁর পকেট থেকে চারখানা কাগজ বের করলেন। চারখানা কাগজেই কি যেন সব লেখা রয়েছে। লেখা কাগজ চারখানি হাতে করে ঘরের মধ্যে উপস্থিত সুজাতা, রজত ও পুরন্দর চৌধুরী ও প্রতুলবাবুকে সম্বোধন করে বললেন, আপনারা প্রত্যেকেই এই কাগজগুলো পড়ে দেখুন। কাগজে আমি বাংলায় আপনাদের প্রত্যেকের জবানবন্দী সংক্ষেপে আলাদা আলাদা করে লিখেছি। পড়ে দেখুন, আপনারা যে যেমন জবানবন্দী দিয়েছেন আমার লেখার সঙ্গে তা মিলছে কিনা।

প্রত্যেকেই যেন একটু বিস্মিত হয়ে যে যার হাতের কাগজখানা চোখের সামনে মেলে ধরে পড়তে শুরু করে।

প্রশান্ত বসাক নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে থাকেন।

খুব সংক্ষিপ্ত জবানবন্দী, পড়তে কারোরই বেশি সময় লাগে না।

পডলেন? কারও জবানবন্দীতে কোন ভুল নেই তো? প্রত্যেকের দিকেই তাকিয়ে আলাদা আলাদা ভাবে প্রশ্নটা করলেন প্রশান্ত বসাক।

না। প্রত্যেকেই জবাব দেয়।

বেশ। এবারে আপনারা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাগজের তলায় বাংলায় বেশ পরিষ্কার স্পষ্টাক্ষরে লিখুন। উপরিউক্ত জবানবন্দীর মধ্যে কোন ভুল নেই এবং পরে তার নিচে আপনারা যে যার নাম দস্তখত করুন।

প্রথমটায় কয়েকটা মুহূর্ত প্রশান্ত বসাকের প্রস্তাবে কেউ কোন জবাব দেয় না। কেবল পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

আমার বক্তব্যটা নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন?

জবাব দিল এবারে প্রথমে রজতই, বললে, হ্যাঁ। কিন্তু এটা বুঝতে পারছি না মিঃ বসাক, এর কি প্রয়োজন ছিল?

সঙ্গে সঙ্গে প্রতুলবাবু জবাব দেন, তাই মিঃ বসাক। আমিও তাই বলতে চাইছিলাম। তাছাড়া আমি তো এখানে আদৌ উপস্থিতই ছিলাম না।

কিন্তু আমার প্রস্তাবে আপনাদের আপত্তি কি থাকতে পারে তাও তো বুঝতে পারছি না প্রতুলবাবু।

আমার ও আমাদের যার যা বলবার ছিল সবই খোলাখুলি ভাবে আপনাদের কাছে বলেছি ইনস্পেক্টার। কথাটা বললে রজত।

অস্বীকার করছি না রজতবাবু সে কথা আমি। এবং পড়েই তো দেখলেন, আপনারা যে যেমন জবানবন্দী আমাদের কাছে দিয়েছেন সেইটুকুই কেবল ঐ কাগজে লিখেছি আমি। তবে আপনাদের আপত্তিটাই বা হচ্ছে কেন? অবিশ্যি you are at liberty—যদি কিছু অন্যরকম লিখে থাকি সে জায়গাটা বরং কেটে ঠিক করে আপনারাই লিখে দিন।

প্রশান্তবাবু তো ঠিকই বলছেন রজতদা। দিন কলম, আমি লিখে সই করে দিচ্ছি। এতক্ষণে সর্বপ্রথম কথা বললে সুজাতা।

প্রশান্ত বসাক সুজাতার দিকে কলমটা এগিয়ে দিলেন।

সুজাতা কোনরূপ আর দ্বিধামাত্রও না করে জবানবন্দীর নিচে নিজের নামটা সই করে কাগজটা এগিয়ে দিল প্রশান্ত বসাকের দিকে, এই নিন।

পুরন্দর চৌধুরী এবার কথা বললেন, আমি যদি ইংরাজীতে লিখি আপত্তি আছে আপনার মিঃ বসাক?

কেন বলুন তো?

দীর্ঘ দিনের অনভ্যাসের ফলে বাংলা আমি বড় একটা আজকাল লিখতে পারি না। তাছাড়া আমার বাংলা হস্তাক্ষরও অত্যন্ত বিশ্রী।

প্রশান্ত বসাক মৃদু হেসে বললেন, তা হোক। বাংলাতেই লিখুন।

অগত্যা পুরন্দর চৌধুরী যেন বেশ একটু অনিচ্ছার সঙ্গেই প্রশান্ত বসাকের নির্দেশ মত কাগজটায় লিখে দিলেন।

এবং রজত ও প্রতুলবাবুও নাম সই করে দিলেন।

প্রত্যেকের লেখা ও সই করা কাগজগুলো অতঃপর আর না দেখেই ভাঁজ করে প্রশান্ত বসাক নিজের জামার বুক পকেটে রেখে দিলেন।

সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পূর্বে এঘরে চা-পানে বসবার সময় যে আবহাওয়াটা ছিল, প্রশান্ত বসাক প্রদত্ত কাগজে নাম সই করবার পর যেন হঠাৎ সে আবহাওয়াটা কেমন থমথমে হয়ে গেল। অচিন্তনীয় একটা পরিস্থিতি যেন হঠাৎ একটা ভারী পাথরের মতই সকলের মনের মধ্যে চেপে বসে। কেউ কোন কথা মুখ ফুটে স্পষ্টাস্পষ্টি বলতে পারছে না, অথচ মনের গুমোট ভাবটাও যেন আর গোপন থাকছে না কারো।

বেশ কিছুক্ষণ ঘরের আবহাওয়াটা যেন একটা বিশ্রী অস্বস্তিতে থমথম করতে থাকে।

সকলেই চুপচাপ। কারো মুখে কোন কথা নেই।

ঘরের অস্বস্তিকর আবহাওয়া যেন প্রত্যেকেরই কেমন শ্বাস রোধ করে আনে।

হঠাৎ সেই স্তব্ধতার মধ্যে কথা বলে ওঠেন পুরন্দর চৌধুরী, আপনার যদি আপত্তি না থাকে তো আমি কালই চলে যেতে চাই মিঃ বসাক।

বেশ। যাবেন। তবে কলকাতায় যেখানেই থাকুন ঠিকানাটা দিয়ে যাবেন যাবার আগে।

কিন্তু কলকাতায় তো আমি থাকবো না মিঃ বসাক। প্লেন পেলে কালই আমি সিংগাপুর চলে যাব।

সিংগাপুর আপনি হেড কোয়ার্টারের পারমিশন ছাড়া যেতে পারবেন না মিঃ চৌধুরী।

কিন্তু সে পারমিশনের জন্য সব কাজকর্ম ফেলে এখনো যদি অনির্দিষ্ট কালের জন্য আমাকে কলকাতায় বসে থাকতে হয়—

পুরন্দর চৌধুরীর কথাটা শেষ হলো না। প্রশান্ত বসাক বললেন, না, আর বড জোর চার পাঁচ দিনের বেশি আপনাকে আটকে রাখা হবে না মিঃ চৌধুরী।

চার পাঁচ দিনের মধ্যেই তাহলে আপনাদের তদন্তের কাজ শেষ হয়ে যাবে বলতে চান মিঃ বসাক? পুরন্দর চৌধুরী প্রশ্ন করলেন।

সেই রকমই তো আশা করা যাচ্ছে। আর শেষ না হলেও আপনাদের কাউকেই আটকে রাখা হবে না।

ভাল।

কথাটা বলে সহসা পুরন্দর চৌধুরী চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘর হতে বের হয়ে গেলেন।

রজত প্রতুলবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, প্রতুলবাবু, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল, আপনি একবার নিচে আসবেন কি?

চলুন।

প্রতুলবাবু ও রজতবাবু ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

ঘরের মধ্যে কেবল রইলেন প্রশান্ত বসাক ও সুজাতা। টেবিলের দুধারে দুজনে পরস্পরের মুখোমুখি বসে।

হঠাৎ প্রশান্ত বসাকের কণ্ঠস্বরে যেন চমকে মুখ তুলে তাকাল সুজাতা তার দিকে।

একটা কথা বলছিলাম সুজাতা দেবী।

আমাকে বলছেন ?

হ্যাঁ।

বলুন।

যদি কিছু মনে না করেন তো কথাটা বলি। প্রশান্ত বসাক যেন ইতস্ততঃ করেন।

বলুন না।

আপনি আজই কলকাতাতেই চলে যান বরং—

কেন বলুন তো? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল সুজাতা প্রশ্নটা করে প্রশান্ত বসাকের মুখের দিকে।

তাছাড়া প্রথমে আপনি তো যেতেও চাইছিলেন।

কিন্তু তখন তো আপনিই যেতে দিতে চান নি।

না চাই নি। কিন্তু এখন নিজে থেকেই আপনাকে চলে যাবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি মিস্ রয়।

মৃদু স্মিতকণ্ঠে সুজাতা বলে, কেন বলুন তো ?

নাইবা শুনলেন এখন কারণটা।

বেশ। তবে আজ নয়, কাল সকালেই চলে যাবো।

কাল।

হ্যাঁ।

কি ভেবে প্রশান্ত বসাক বললেন, বেশ, তাই যাবেন।

তারপর আরো কিছুক্ষণ বসে দুজনে কথা বলেন।

॥ ৩৫ ॥

ঐ দিন রাত্রে।

কিরীটী ফোনে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিল, চব্বিশ ঘণ্টাও উত্তীর্ণ হলো না, তা সত্যি হয়ে গেল।

সে রাত্রে সকলের খাওয়া-দাওয়া চুকতে প্রায় এগারটা হয়ে গেল: এবং খাওয়াদাওয়ার পর রাত সোয়া এগারটা নাগাদ যে যার নির্দিষ্ট ঘরে শুতে গেল।

প্রশান্ত বসাক তাঁর নির্দিষ্ট ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে ঘরের দরজার ভিতর থেকে খিল তুলে দিয়ে বাগানের দিককার খোলা জানালাটার সামনে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে ধূমপান করছিলেন একটা সিগ্রেট ধরিয়ে।

কিন্তু দুটি শ্রবণেন্দ্রিয়ই তাঁর সজাগ হয়েছিল একটি সাঙ্কেতিক শব্দের প্রত্যাশায়।

ঠিক আধঘণ্টা 'পরে তার ঘর ও পাশের ঘরের মধ্যবর্তী দরজার গায়ে টুক্ টুক্ করে দুটি মৃদু টোকা পড়ল।

মুহূর্তে এগিয়ে গিয়ে দুই ঘরের মধ্যবর্তী দরজাটা খুলে দিতেই অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মত একজন নিঃশব্দে এসে ঘরে প্রবেশ করল।

এসেছেন! মৃদু কণ্ঠে শুধালেন প্রশান্ত বসাক।

হ্যাঁ।

আপনার ঘর থেকে যখন বের হন কেউ আপনাকে দেখে নি তো? দেখে নি তো কেউ আপনাকে ল্যাব্রোটারী ঘরে ঢুকতে?

না।

তাহলে এবারে আপনি নিশ্চিন্তে গিয়ে ঐ বিছানাটার 'পরে শুয়ে পড়ুন।

শুয়ে পড়ব?

হ্যাঁ। শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমান।

প্রশ্নোত্তর পাওয়া যায় না।

কি হল?

কিন্তু—

কিন্তু কি!

আপনি—

আমি! আজ রাত্রে আমার ঘুমের আশা আর কোথায়?

কেন?

একজন সম্ভবতঃ আসবেন, তাঁকে রিসিভ করতে হবে।

এত রাত্রে আবার কে আসবে!

কে আসবেন তা জানি না, তবে আশা করছি একজনকে। অবিশ্যি ভাবছি, হয়তো নাও আসতে পারেন আজ।

তবে মিথ্যে মিথ্যে জেগে থাকবেন কেন? আসবার যখন তাঁর কোন স্থিরতা নেই।

তাই তো জেগে থাকতে হবে। মহৎ ব্যক্তিবিশেষ আসছেন, অভ্যর্থনার জন্য না জেগে বসে থাকলে চলবেই বা কেন!

তা রেবতী বা দারোয়ানকে বলে রাখলেই তো পারতেন, তিনি এলে তখন আপনাকে খবর দিত।

মৃদু হাসির সঙ্গে প্রশান্ত বসাক বলেন, সোজা রাস্তা দিয়ে জনান্তিকে তিনি আসবেন না বলেই তো এত হাঙ্গামা।

কি আপনি বলছেন!

ঠিক তাই সুজাতা দেবী। তাই তো আপনাকে পূর্বাহ্নেই এঘরে এসে শোবার জন্য বলেছিলাম।

কিন্তু আমার সঙ্গে তাঁর আসবার কি সম্পর্ক?

সেইজন্যই তো এত সাবধানতা, এত সব আয়োজন। বিশেষ করে আপনি জানেন না, কিন্তু তিনি আপনারই জন্য আসবেন আমার ধারণা।

এ সব কি আপনি বলছেন বলুন তো প্রশান্তবাবু?

ভাবছেন হয়তো এই মাঝরাত্রে আপনাকে এ ঘরে ডেকে এনে আরব্য উপন্যাস শোনাতে শুরু করলাম, তাই না সুজাতা দেবী? বলতে বলতে আচম্‌কা যেন কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন, কিন্তু আর না, এবারে আপনি শুয়ে ঘুমাবার চেষ্টা করুন, আমাকে একটু বাইরে যেতে হবে—

বাইরে এত রাত্রে!

হ্যাঁ, বেশী দূরে নয়, আপনার আজ রাত্রের পরিত্যক্ত শূন্য ঘরে। নিন, আপনি শুয়ে পড়ুন তো।

আমি আপনার সঙ্গে যাব।

কোথায়?

কেন, আমার ঘরে। এখন বুঝতে পারছি, আমার ঘরে আজ রাত্রে কিছু ঘটবে। আপনি জানেন, আর সেইজন্যই আমার বিছানার 'পরে পাশ বালিশটা চাদর দিয়ে ঢেকে রেখে আমাকে এ ঘরে চলে আসতে বলেছিলেন।

হ্যাঁ, তাই সুজাতা দেবী। কিন্তু আপনি—আপনি জানেন না বা বুঝতে পারছেন না হয়তো সেখানে যাওয়া আপনার এখন খুব বিপজ্জনক, risky!

তা হোক, তবু আপনার সঙ্গে আমি যাব।

কিন্তু সুজাতা দেবী—

বললাম তো। যাব। সুজাতার কণ্ঠস্বরে একটা অদ্ভুত দৃঢ়তা।

কিন্তু আপনি! আপনি আমার সঙ্গে না গেলেই হয়তো ভাল করতেন সুজাতা দেবী।

ভাল-মন্দ বুঝি না। আমি যাব।

কয়েক মুহূর্ত প্রশান্ত বসাক কি যেন ভাবলেন, তারপর মৃদু নিস্পৃহ কণ্ঠে বললেন, বেশ, তবে চলুন।

প্রথমে প্রশান্ত বসাক দরজা খুলে বাইরের অন্ধকার বারান্দায় একবার উঁকি দিয়ে দেখে নিলেন বারান্দার এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত, শূন্য খাঁ খাঁ করছে।

পা টিপে টিপে প্রথমে প্রশান্ত বসাক তারপর বের হলেন ঘর থেকে এবং তাঁর পশ্চাতে অনুসরণ করল তাঁকে সুজাতা। এদিকে ওদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে দুজনে সুজাতার ঘরের দিকে এগিয়ে চললেন।

ঘরের দরজাটা সুজাতা খুলেই রেখে এসেছিল। কেবলমাত্র দরজার কবাট দুটো ভেজান ছিল প্রশান্ত বসাকের পূর্ব-নির্দেশ মত।

ভেজান দরজার গায়ে কান পেতে কি যেন শোনবার চেষ্টা করলেন মিঃ বসাক: তারপর ধীরে ধীরে নিঃশব্দে ভেজান কবাট দুটি ফাঁক করে প্রথমে ঘরের মধ্যে নিজে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর পশ্চাতে প্রবেশ করে সুজাতা। তারপর দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

প্রথমটায় অন্ধকারে কিছুই বোঝা যায় না। ক্রমে একটু একটু করে ঘরের অন্ধকারটা যেন উভয়ের চোখেই সয়ে আসে।

বাগানের দিককার খোলা জানালা বরাবর খাটের উপরে বিস্তৃত শয্যায় অস্পষ্ট মনে হয় কে যেন চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে।

গায়ে হাত দিয়ে স্পর্শের ইঙ্গিতে মিঃ বসাক সুজাতাকে নিয়ে গিয়ে ঘরের সংলগ্ন যে বাথরুম তার মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলেন।

চাপা সতর্ক কণ্ঠে সুজাতা প্রশ্ন করে, বাথরুমের মধ্যে এলেন কেন?

চুপ। এখানেই আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

বাথরুমের মধ্যে প্রবেশ করে বাথরুমের ঈষদুন্মুক্ত দরজাপথে তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকেন ঘরের ভিতরে প্রশান্ত বসাক।

সময় যেন আর কাটতে চায় না। ভারী পাথরের মত যেন সমস্ত অনুভূতির উপরে চেপে বসেছে সময়ের মুহূর্তগুলো। যেন অত্যন্ত শ্লথ ও প্রলম্বিত মুহূর্তগুলি মনে হয়।

তবু এক সময় মিনিটে মিনিটে প্রায় তিন কোয়ার্টার সময় অতিবাহিত হয়ে যায়।

সুজাতার পা দুটো যেন টন্ টন্ করছে।

রেডিয়াম ডায়েলযুক্ত দামী হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে প্রশান্ত বসাক দেখলেন, রাত প্রায় পৌনে একটা। নাঃ! আজ রাতে বোধ হয় এলো না।

কিন্তু মিঃ বসাকের চাপা কণ্ঠে উচ্চারিত কথাটা শেষ হল না। ইতিমধ্যে

আকাশে বোধ হয় চাঁদ দেখা দিয়েছিল, সামান্য চাঁদের আলো বাগানের দিককার খোলা জানালা পথে ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করেছিল।

খুট করে একটা যেন অস্পষ্ট শব্দ শোনা গেল।

এবং তারপরই প্রশান্ত বসাক দেখলেন কে একজন জানালা পথে মাথা তুলে ঘরের ভিতর উঁকি দিচ্ছে।

এসেছে। অনুমান তাহলে তাঁর মিথ্যা হয় নি।

অস্বাভাবিক একটা উত্তেজনার ঢেউ যেন মুহূর্তে মিঃ বসাকের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও অনুভূতির উপর দিয়ে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের মতই প্রবাহিত হয়ে যায়।

জানালা পথে ওদিকে ততক্ষণে মাথার সঙ্গে সঙ্গে দেহের ঊর্ধ্বাংশও স্পষ্ট হয়ে ওঠে মিঃ বসাকের চোখের সামনে। জানালা পথেই ছায়ামূর্তি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে পায়ে পায়ে শয্যার দিকে। শয্যার একেবারে কাছটিতে দাঁড়াল।

হঠাৎ চমকে উঠলেন মিঃ বসাক।

খোলা জানালায় আর একখানি মুখ দেখা গেল। এবং বিড়ালের মতই নিঃশব্দে দ্বিতীয় ছায়ামূর্তিও ঘরে প্রবেশ করল প্রায় প্রথম ছায়ামূর্তির পিছনে পিছনেই।

কিন্তু যত নিঃশব্দেই দ্বিতীয় ছায়ামূর্তি ঘরে প্রবেশ করুক না কেন, প্রথম ছায়ামূর্তি বোধ হয় সেই ক্ষীণতম শব্দটুকুও শুনতে পেয়েছিল।

চকিতে প্রথম ছায়ামূর্তিও ঘুরে দাঁড়াল।

প্রথম ছায়ামূর্তি ঘুরে দাঁড়াবার আগেই দ্বিতীয় ছায়ামূর্তি হাত বাড়িয়ে দেওয়ালের গায়ে আলোর সুইচটা টিপে দিয়েছিল। খুট করে একটা শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের বৈদ্যুতিক আলোটা জ্বলে ওঠে।

হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে সমস্ত কক্ষটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

ঠিক সেই মুহূর্তে বাথরুমের দরজা খুলে ঘরের মধ্যে পা দিয়েই বজ্রকঠিন কণ্ঠে মিঃ বসাক বলে উঠলেন, মিঃ চৌধুরী!

ঘরের মধ্যে যেন অকস্মাৎ বজ্রপাত হল।

বিদ্যুৎ চমকের মতই যুগপৎ দুই ছায়ামূর্তিই ঘুরে দাঁড়ায়।

কৌতূহলী সুজাতাও ইতিমধ্যে প্রায় মিঃ বসাকের সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। সে দেখল মিঃ বসাকের উদ্যত পিস্তলের সামনে

সামান্য দূরের ব্যবধানে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে পুরন্দর চৌধুরী ও সুন্দরলাল। উভয়ের চোখেই হতভম্ব বোবা দৃষ্টি।

উদ্যত পিস্তল হাতে ওঁদের প্রতি দৃষ্টি রেখেই সুজাতাকে সম্বোধন করে মিঃ বসাক বললেন, সুজাতা দেবী, নিচে রামানন্দবাবু অপেক্ষা করছেন, তাঁকে ডেকে আনুন।

॥ ৩৬ ॥

থানা-ইনচার্জ রামানন্দ সেন ঘরে এসে প্রবেশ করতেই মিঃ বসাক তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, এঁদের গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করুন মিঃ সেন, এঁরাই বিনয়েন্দ্র রায় ও রামচরণের যুগ্ম হত্যাকারী।

রামানন্দ সেন বারেকের জন্য তাঁর সম্মুখে তখনো প্রস্তর মূর্তিবৎ দণ্ডায়মান পুরন্দর চৌধুরী ও সুন্দরলালের দিকে তাকিয়ে বললেন, এঁদের মধ্যে একজনকে তো চিনতে পারছি মিঃ বসাক কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তিটিকে তো ঠিক এখনও চিনতে পারছি না। দ্বিতীয় ঐ মহাশয় ব্যক্তিটি কে?

মৃদু হাসলেন মিঃ বসাক রামানন্দ সেনের কথায়। তারপর স্মিত কৌতুক ভরা কণ্ঠে বললেন, ভদ্রমহাশয় ব্যক্তি অর্থাৎ পুরুষ উনি নন, উনি ভদ্রমহিলা মিঃ সেন।

পুরুষ নন, মহিলা! বিস্মিত কণ্ঠ হতে উচ্চারিত হয় কথাটা রামানন্দ সেনের।

এবং শুধু রামানন্দ সেনই নন। ঘরের মধ্যে ঐ সময় উপস্থিত সুজাতা মিঃ বসাকের কথায় কম বিস্মিত হয় না।

সে বলে ওঠে, কি বলছেন প্রশান্তবাবু!

ঠিকই বলেছি আমি মিস্ রয়। ওষ্ঠের উপরে চিকন ঐ গোঁফটি আসল নয়, মেকী, মাথার শিরস্ত্রাণ ঐ রেশমী পাগড়ি ওটিও আংশিক ছদ্মবেশ মাত্র। ওর নীচে রয়েছে বেণীবদ্ধ কেশ। চশমার কালো কাচের অন্তরালে রয়েছে দুটি নারীর চক্ষু।

কথাগুলো বলতে বলতেই ঘুরে দাঁড়ালেন মিঃ বসাক সুন্দরলালের দিকে এবং বললেন, উনি শ্রীমতী লতা দেবী।

আবার রামানন্দ সেন ও সুজাতা দুজনেই যুগপৎ চমকে মিঃ বসাকের দিকে তাকান।

কী বললেন? লতা দেবী।

কিন্তু যাকে সম্বোধন করে কথাগুলি মিঃ বসাক ক্ষণপূর্বে বললেন তিনি কিন্তু নির্বাক। পাষাণপুত্তলিকাবৎ নিশ্চল।

মিঃ বসাক পুনরায় বলে উঠলেন, এত তাড়াতাড়ি অবিশ্যি প্রথম দিনের দর্শনেই আপনার চেহারায়, কণ্ঠস্বরে ও হাতের আঙুলে, আমার সন্দেহ হলেও আপনি যে সত্যি সত্যিই পুরুষ নন নারী এই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারতাম না। যদি না আজই দ্বিপ্রহরে কিরীটীর সংকেত আপনার প্রতি আমাকে বিশেষভাবেই সজাগ করে দিত। তা সত্ত্বেও আমি বলব মিস্ সিং, আপনার ছদ্মবেশধারণ অপূর্ব নিখুঁত হয়েছিল।

একেবারে সামনাসামনি ও খোলাখুলি ভাবে চ্যালেঞ্জড্ হলেও ছদ্মবেশী লতা দেবী পাষাণপুত্তলিকার মতই এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ যেন পরমুহূর্তেই পাথরের মত দণ্ডায়মান লতা দেবীকে তাঁর প্যাণ্টের পকেটে ডান হাতটা প্রবেশ করতে উদ্যত দেখেই চকিতে পিস্তল সমেত নিজের হাতটা উদ্যত করে মিঃ বসাক কঠিন কণ্ঠে বলে উঠলেন, no—no—সে চান্স আপনাকে আমি দেব না। মিস্ সিং, প্যাণ্টের পকেট থেকে হাত সরান। সরান—Yes—হ্যাঁ, এতদিন ধরে এমন নৃশংস খেলা খেললেন, তারপরেও শেষটায় আপনারই জিতে আমাদের মাত করে দিয়ে যাবেন, তাই কি হয়! বলতে বলতে মিঃ রামানন্দ সেনের দিকে তাকিয়ে মিঃ বসাক এবারে বললেন, মিঃ সেন, শ্রীমতী সিংএর বডিটা সার্চ করুন। চৌধুরী সাহেবকেও বাদ দেবেন না যেন।

দ্বিধামাত্র না করে রামানন্দ সেন ইনস্‌পেক্টারের নির্দেশমত এগিয়ে গেলেন এবং লতা সিংয়ের বডি সার্চ করতেই তাঁর প্যাণ্টের পকেট থেকে বের হয়ে এল একটি মোটা কলমের মত বস্তু এবং শুধু তাই নয়, ছোট অটোমেটিক পিস্তলও একটি পাওয়া গেল।

আর পুরন্দর চৌধুরীর বডি সার্চ করে পাওয়া গেল একটি চমৎকার ভাবে কাপড়ে মোড়া একহাত পরিমাণ কালো প্লাষ্টিকের তৈরী রড ও একটি অটোমেটিক পিস্তল।

প্লাষ্টিকের রডটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে রামানন্দ দেখছিলেন। হঠাৎ সেদিকে নজর পড়ায় মিঃ বসাক বলে উঠলেন, সাবধান মিঃ সেন ওটা যা ভাবছেন বোধ হয় তা নয়, নিছক একটি প্লাষ্টিকের তৈরী রড নয়। আর আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে তো খুব সম্ভবত ওটা একটা স্প্রেয়িং অ্যাপারেটাস্। এবং ওর ভিতরে আছে তীব্র কালকূট,—স্নেক ভেনম্।

কী বলছেন আপনি মিঃ বসাক!

ঠিকই বলছি বোধ হয়। দিন তো বস্তুটি আমার হাতে।

এগিয়ে দিলেন রামানন্দ সেন বস্তুটি ইনস্পেক্টারের হাতে। বসাক প্লাষ্টিকের রডটি একটু পরীক্ষা করতেই দেখতে পেলেন, তার একদিকে রয়েছে কলমের ক্যাপের মত একটি ক্যাপ। এবং সেই ক্যাপটি খুলতেই দেখা গেল তার মাথার দিকটা যেমন সরু হয়ে আসে তেমনি তারও মাথার দিকটা ক্রমশঃ সরু হয়ে এসেছে এবং সেই সরু অগ্রভাগে বিন্দু পরিমাণ একটি ছিদ্র। আরও ভাল করে পরীক্ষা করতে দেখা গেল বড়টির অন্যদিকে একটি ক্ষুদ্র স্প্রিংও আছে। সেই স্প্রিংটা টিপতেই পিচকারীর মত কি খানিকটা গাঢ় তরল পদার্থ ছিটকে বের হয়ে এল।

প্রশান্ত বসাক এবারে বললেন, হ্যাঁ, যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। দেখলেন তো। এখন বোধ হয় বুঝতে পারছেন এই বিশেষ যন্ত্রটির সাহায্যেই হতভাগ্য বিনয়েন্দ্রবাবুকে সে রাত্রে এবং পরশু রাত্রে হতভাগ্য রামচরণকে হত্যা করা হয়।

উঃ, কি সাংঘাতিক! রামানন্দ সেন বলেন আত্মগতভাবে।

হ্যাঁ, সাংঘাতিকই বটে। এবং অবিশ্বাস্য ব্যাপারও বটে। প্রশান্ত বসাক আবার বললেন। তারপর একটু থেমে আবার শুরু করলেন, যে বিজ্ঞান মানুষের সমাজজীবনে এনেছে প্রভূত কল্যাণ, যে বিজ্ঞানবুদ্ধি ও আবিষ্কার যুগে যুগে সমাজ-জীবনের পথকে নব নব সাফল্যের দিকে এগিয়ে দিয়েছে, সেই বিজ্ঞান-প্রতিভাই বিকৃত পথ ধরেই এনেছে অমঙ্গল—সর্বনাশা ধ্বংস। লতা দেবী ও মিঃ চৌধুরী দুজনাই অপূর্ব বৈজ্ঞানিক প্রতিভা নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু বিকৃত বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন হয়ে ওঁদের উভয়ের মিলিত প্রতিভা মঙ্গল ও সুন্দরের পথকে খুঁজে পেলে না। ফলে ওঁরা নিজেরাও ব্যর্থ হল, ওঁদের প্রতিভাও ব্যর্থ হল।

ওদিকে রাত প্রায় ভোর হয়ে এসেছিল।

ঘরের জানালাপথে প্রথম আলোর আবছা আভাস এসে উঁকি দেয়।

লতা ও পুরন্দর চৌধুরীকে আপাততঃ আলাদা আলাদা করে দুজনকেই পুলিশের হেপাজতে রেখে সকলে নিচে ঘরে নেমে এলেন।

সংবাদ পেয়ে রজতও এসে ওঁদের সঙ্গে যোগ দিল।

প্রশান্ত বসাকের নির্দেশমত ড্রাইভার করালীকেও পূর্বাহ্নেই অ্যারেষ্ট করা হয়েছিল।

সুজাতা, রজত ও রামানন্দ সেন সকলেই উদ্‌গ্রীব পুরোপুরি সমগ্র রহস্যটা জানবার জন্য। কী ভাবে বিনয়েন্দ্র ও রামচরণ নিহত হল, আর কেনই বা হল।

মিঃ বসাক বলতে লাগলেন তখন সেই কাহিনী।

॥ ৩৭ ॥

কিরীটী আমাকে সব শুনে বলেছিল এই হত্যা-রহস্যের মধ্যে কোন একটি নারী আছে। কিরীটীর কথা শুনে সমগ্র ঘটনা পুনর্বার আমি আদ্যপান্ত মনে মনে বিশ্লেষণ করি। এবং তখনই আমার মনে পড়ে বিনয়েন্দ্র নিহত হবার কিছুদিন পূর্বেই এই নীলকুঠিতে এক রহস্যময়ী নারীর আবির্ভাব ঘটেছিল। এবং যে নারী অকস্মাৎ যেমন এখানে এসে একদিন উদয় হয়েছিল তেমনি অকস্মাৎই আবার একদিন দৃষ্টির অন্তরালে আত্মগোপন করে। রামচরণের মুখেই আমি জানতে পারি যে, তার নাম লতা। বলাই বাহুল্য, আমার মন তখন সেই অন্তরালবর্তিনী লতার প্রতিই আকৃষ্ট হয়। এখন অবিশ্যি স্পষ্টই বুঝতে পারছি, সুন্দরলালের ছদ্মবেশের অন্তরালেই ছিল সেই লতা এবং সেই সঙ্গে এও বুঝতে পারছি, ওই লতা বিনয়েন্দ্র ও পুরন্দর চৌধুরী উভয়েরই যথেষ্ট পরিচিত ছিল; যেহেতু প্রথমতঃ ল্যাব্রোটারী-অ্যাসিস্টেণ্টরূপে সমস্ত প্রার্থীর মধ্যে লতাকেই যখন বিনয়েন্দ্র মনোনীত করেছিলেন তখন লতার প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব প্রমাণ হয়েছে ও সেই সঙ্গে প্রমাণ হয়েছে লতা তাঁর মনের অনেকখানিই অধিকার করেছিল। তার আরো প্রমাণ—লতা নামটি আমি বিনয়েন্দ্রর নোটবুকের বহু পাতাতেই পেয়েছি। এখন কথা হচ্ছে লতা, বিনয়েন্দ্র ও পুরন্দর চৌধুরী এই ট্রায়োর পরিচয় পরস্পরের সঙ্গে কতদিন ধরে। গোলমালটা অবিশ্যি গড়ে উঠেছে দুটি পুরুষ বন্ধুর মধ্যে ঐ মধ্যবর্তিনী নারীকেই কেন্দ্র করে। কিন্তু হত্যার কারণটা কি একমাত্র তাই, না আরো কিছু? এই তথ্যটি অবিশ্যি এখন আমাকে আবিষ্কার করতে হবে। তবে বিনয়েন্দ্র রামচরণকে হত্যা করা হয়েছিল কিভাবে সেটা এখন আমি স্পষ্টই অনুমান করতে পারছি। এবং সেই অনুমানের পরেই আমার মনে হচ্ছে সে রাত্রে

যখন বিনয়েন্দ্র তাঁর গবেষণাগারে নিজের কাজে ব্যস্ত তখন হয়তো লতা এসে দরজায় টোকা দেয়। দরজা খুলে লতাকে দেখতে পেয়ে অত রাত্রে নিশ্চয়ই, প্রথমটায় বিনয়েন্দ্র বিস্মিত হন। এবং খুব সম্ভব লতার সঙ্গে যখন বিনয়েন্দ্র কথা বলছেন সেই সময় তাঁর অলক্ষ্যে এক ফাঁকে সেই ঘরে প্রবেশ করে পশ্চাৎ দিক হতে এসে অতর্কিতে কোন কিছু ভারী বস্তুর সাহায্যে পুরন্দর চৌধুরী বিনয়েন্দ্রকে তাঁর ঘাড়ে আঘাত করেন। যার ফলে বিনয়েন্দ্র পড়ে যান ও পড়ে যাবার সময় ধাক্কা লেগে বা কোন কারণে টেবিল থেকে আরও দু একটা কাচের যন্ত্রপাতির সঙ্গে বোধ হয় ঘড়িটা মাটিতে ছিটকে পড়ে ভেঙে যায়। কিন্তু এর মধ্যেও কথা আছে, ঐ ভাবে মাথায় বা ঘাড়ে অতর্কিতে একটা আঘাত হেনেই তো হতভাগ্য বিনয়েন্দ্রকে হত্যা করা যেত। তবে কেন আবার ভয়ঙ্কর মৃত্যুগরল সর্পবিষ প্রয়োগ করা হল তার শরীরে ? আর একাকী পুরন্দর চৌধুরীই তো তার বন্ধুকে হত্যা করতে পারত; তবে লতার সহযোগিতার প্রয়োজন হল কেন ? মনে হয় আমার, প্রথমতঃ তার কারণ ব্যাপারটাকে আত্মহত্যার রূপ দেবার জন্যই ঐ ভাবে পিছন থেকে অতর্কিতে বিনয়েন্দ্রকে আঘাত হেনে প্রথমে কাবু করা হয়েছিল এবং এমন ভাবে সেই ভারী বস্তুটি কাপড় মুড়ে নেওয়া হয়েছিল যাতে করে সেই ভারী বস্তুটির আঘাতটা তার কাজ করবে, কিন্তু চিহ্ন রাখবে না দেহে। দ্বিতীয়তঃ, আঘাত হেনে অজ্ঞান করে নিতে পারলে পরে বিষ প্রয়োগ করবার সুবিধা হবে। এবং লতার সহযোগিতার প্রয়োজনও হয়েছিল; আমার মনে হয়, এই জন্যই অন্যথায় অত রাত্রে বিনয়েন্দ্রর গবেষণা-ঘরে পুরন্দর চৌধুরীর প্রবেশ সম্ভবপর ছিল না একা একা। এবং কোনমতে পুরন্দর চৌধুরী একা প্রবেশ করলেও হঠাৎ অমন করে পশ্চাৎ দিক থেকে আঘাত করবার সুযোগ পেত না, যেটা সহজ হয়ে গিয়েছিল উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টায় ও সহযোগিতায়। এবং লতাকে প্রথমে ঘরে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তার সঙ্গে বিনয়েন্দ্রকে কথাবার্তার মধ্যে অন্যমনস্ক রেখে সেই ফাঁকে একসময় পশ্চাৎ দিক হতে গিয়ে পরম নিশ্চিন্তে বিনয়েন্দ্রকে আঘাত করা পুরন্দর চৌধুরীর পক্ষে ঢের বেশী সহজসাধ্য ছিল। যা হোক. আমার অনুমান ঐ ভাবেই বিনয়েন্দ্রকে অজ্ঞান করে পরে সাক্ষাৎ মারণ-অস্ত্র ঐ বিশেষ অ্যাপারেটাসটির সাহায্যেই মুখের মধ্যে সর্প-বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করা হয়। ঐ বস্তুটি জোর করে মুখে প্রবেশ করাবার চিহ্নও ছিল ওষ্ঠে, যা থেকে মৃতদেহ পরীক্ষা করেই মনে আমার সন্দেহ জাগায়। এবং পরে

সমগ্র ব্যাপারটাকে হত্যা নয়,—আত্মহত্যা এই রূপ দিয়ে হত্যাকারী আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে। তারপর পরে মৃতদেহের পাশে একটা বিকারে কিছু সর্প-বিষ রেখে দেয় আত্মহত্যার প্রমাণস্বরূপ।

কিন্তু কথা হচ্ছে ঐভাবে বিশেষ অ্যাপারেটাসের সাহায্যে দেহের মধ্যে বিষ-প্রয়োগ না করে সাধারণ ভাবেও তো গলায় বিষ ঢেলে কাজ শেষ করা যেতে পারত। তার জবাবে আমার মনে হয়, অজ্ঞান অবস্থায় বিষ গলায় ঢেলে দিলেও যদি তার খুব বেশী অংশ পেটের মধ্যে না যায় তো কাজ হবে না, অথচ অজ্ঞান অবস্থায় খুব বেশী বিষও ভিতরে প্রবেশ করান কষ্টসাধ্য হবে। এবং সম্ভবতঃ সেইটাই ছিল কারণ। দ্বিতীয় কারণ, এমন অভিনব একটা পথ নেওয়া হয়েছিল যাতে করে কারো মনে কোনরূপ সন্দেহই না জাগে। এখন কথা হচ্ছে, বিশেষ করে সর্প-বিষই কেন হত্যাকারী বেছে নিয়েছিল বিনয়েন্দ্রকে হত্যা করবার যন্ত্রস্বরূপ? তার উত্তরে বলব, বিনয়েন্দ্র সর্প-বিষের নেশায় অভ্যস্ত ছিল। যাতে তার দেহে বিষ পেলেও পুরন্দরের কাহিনী শুনে লোকে মনে করত, হয় বিনয়েন্দ্র আত্মহত্যা করেছে না হয় বেশী খেয়ে সর্প-বিষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে. আর যে বিষে সে অভ্যস্ত ছিল সে বিষ দিয়ে হত্যা করতে হয়েছিল বলেই বেশী পরিমাণ বিষের প্রয়োজন হয়েছিল।

কিন্তু যা বলছিলাম, পুরন্দর চৌধুরী ও লতা দুই বিজ্ঞানীর মিলিত হত্যা-প্রচেষ্টা অভিনব সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের সকলের দৃষ্টির বাইরে ত্রিকালদর্শী একজন, যিনি সর্বদা দুটি চক্ষু মেলে সদা জাগ্রত, সদা সচেতন, যাঁর বিচার ও দণ্ড বড় সূক্ষ্ম, তাঁকে যে আজ পর্যন্ত কেউ এড়াতে পারে নি—মদগর্বী মানুষ তা ভুলে যায়। আজ পর্যন্ত কোন পাপ, কোন দুষ্কৃতিই যে চিরদিনের জন্য ঢাকা থাকে না আমরা তা বুঝতে চাই না বলেই না পদে পদে আমরা পর্যুদস্ত, লাঞ্ছিত, অপমানিত হই।

॥ ৩৮ ॥

পুরন্দর চৌধুরী, লতা ও করালীকে রামানন্দ সেনই পুলিশ-ভ্যানে করে নিয়ে গেলেন যাবার সময়।

অভিশপ্ত নীলকুঠি!

সন্ধ্যার দিকে ঐ দিনই নীলকুঠির ঘরে ঘরে ও সদর দরজায় তালা পড়ে গেল।

রজত কলকাতায় চলে গেল।

আর সুজাতা গেল তার দূর-সম্পর্কীয় এক মাসীর বাড়িতে বরাহনগর। ছুটির এখনো দশটা দিন বাকী আছে, সুজাতা সে দশটা দিন মাসীর ওখানেই থাকবে স্থির করল।

দিন পাঁচেক বাদে বিকালের দিকে প্রশান্ত বসাক কী একটা কাজে দক্ষিণেশ্বর গিয়েছিলেন, ফিরবার পথে কি মনে করে সুজাতার মাসীর বাড়ির দরজায় এসে গাড়িটা থামালেন।

সুজাতা বাসাতেই ছিল, সংবাদ পেয়ে বাইরে এল।

আপনি!

হ্যাঁ, হঠাৎ এদিকে একটা কাজে এসেছিলাম, তাই ভাবলাম যাবার পথে আপনার সঙ্গে দেখা করে যাই।

বসুন। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? সুজাতা বলে।

খালি একটা চেয়ারে বসতে বসতে প্রশান্ত বসাক বললেন, লক্ষ্ণৌ ফিরে যাচ্ছেন কবে?

আরও দিন দশেকের ছুটি নিয়েছি।

তা হলে এখন এখানেই থাকবেন বলুন?

তাই তো ভাবছি।

এবং শুধু ঐ দিনই নয় তার পরের সপ্তাহে আরও চার পাঁচবার দুজনে দেখা হল।

হঠাৎ তারপর থেকে ঘন ঘন কাজ পড়ে যায় যেন ঐ দিকে প্রশান্ত বসাকের এবং ফিরবার পথেই দেখাটা করেন তিনি সুজাতার সঙ্গে। কারণ সুজাতার কথা তাঁর মনে পড়ে প্রত্যেক বারেই।

অবশ্য সেটা খুবই স্বাভাবিক।

সেদিন দ্বিপ্রহরে রামানন্দ সেনের সঙ্গে হেডকোয়ার্টারের নিজস্ব অফিস-রুমে বসে প্রশান্ত বসাক নীলকুঠির হত্যাব্যাপার নিয়েই আবার আলোচনা করছিলেন।

পুরন্দর চৌধুরী বা লতা এখনও তাদের কোন জবানবন্দী দেয় নি।

তদন্ত চলছে, পুরোপুরি কেসটাও এখনও তৈরী করা যায় নি।

রামানন্দ সেন বলছিলেন, কিন্তু আপনি ওদের সন্দেহ করলেন কি করে ইনস্পেক্টার?

ব্যাপারটা যে আত্মহত্যা নয়, হত্যা—নিষ্ঠুর হত্যা, সে আমি অকুস্থানে

অর্থাৎ ল্যাব্রোটারী ঘরে প্রবেশ করে, মৃতদেহ পরীক্ষা করে ও অন্যান্য সব কিছু দেখেই বুঝেছিলাম মিঃ সেন, আর তাতেই সন্দেহটা আমার ওদের 'পরে ঘনীভূত হয়।

কি রকম?

প্রথমতঃ মৃতদেহের position, সে সম্পর্কে পূর্বেই আমি আলোচনা করেছি আপনাদের সঙ্গে। দ্বিতীয়তঃ, মৃতদেহ ও তার ময়নাতদন্তের রিপোর্টও তাই প্রমাণ করেছে। তৃতীয়তঃ, বিনয়েন্দ্রর নিত্যব্যবহার্য অপহৃত রবারের চপ্পল জোড়া। সেটা কোথায় গেল? আপনাদের বলি নি সেটা রক্তমাখা অবস্থায় পাওয়া যায় নীলকুঠির বাঁ পাশের প'ড়ো বাড়ির মধ্যে। খুব সম্ভব অতর্কিতে ঘাড়ে আঘাত পেয়ে বিনয়েন্দ্র যখন মেঝেতে পড়ে যান তখন টেবিলের উপর থেকে ঘড়িটার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কাচের অ্যাপারেটাসও মেঝেতে পড়ে গিয়ে ভেঙে যায়: যে ভাঙা কাচের টুকরোয় হত্যাকারী বা তার সঙ্গীর সম্ভবতঃ পা কেটে যায়। রক্ত পড়তে থাকে। তখন তারা ঘরের সিঙ্কের ট্যাপে পা ধোয় ও পরে ঐ চপ্পল জোড়া পায়ে দিয়েই হয়তো ঘর থেকে বের হয়ে যায় যাতে করে রক্তমাখা পায়ের ছাপ মেঝেতে না পড়ে। আপনি জানেন না মিঃ সেন, ওদের যেদিন অ্যারেস্ট করা হয় সেই দিনই হাজতে পুরন্দর চৌধুরী ও লতার পা পরীক্ষা করে দেখা যায় লতাদেবীর পায়েই ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছিল। এবং তারই পায়ের পাতায় ক্ষত ছিল। পা ধোবার পর উত্তেজনার মধ্যে ওরা ঘরের সিঙ্কের ট্যাপটা বন্ধ করে রেখে যেতে ভুলে যায়—যেটা খুব স্বাভাবিক, আর তাইতেই সেই ট্যাপটা আমরা খোলা অবস্থায় দেখি। নীলকুঠিতে ওদের প্রবেশে অত রাত্রে সাহায্য করেছিল করালী, এবং ওরা দুজনে যখন করালীর সাহায্যে নীলকুঠিতে প্রবেশ করে বা বের হয়ে যায় তখন হয়তো রামচরণের নজরে ওরা পড়েছিল বলেই তাকে প্রাণ দিতে হল পরে হত্যাকারীর হাতে। দ্বিতীয় রাত্রে আমার সঙ্গে যখন ল্যাব্রোটারী ঘরের মধ্যে বসে এক কাল্পনিক কাহিনী বলে নিজেকে সন্দেহমুক্ত করবার জন্য ও নিজের alibi সৃষ্টির চেষ্টায় আমাকে বোকা বুঝাবার চেষ্টায় রত ছিল, সম্ভবতঃ পূর্বেই পুরন্দর রামচরণকে হত্যা করে কাজ শেষ করে এসেছিল। এবং কেমন করে সে রাত্রে সেটা সম্ভব হয়েছিল নীলকুঠির উপরের ও নীচের তলাকার নক্সা দেখলেই আপনি তা বুঝতে পারবেন। রাত্রে সকলের শয়নের কিছুক্ষণ পরেই পুরন্দর চৌধুরী ঘর থেকে বের হয়ে যান এবং বারান্দা পার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে যান। করালীর সাহায্যে

রামচরণকে হত্যা করে দোতলায় উঠবার ঘোরান সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসে আবার। তারপর আমার দৃষ্টি তার প্রতি আকর্ষণ করবার জন্য শব্দ করে ল্যাব্রোটারী ঘরের দিকে যায়। কারণ সে জানত আমি সম্ভবতঃ জেগেই থাকব। এবং পূর্বেও ছায়াকুহেলীর দুঃস্বপ্ন গড়ে তুলবার জন্য ঐ সিঁড়ি দিয়েই সে উপরে উঠে যেত; কারণ অন্য সিঁড়ির দরজাটা রাত্রে বন্ধ থাকত। শেষ রাত্রে যেদিন করালীকে দেখে সুজাতা দেবী ভয় পেয়েছিলেন সে রাত্রেও ওই ঘোরান সিঁড়ি দিয়েই উপরে উঠে পালাবার সময়ও সেই পথেই পালায়। এবারে আসা যাক ওদের আমি সন্দেহ করলাম কি করে। পুরন্দর চৌধুরীর বিরুদ্ধে প্রথম প্রমাণ, সেই চিঠি। যা বিনয়েন্দ্রর নামে রজতবাবু ও সুজাতা দেবীকে ও তার নামেও লেখা হয়েছিল। চিঠিটা যে পুরন্দরেরই নিজের হাতে লেখা সেটা তার কৌশলে জবানবন্দীর কাগজে নাম দস্তখত করে নেওয়ার ছলে সংগ্রহ করে দুইটা লেখা মিলিয়ে দেখতেই ধরা পড়ে যায় আমার কাছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, ওভাবে risk সে নিতে গেল কেন? বোধ হয় তার মধ্যেও ছিল তার আত্ম-অহমিকা বা সুনিশ্চয়তা নিজের উপরে। দ্বিতীয় প্রমাণ, পুরন্দর চৌধুরীর জবানবন্দী, যা আমার মনে সন্দেহের সৃষ্টি করে। খবর নিয়ে আমি জেনেছিলাম, গত পনের দিন ধরেই পুরন্দর চৌধুরী কলকাতার এক হোটেলে ছিল। হোটেলটির নাম 'হোটেল স্যাভয়'। সেখানকার এক বয়ের মুখেই সংবাদটা আমি পাই। তৃতীয় প্রমাণ, লতাকে আমার লোক অনুসরণ করে জানতে পারে সে-ও হোটেল স্যাভয়-এ উঠেছিল পুরন্দরের সঙ্গে পুরুষের বেশে, কিন্তু সে যে পুরুষ নয় নারী, সেও ঐ হোটেলের বয়ই অতর্কিতে একদিন জানতে পারে। তারপরে বাকীটা আমি অনুমান করে নিয়েছিলাম ও কিরীটী আমার দৃষ্টিকে সজাগ করে দিয়েছিল।

হঠাৎ ঐ সময় টেবিলের উপরে টেলিফোনটা বেজে উঠল ক্রিং ক্রিং শব্দে।

রিসিভারটা তুলে নিলেন বসাক, হ্যালো—

আপনাকে একবার আসতে হবে স্যার।

কেন, ব্যাপার কী?

লতা দেবী সুইসাইড্ করবার চেষ্টা করছিলেন।

বল কি হে!

হ্যাঁ, এখনও অবস্থা খারাপ। তিনি আপনাকে যেন কি বলতে চান।

॥ ৩৯ ॥

আর দেরি করলেন না প্রশান্ত বসাক। পুলিস হাসপাতালে ছুটলেন। একটা কেবিনের মধ্যে লতা দেবী শুয়েছিলেন। জানা গেল, গোটা দুই সিংগাপুরী মুক্তা তাঁর কাছে ছিল; সেই খেয়েই তিনি আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করেছেন। অবস্থা ভাল নয়।

মিঃ বসাককে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে মৃদু কণ্ঠে লতাদেবী বললেন, মিঃ বসাক!

কাছে এসে বসলেন মিঃ বসাক।

আমি কিছু আপনাকে বলতে চাই। বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না। তবে জানবেন শেষ মুহূর্তে মিথ্যা কথা বলছি না।

বলুন।

মিঃ বসাকের চোখের ইঙ্গিতে রামানন্দ সেন আগেই কাগজ কলম নিয়ে বসেছিলেন।

লতা দেবীর শেষ জবানবন্দী রামানন্দ সেন লিখে নিতে লাগলেন।

•

এবং বলাই বাহুল্য বাঁচান গেল না লতাকে।

পরের দিন ভোরের দিকেই তাঁর মৃত্যু হল বিষের ক্রিয়ায়।

এবং মৃত্যুর পূর্বে যে কাহিনী তিনি বিবৃত করে গেলেন, সেটা না জানতে পারলে নীলকুঠির হত্যা-রহস্যের যবনিকা তুলতে আরও কতদিন যে লাগত কে জানে!

শুধু তাই নয়, কখনও যেত কিনা তাই বা কে বলতে পারে।

মৃত্যুপথযাত্রিণী লতা সংক্ষেপে এক মর্মান্তিক কাহিনী বলে গেল তাঁর শেষ সময়ে। দুটি পুরুষের প্রবল প্রেমের আকর্ষণের মধ্যে পড়ে শেষ পর্যন্ত কাউকে সে পেলে না, কাউকেই সে সুখী করতে পারল তো নাই, উপরন্তু তাদের মধ্যে একজনকে হত্যা করল সে হত্যাকরীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে এবং অন্যজনকেও বিদায় দিতে হল মর্মান্তিক এক পরিস্থিতির মধ্যে। এবং সবচাইতে করুণ হচ্ছে দুজনকেই সে ভালবেসেছিল; তবে একজনের ভালবাসা সম্পর্কে সে সর্বদা সচেতন থাকলেও অন্যজনকে ও যে ভালবাসত এবং ঘটনাচক্রে তারই মৃত্যুর কারণ হয়েছিল—শেষ মুহূর্তে সেটা সে বুঝতে পারল ব্যথা ও অনুশোচনার মধ্য দিয়ে।

কিন্তু তখন যা হবার হয়ে গিয়েছে।

আরও পাঁচ দিন পর—

বিনয়েন্দ্র ও রামচরণের হত্যা-রহস্যের যে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রশান্ত বসাক পুলিশের কর্তৃপক্ষকে দাখিল করেছিলেন, সেটা একটি কল্পিত উপন্যাসের কাহিনীর চেয়ে কম বিস্ময়কর ও চমকপ্রদ নয়। একটি নারীকে ঘিরে দুটি পুরুষের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আজন্মপোষিত হিংসা যে কি ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে এবং হাসিমুখে বন্ধুত্বের ভান করে কী ভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এবং বৎসরের পর বৎসর দুই বন্ধু একের প্রতি অন্যে সেই প্রতিহিংসার গরল বিন্দু বিন্দু করে সঞ্চয় করে তুলতে পারে ও শুধুমাত্র সময় ও সুযোগে সেই প্রতিহিংসার গরল-মাখান বাঁকান নখরে চরম আঘাত হানবার জন্য লতার স্বেচ্ছাকৃত জবানবন্দী না পেলে হয়তো সম্যক বোঝাই যেত না কোনদিন। এবং বিনয়েন্দ্র ও রামচরণের হত্যা-রহস্যের উপরেও কোনদিন আলোকসম্পাত হত কিনা তাই বা কে বলতে পারে।

॥ ৪০ ॥

বিনয়েন্দ্র ও পুরন্দর চৌধুরীর পরস্পরের আলাপ হয় কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে।

দুজনেই ছিল প্রখর তীক্ষ্ণধী ছাত্র। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে যখন তারা উঠল, তারই মাসখানেক বাদে পাঞ্জাব থেকে লতা সিং পড়তে এল কলকাতায়।

লতার বাপ ছিল পাঞ্জাবী আর মা ছিল লুধিয়ানা-প্রবাসী এক বাঙালীর মেয়ে। লতা তার জন্ম-স্বত্ব হিসাবে পাঞ্জাবী পিতার দেহসৌষ্ঠব ও বাঙালী মায়ের রূপ-মাধুর্য পেয়েছিল।

লুধিয়ানার কলেজেই পড়তে পড়তে হঠাৎ পিতার মৃত্যু হওয়ায় লতার মা লতাকে নিয়ে তাঁর পিতার কাছে কলকাতায় চলে আসেন; কারণ লতার মাতামহ তখন দীর্ঘকাল পরে আবার তাঁর নিজের মাতামহর বাড়ি ও সম্পত্তি পেয়ে কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করেছেন।

লতা, পুরন্দর ও বিনয়েন্দ্র যে কলেজে পড়তেন সেই কলেজেই সেই শ্রেণীতে এসে ভর্তি হল।

বিনয়েন্দ্র ও পুরন্দর চৌধুরীর সহপাঠিনী লতা। এবং ক্রমে লতার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় বিনয়েন্দ্র ও পুরন্দর চৌধুরীর। দুর্ভাগ্যক্রমে উভয়েই ভালবাসলেন লতা সিংকে। আর সেই হল যত গোলযোগের সূত্রপাত। কিন্তু পরস্পরের ব্যবহারে বা কথাবার্তায় কেউ কারও কাছে সে-কথা স্বীকার করলে না বা প্রকাশ পেল না। ইতিমধ্যে নানা দুর্বিপাকে পড়ে পুরন্দর চৌধুরীকে পড়াশুনায় ইস্তফা দিয়ে জীবিকা অর্জনের জন্য চেষ্টা শুরু করতে হল।

পুরন্দর চৌধুরী ও বিনয়েন্দ্র দুজনেই লতাকে ভালবাসলেও লতার কিন্তু মনে মনে দুর্বলতা ছিল পুরন্দর চৌধুরীর উপরেই একটু বেশি। সে কথাটা জানতে বা বুঝতে পেরেই হয়তো বিনয়েন্দ্র সরে দাঁড়িয়েছিলেন পুরন্দর চৌধুরীর রাস্তা থেকে শেষ পর্যন্ত। কিন্তু সরে দাঁড়ালেও প্রেমের ব্যাপারে এত বড় পরাজয়টা বিনয়েন্দ্র কোন দিনই ভুলতে তো পারেনই নি, এমন কি লতাকেও বোধ হয় ভুলতে পারেন নি। এবং সেই কারণেই পুরন্দরকে ক্ষমা করতে পারেন নি। চিরদিন মনে মনে পুরন্দর চৌধুরীর প্রতি একটা ঘৃণা পোষণ করে এসেছেন।

যাহোক, পুরন্দর পড়াশুনা ছেড়ে দিলেন এবং বিনয়েন্দ্র ও লতা যথা-সময়ে পাশ করে স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান বিভাগে নাম লিখালেন। সেখান থেকে পাশ করে বিনয়েন্দ্র নিলেন অধ্যাপনার কাজ, আর লতা বাংলার বাইরে একটা কেমিক্যাল ফার্মে চাকরি নিয়ে চলে গেল।

পুরন্দর চলে গেলেন সিংগাপুরে। সেখানে গিয়ে লিং সিংয়ের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়লেন। পুরন্দর বর্ণিত সিংগাপুর-কাহিনী প্রায় সবটাই সত্য কেবল সত্য নয় তাঁর স্ত্রী ও পুত্রের আকস্মিক সর্পদংশনে মৃত্যুর কথাটা। তাদের তিনি নিজ হাতে বিষ দিয়ে হত্যা করে সেই বাড়িতেই কবর দিয়েছিলেন। এবং পরে অবিশ্যি ওই সংবাদ তারযোগে সিংগাপুর স্পেশাল পুলিশই মাত্র কয়েকদিন আগে আমাকে জানায়। সেই নৃশংস হত্যার পর থেকে পুরন্দর অন্য নামে আত্মগোপন করে বেড়াচ্ছিল এতকাল।

তাই বলছিলাম পুরন্দর চৌধুরী শুধু নৃশংসই নয়, মহাপাষণ্ড।

এদিকে বিনয়েন্দ্র অনাদি চক্রবর্তীর বিষয়-সম্পত্তি পেয়ে নতুন করে আবার জীবন শুরু করলেন। এবং ক্রমে পুরন্দর ও বিনয়েন্দ্রর পরস্পরের প্রতি পোষিত যে হিংসাটা দীর্ঘদিনের অদর্শনে বোধ হয় একটু ঝিমিয়ে এসেছিল, সেটা ঠিক সেই সময়েই অকস্মাৎ একদিন জ্বলে উঠল পুরন্দর কলকাতায় এসে বিনয়েন্দ্রর সঙ্গে দেখা করায় এবং সেখানে লতাকে দেখে

নতুন করে আবার সেটা জেগে উঠল দীর্ঘকাল পরে। যার ফলে যাবার পূর্বে পুরন্দর বিনয়েন্দ্রকে সিংগাপুরী মুক্তার নেশায় হাতেখড়ি দিয়ে গেলেন।

সিংগাপুরী মুক্তার নেশা ধরানোর ব্যাপারটা পূর্বাহ্নেই অবিশ্যি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য পুরন্দর চৌধুরী মিঃ বসাকের নিকট তাঁর বিবৃতি কালে স্বীকার করেছিলেন।

ঐ সময় লতার সঙ্গেও নিশ্চয়ই পুরন্দরের কোন কথাবার্তা হয়েছিল, যাতে করে ঐ সিংগাপুরী মুক্তার নেশায় কবলিত করে তাকে দীর্ঘ দিন ধরে দোহন করে করে বিনয়েন্দ্রকে একেবারে ঝাঁঝরা করে ফেলা ও লতাকে পাওয়া। এক ঢিলে দুই পাখী বধ করা।

বলাই বাহুল্য, ইতিপূর্বে এক সময় লতার চাকরি গিয়ে সে বেকার হয়ে পড়ে। আর ঠিক সেই সময় দৈবক্রমেই যেন একজন ল্যাব্রোটারী অ্যাসিস্টেণ্টের প্রয়োজন হওয়ায় কাগজে বিজ্ঞাপন দেয় বিনয়েন্দ্র। সেই বিজ্ঞাপন দেখে লতা আবেদন পাঠায়। আবেদনকারীদের মধ্যে হঠাৎ লতার আবেদনপত্র দেখে প্রথমটায় বিনয়েন্দ্রর কি রকম সন্দেহ হয়। তিনি লতাকে একটা চিঠি দেন দেখা করবার জন্য। লতা পত্রের জবাব দেয়, এবারে আর লতাকে চিনতে বিনয়েন্দ্রর কষ্ট হয় না। আবার লতাকে তিনি চিঠি দেন সাক্ষাতের জন্য। লতা সাক্ষাৎ করতে এল এবং বলাই বাহুল্য দীর্ঘদিন পরে লতার প্রতি যে সুপ্ত প্রেম এতকাল বিনয়েন্দ্রর অবচেতন মনে ধিকি ধিকি জ্বলছিল তা লেলিহ হয়ে উঠল দ্বিগুণ তেজে। লতা কাজে বহাল হল। লতা অবিশ্যি তখনও অবিবাহিতা।

লতাকে বিনয়েন্দ্রর নীলকুঠিতে আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করবার পরই পুরন্দরের মনে লতাকে ঘিরে আবার বাসনার আগুন দ্বিগুণ ভাবে জ্বলে ওঠে। তাছাড়া বেলাকে বিবাহ করলেও তার প্রতি কোন দিনই সত্যিকারের ভালবাসা জন্মায় নি তার। এবং লতাকে দ্বিতীয়বার আবিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গেই লতার প্রতি তার পুরাতন দিনের আকর্ষণ আবার নতুন করে জেগে উঠল। বেলাকে ও তার পুত্রকে হত্যা করে লতাকে বিবাহ করবার পথ পরিষ্কার করে নিয়েছিল পুরন্দর। বেলার মৃতদেহ কোনদিন দৈবক্রমে যদি আবিষ্কৃত হয় তখন যাতে সহজেই হত্যার দায় থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে, ওই কাল্পনিক কাহিনী পূর্বাহ্নেই বলবার অন্যতম আর একটি কারণ ছিল বোধ হয় তাই আমার কাছে।

পরে সিংগাপুরে ফিরে গিয়ে বেলাকে হত্যা করে সেই যে পুরন্দর আবার

কলকাতায় এল আর ফিরে গেল না সেখানে। নীলকুঠির পাশের সেই ভাঙা বাড়িতে গোপনে আশ্রয় নিল ও; প্রতি রাত্রে উভয়ের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হতে লাগল। এবং সেই সঙ্গে চলতে লাগল বিনয়েন্দ্রকে হত্যা করবার পরিকল্পনা। সেই ভাঙা বাড়িতে তাদের গতিবিধির উপর যাতে কারও নজর না পড়ে সেজন্য দ্বিতীয় একজনকে সেখানে নিয়ে আসা হল মিশিরজী পরিচয়ে। অর্থাৎ এবারে পাকাপোক্ত ভাবেই সুরু হল ওদের অভিযান। শুধু যে পুরন্দর চৌধুরীই দুঃসাহসী ছিল তাই নয়, লতাও ছিল। পাঞ্জাবী বাপের রক্ত ছিল তার শরীরে, তাই তার পক্ষে সে রাত্রে কার্ণিশ বেয়ে পুরন্দরের পিছু পিছু লতার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করাটা এমন কষ্টসাধ্য হয় নি কিছু। সে যাক্, যা বলছিলাম।

॥ ৪১ ॥

সে যাক্, যা বলছিলাম, প্রশান্ত বসাক বলতে লাগলেন: পূর্ব পরিকল্পনা মতই সব ঠিক হয়ে গেলে ড্রাইভার করালীকে ওখানে প্রহরায় রেখে লতা অকস্মাৎ একদিন অন্তর্হিতা হল। এবং নীলকুঠি থেকে অন্তর্হিতা হয়ে সে প্রবেশ করল গিয়ে সেই ভাঙা বাড়িতে।

হত্যার দিন রাত্রে করালীর সাহায্যে সদর খুলিয়ে লতা এল বিনয়েন্দ্রর সঙ্গে দেখা করতে। সবে হয়তো তখন বিনয়েন্দ্র সিংগাপুরী মুক্তার নেশায় রঙিন হয়ে উঠছে। লতা এসেই দরজায় নক্ করে এবং বিনয়েন্দ্র অকস্মাৎ ঐ রাত্রে গবেষণা-ঘরের দরজা খুলে লতাকে সামনে দেখে বিহ্বল হয়ে যান। আনন্দিতও যে হয়েছিলেন সেটা বলাই বাহুল্য। এবং তারপর ঘরের দরজা খোলাই ছিল। পরে একসময় বিনয়েন্দ্রর অজ্ঞাতে পুরন্দর ল্যাব্রোটারী ঘরে প্রবেশ করে। লতার সঙ্গে গল্পে মশগুল বিনয়েন্দ্র, এমন সময় পশ্চাৎ দিক থেকে পুরন্দর এসে বিনয়েন্দ্রর ঘাড়ে আঘাত করে। বিনয়েন্দ্র অতর্কিত আঘাতে টুল থেকে পড়ে যান মাটিতে এবং পড়বার সময় তাঁর হাতে লেগে টেবিলের উপর থেকে ঘড়িটা ও দুএকটা কাচের যন্ত্রপাতিও সম্ভবত মেঝেতে পড়ে গিয়ে ভেঙে যায়। একটা কাচের পাত্রে খানিকটা অ্যাসিড ছিল, সেটা মেঝেতে পড়ে যায়। ঘাড়ে আঘাত করে বিনয়েন্দ্রকে অজ্ঞান করে পুরন্দর বিচিত্র ওই স্প্রেয়িং অ্যাপারেটাসটার সাহায্যে বিনয়েন্দ্রর গলার মধ্যে আরো সর্পবিষ ঢেলে দেয়। তারপর ব্যাপারটাকে আত্মহত্যার রূপ দেবার জন্য মেঝের ভাঙা কাচের টুকরো ও অ্যাসিড সরিয়ে

ও মুছে নিতে গিয়ে অতর্কিতে লতার পা কেটে যায়। তখন সে রক্ত ধুয়ে ফেলতে ও ঘরের মেঝের সব চিহ্ন মুছে নিতে ঘরের ওয়াসিং সিঙ্কের ট্যাপ খুলে ন্যাকড়া বা রুমাল জলে ভিজিয়ে সব ধুয়ে মুছে ফেলে। কিন্তু মেঝে থেকে অ্যাসিডের দাগ একেবারে যায় না এবং চলে যাবার সময় পুরন্দর ট্যাপটা বন্ধ করে রেখে যেতে ভুলে যায়। কাচের ভাঙা টুকরোয় পা কেটে যাওয়ায় লতা বিনয়েন্দ্রর রবারের চপ্পল জোড়া পায়ে দিয়ে নিয়েছিল, কারণ সে এসেছিল খালি পায়ে। যে চপ্পল আমি পাশের বাড়ির মধ্যে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। শুধুমাত্র বিনয়েন্দ্রর হত্যাব্যাপারটাকে আত্মহত্যার রূপই যে দেওয়ার প্রচেষ্টা হয়েছিল তা নয়, ঐ হত্যাপ্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভৌতিক ব্যাপারও গড়ে তোলা হয়েছিল মধ্যে মধ্যে কিছুদিন পূর্ব হতেই করালীর প্রচেষ্টায়, বলা বাহুল্য আমার একটা কথা বলতে ভুল হয়ে গিয়েছে। বিনয়েন্দ্রর মৃতদেহের পাশে গ্লাস-বিকারের মধ্যে যে তরল পদার্থ পাওয়া গিয়েছিল তার মধ্যেও পরীক্ষা করে সর্প-বিষই পাওয়া যায়। তাতে করে অবিশ্যি বিনয়েন্দ্রর দেহে সর্প-বিষ পাওয়ার ব্যাপারটা যে আদৌ আত্মহত্যা নয় এবং হত্যাই সেটা আমার আরও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস হয়। কারণ, বিনয়েন্দ্র যে সর্প-বিষ নিয়ে গবেষণা করছিল তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। তাই তার বিকারে সর্প-বিষ পাওয়া ও মৃত্যুর কারণ সর্প-বিষ হওয়ার সন্দেহটা বৃদ্ধিই করেছিল। এই গেল বিনয়েন্দ্রর হত্যার ব্যাপার। দ্বিতীয়. রামচরণকেও হত্যা করে পুরন্দর চৌধুরীই পর রাত্রে। এবং হত্যা করবার পর সে ল্যাব্রোটারীতে যায় নিজের একটা alibi তৈরী করবার জন্য আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য। সে ভালভাবেই জানত যে. রাত্রে আমি সজাগ থাকব ও সহজেই সে আমার দৃষ্টিতে পড়বে এবং তখন তার সেই কাহিনী বলে আমাকে সে তার ব্যাপারে সন্দেহ থেকে নিজেকে মুক্ত করে রাখবে পূর্বেই বলেছি সে-কথা। কিন্তু সে বুঝতে পারে নি যে কিরীটীর সঙ্গে আলোচনার পর তার উপরেই আমার সন্দেহটা জাগতে পারে এবং আমি সেই ভাবেই পরে তদন্ত চালাতে পারি। কিরীটীই পুরন্দরের 'পরে আমার মনে প্রথমে সন্দেহ জাগ্রত করে ও চিঠিগুলোর 'পরে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করায়। পরে অবিশ্যি আলাদা আলাদা কাগজে জবানবন্দী লিখে তার উপরে প্রত্যেকের নাম দস্তখত করতে আমি সকলকে বাধ্য করি। এবং প্রত্যেকের আলাদা হাতের লেখা ও তার সঙ্গে সুজাতা, রজত ও পুরন্দর চৌধুরীর কাছে প্রাপ্ত বিনয়েন্দ্রর

নামে লেখা চিঠির লেখা মিলাতেই দেখা গেল, একমাত্র পুরন্দর চৌধুরীর হাতের লেখার সঙ্গেই বেশ যেন কিছুটা মিল আছে। পরে অবিশ্যি হাতের লেখার বিশেষজ্ঞও সেই মতই দিয়েছেন। যা হোক, তারপর পুরন্দর চৌধুরীর প্রতিই সন্দেহটা আরও যেন আমার ঘনীভূত হয়। এবং এখানে আর একটা কথা বলা প্রয়োজন, ঐ তিনখানা চিঠি যে আদৌ বিনয়েন্দ্রর লেখা নয় সেটার প্রমাণ পূর্বেই আমি পেয়েছিলাম বিনয়েন্দ্রর ল্যাবোরেটারী ঘরের মধ্যে ড্রয়ারে প্রাপ্ত তার নোট বইয়ের মধ্যেকার বাংলা লেখা দেখে এবং সেই লেখার সঙ্গে চিঠির লেখা মিলাতেই। বিনয়েন্দ্রকে হত্যা করা হয়েছিল। এবং তার হত্যার সংবাদও তাঁর সম্পত্তির ওয়ারিশন হিসাবে রজত ও সুজাতা পেতই একদিন না একদিন। তবে তাদের ওভাবে অত তাড়াতাড়ি হত্যা-মঞ্চে টেনে আনা হল কেন বিনয়েন্দ্রর নামে চিঠি দিয়ে? তারও কারণ ছিল বৈকি।

এবং সেটা বুঝতে হলে আমাদের আসতে হবে পুরন্দর চৌধুরীর সত্যিকারের পরিচয়ে। কে ওই পুরন্দর চৌধুরী।

আমরা জানি অনাদি চক্রবর্তী তাঁর পিতার একমাত্র সন্তানই ছিলেন। কিন্তু আসলে তা নয়। তাঁর একটি ভগ্নীও ছিল। নাম প্রেমলতা।

প্রেমলতার তের বছর বয়সের সময় বিবাহ হয় এবং যোল বৎসর বয়সে সে যখন বিধবা হয়ে ফিরে এল পিতৃগৃহে তখন তার কোলে একমাত্র শিশুপুত্র, বয়স তার মাত্র দুই। প্রেমলতা অনাদি চক্রবর্তী থেকে আঠারো বছরের ছোট ছিল। মধ্যে আরও দু'টি সন্তান অনাদির মা'র হয়, কিন্তু তারা আঁতুড় ঘরেই মারা যায়। প্রেমলতা বিনয়েন্দ্রর মা'র থেকে বয়সে বছর চারেকের বড় ছিল। বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে ফিরে আসবার বছরখানেকের মধ্যে সহসা এক রাত্রে প্রেমলতা তার শিশুপুত্রসহ গৃহত্যাগিনী হয়। এবং কুলত্যাগ করে যাওয়ার জন্যই অনাদি চক্রবর্তী তার নামটা পর্যন্ত চক্রবর্তী বংশের ইতিহাস থেকে মুছে ফেলেন। কিন্তু জোর করে মুছে ফেললেই আর সব-কিছু মুছে ফেলা যায় না।

যা হোক, গৃহত্যাগিনী প্রেমলতার পরবর্তী ইতিহাস খুঁজে না পাওয়া গেলেও তার শিশুপুত্রটির ইতিহাস খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। এক অনাথ আশ্রমে সেই শিশু মানুষ হল বটে, তবে কুলত্যাগিনী মায়ের পাপ যে তার

রক্তে ছিল! সেই পাপের টানেই সেই শিশু যত বড় হতে লাগল তার মাথার মধ্যে শয়তানী বুদ্ধিটাও তত পরিপক্ক হতে লাগল।

সেই শিশুকেই পরবর্তী কালে আমরা দেখছি পুরন্দর চৌধুরী রূপে। পুরন্দর চৌধুরী তাঁর যে জীবনের ইতিবৃত্ত দিয়েছিল তা সর্বৈব মিথ্যা, কাল্পনিক।

নিজের সত্যিকারের পরিচয়টা পুরন্দর চৌধুরী জানত, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনদিন সাহস করে গিয়ে তার মামা অনাদি চক্রবর্তীর সামনে দাঁড়াতে পারে নি। কারণ, সে জানত অনাদি চক্রবর্তী কোন দিনই তাকে ক্ষমার চক্ষে তো দেখবেনই না- এমন কি সামনে গেলে দূর করেই হয়তো তাড়িয়ে দেবেন।

তাই কলেজে অধ্যয়নকালে সহপাঠী বিনয়েন্দ্রর সঙ্গে যখন তার পরিচয় হয় তখন থেকেই বিনয়েন্দ্রর প্রতি একটা হিংসা পোষণ করতে শুরু করে পুরন্দর এবং সে হিংসায় নতুন করে ইন্ধন পড়ে লতা সিংয়ের প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়।

পুরন্দর চৌধুরী অনাদি চক্রবর্তীর সঙ্গে বিনয়েন্দ্রর কোন সম্পর্ক নেই জেনে প্রথমে যেটুকু নিশ্চিন্ত হয়েছিল, পরে অনাদি চক্রবর্তীর মৃত্যুর পর যখন সে জানতে পারল বিনয়েন্দ্রকেই অনাদি তার সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে গিয়েছেন তখন থেকেই সে নিশ্চিন্ত ভাবটা তো গেলই, ঐ সঙ্গে বিনয়েন্দ্রর প্রতি আক্রোশটা আবার নতুন করে দ্বিগুণ হয়ে জেগে ওঠে। এবং প্রকৃতপক্ষে তখন থেকেই মনে মনে বিনয়েন্দ্রকে হত্যা করবার পরিকল্পনা করতে থাকে পুরন্দর। কিন্তু ঐ সময় কিছুদিনের জন্য ভাগ্যচক্রে তাকে সিংগাপুরে ভাগ্যান্বেষণে যেতে হওয়ায় ব্যাপারটা চাপা পড়ে থাকে মাত্র। তবে ভোলে নি সে কথাটা। বিনয়েন্দ্রকে কোন মতে পৃথিবী থেকে সরাতে পারলে সেই হবে অনাদি চক্রবর্তীর সম্পত্তির অন্যতম ওয়ারিশন তাও সে ভুলতে পারে নি কোনদিন। আর তাই সে কিছুতেই নীলকুঠির মায়া ত্যাগ করতে পারে নি। নীলকুঠিতে পুরন্দর ছায়াকুহেলীর সৃষ্টি করে। তার ইচ্ছা ছিল, ঐ ভাবে একটা ভৌতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে পরে কোন এক সময় সুযোগ মত বিনয়েন্দ্রকে হত্যা করবে। সেই মতলবেই ধীরে ধীরে পুরন্দর তার পরিকল্পনামত এগুচ্ছিল।

এদিকে একদা যৌবনের বাঞ্ছিতা লতাকে প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় এসে হঠাৎ আবার নতুন করে কাছে পেয়ে বিনয়েন্দ্র পাগল হয়ে উঠল।

এবং অন্যদিকে আকস্মিক ভাবে আবার একদিন রাত্রে বহুকাল পরে

পুরন্দরকে দেখে লতা বুঝতে পারল যৌবনের সে-ভালবাসাকে আজও সে ভুলতে পারে নি।

এবং সেই ভালবাসার টানেই পুরন্দরের পরামর্শে তার দুষ্কৃতির সঙ্গে হাতে-হাত মিলাল লতা।

পরে অবিশ্যি ধরা পড়ে, মুক্তির আর কোন উপায়ই নেই দেখে অনন্যোপায় লতা আত্মহত্যা করে তার ভুলের ও সেই সঙ্গে প্রেমের প্রায়শ্চিত্ত করল।

কিন্তু বলছিলাম পুরন্দর চৌধুরীর কথা। কেন সে সুজাতা ও রজতকে বিনয়েন্দ্রর নামে চিঠি দিয়ে অত তাড়াতাড়ি নীলকুঠিতে ডেকে এনেছিল?

কারণ, বিনয়েন্দ্রকে হত্যা করলেই সে সমস্ত সম্পত্তি পাবে না। রজত ও সুজাতা হবে তার অংশীদার। কিন্তু তাদের সরাতে পারলে তার পথ হবে সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক। তাই সে ওদের হাতের সামনে ডেকে এনেছিল সুযোগ ও সুবিধামত হত্যা করবার জন্যই।

বিনয়েন্দ্রকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে সে তার সম্পত্তি লাভের প্রথম সোপান তৈরী করেছিল; এখন রজত ও সুজাতাকে হত্যা করতে পারলেই সব ঝামেলাই মিটে যায়। নিরঙ্কুশভাবে সে ও লতা বিনয়েন্দ্রর সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হয়ে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারে।

কিন্তু ইতিমধ্যেই নিরপরাধিনী স্ত্রী ও তার শিশুপুত্রকে ও বিনয়েন্দ্রকে হত্যা করে যে পাপের বোঝা পূর্ণ হয়ে উঠেছিল তারই অমোঘ দণ্ড যে মাথার উপরে নেমে আসতে পারে, পুরন্দর চৌধুরী বোধ হয় স্বপ্নেও তা ভাবে নি।

সাজান ঘুঁটি যে কেঁচে যেতে পারে শেষ মুহূর্তেও তা বোধ হয় ধারণাও করে নি পুরন্দর। এমনিই হয়।

এবং একেই বলে ভগবানের মার। যাঁর সূক্ষ্ম বিচারে কোন ত্রুটি, কোন ভুল থাকে না। যাঁর নির্মম দণ্ড বজ্রের মতই অকস্মাৎ অপরাধী পাপীর মাথার 'পরে নেমে আসে।

নইলে তাঁরই দেওয়া সিংগাপুরী মুক্তা-বিষ খেয়ে লতাকেই বা শেষ মুহূর্তে আত্মহত্যা করে তার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে কেন? আর হতভাগ্য পুরন্দর চৌধুরীকেই বা অন্ধকার কারাকক্ষের মধ্যে ফাঁসির প্রতীক্ষায় দণ্ড পল প্রহর দিন গণনা করতে হবে কেন?

॥ ৪২ ॥

এ গল্পের শেষ এইখানেই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হল না। রজতকে নিজের সম্পত্তির দাবি লিখে দিয়ে পরের দিন যখন সুজাতা আবার লক্ষ্ণৌ ফিরে যাবার জন্য ট্রেনে উঠে চলেছে এবং কামরার খোলা জানালাপথে তাকিয়ে ছিল, এমন সময় পরিচিত একটি কণ্ঠস্বরে চমকে সুজাতা ফিরে তাকাল।

সুজাতা!

তুমি এসেছ!

হ্যাঁ, একটা কথা বলতে এলাম।

কী?

এখন যাচ্ছ যাও, এক মাসের মধ্যেই আমিও ছুটি নিয়ে লক্ষ্ণৌ যাচ্ছি।

সত্যি?

হ্যাঁ।

কিন্তু কেন?

তোমাকে নিয়ে আসতে।

ঢং ঢং করে ট্রেন ছাড়বার শেষ ঘণ্টা পড়ল।

গার্ডের হুইসেল শোনা গেল।

কি, তুমি যে কিছু বলছ না! প্রশান্ত প্রশ্ন করে।

কী বলব?

কেন, বলবার কিছু নেই?

ট্রেনটা ধীরে ধীরে চলতে শুরু করেছে তখন। সুজাতার চোখের কোল দুটো অকারণেই ছল ছল করে আসে। সে কেবল মৃদু কণ্ঠে বলে, না।

সেই মুখখানা যেন আজও ভুলতে পারি নি।

সত্যি, এমন এক একটি মুখ এক এক সময় আমাদের চোখে পড়ে যা কখনও বুঝি মনের পাতা থেকে মুছে যায় না। সে মুখের কোথায় যেন এক বিশেষত্ব মনের পাতায় গভীর আঁচড় কেটে যায়।

এবং সেই মুখখানা যখনই মনের পাতায় ভেসে উঠেছে তখনই মনে হয়েছে কেন এমন হলো। শেষের সেই বিয়োগান্ত দৃশ্যের জন্য দায়ী কে।

কিরীটীর মতে অবিশ্যি সেই বিচিত্র শক্তি যে শক্তি অদৃশ্য, অমোঘ, সেই নিয়তি, নিষ্ঠুর নিয়তিই দায়ী।

কিন্তু তবু আমার এক এক সময় মনে হয়েছে সত্যিই কি তাই! পরক্ষণেই আবার মনে হয়েছে তাই যদি না হবে তো এমনটাই বা ঘটে কেন!

ঘটছে কেন!

থাক। যার কথা আজ বলতে বসেছি তার কথাই বলি।

কিস্তি। কথাটা বলে কিরীটী হাত তুলে নিল।

দেখলাম শুধু কিস্তিই নয়, মাত।

পর পর তিনবার মাত হলাম এইবার নিয়ে এবং ব্যাপারটা যে সুখপ্রদ হয় নি সেটা বোধ হয় আমার মুখের চেহারাতেই প্রকাশ পেয়েছিল।

এবং কিরীটীর নজরেও যে সেটা এড়ায় নি প্রকাশ পেল তার কথায় পরক্ষণেই।

বললে, কি রে, একেবারে যে চুপসে গেলি। মাত হয়েছিস তো আমার হাতে—

অদূরে সোফায় বসে কৃষ্ণা একটা নভেল পড়ছিল। এবং এতক্ষণ আমাদের খেলার মধ্যে একটি কথা বলে নি বা কোন মন্তব্য প্রকাশ করে নি।

কিরীটীর ঐ কথার সঙ্গে সঙ্গে এতক্ষণে সে কথা বললে, হ্যাঁ, কিরীটী

রায় যখন তখন মাত হওয়াটাও তো তোমার গৌরবেরই সামিল হল ঠাকুরপো তার হাতে।

কিরীটী দেখলাম তার স্ত্রীর দিকে একবার আড় চোখে তাকাল মাত্র কিন্তু কোন কথা বললে না।

কৃষ্ণা স্বামীর আড় চোখের দৃষ্টি লক্ষ্য করেও যেন লক্ষ্য করে নি এমনি ভাবে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে পুনরায় বললে, তবে তোমাকে একটা সংবাদ দেওয়া কর্তব্য বলে বোধ করছি, ভদ্রলোক নিজেও এবারে মাত হয়েছেন।

কিরীটী তার ওষ্ঠধৃত পাইপটায় একটা কাঠি জেলে পুনরায় অগ্নি সংযোগে উদ্যত হয়েছিল ; হঠাৎ তার উদ্যত হাতটা থেমে গেল এবং স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললে, কি বললে ?

বললাম আপনিও এবারে মাত হয়েছেন।

কথাটা বলে যেন একান্ত নির্বিকার ভাবেই কৃষ্ণা নভেলের পাতায় আবার মনঃ সংযোগ করল।

মাত হয়েছি !

হুঁ। পূর্ববৎ সংক্ষিপ্ত জবাব।

মানেটা যদি বুঝিয়ে বলতে সখি।

মানে ?

হুঁ।

সে তো অতিশয় প্রাঞ্জল, বেচারী নির্মলশিব সাহেব না বুঝতে পারলেও আমার কিন্তু বুঝতে দেরি হয় নি।

কি, ব্যাপার কি বউদি ? আমি এবার প্রশ্নটা না করে আর পারলাম না। কিরীটী মাত হয়েছে, বেচারী নির্মলশিব সাহেব—

এতক্ষণে কিরীটী হো হো করে হেসে ওঠে।

এবার আমি কিরীটীকেই প্রশ্ন করি, ব্যাপার কি রে ?

জলন্ত পাইপটায় একটা সুখটান দিয়ে কিরীটী বললে, তোকে বলা হয় নি সুব্রত, গত এক মাস ধরে নির্মলশিব সাহেব আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে।

তা যেন বুঝলাম কিন্তু নির্মলশিব সাহেবটি কে ?

মনে নেই তোর সেই যে 'কি আশ্চর্য' নির্মলশিব সাহেব। একদা ব্যারাকপুর থানার ও. সি. ছিল, বছর দুই হল হেড কোয়ার্টারে বদলি হয়ে এসেছে।

এতক্ষণে আমার মনে পড়ে।

এবং সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের চেহারাটিও মনের পাতায় ভেসে ওঠে।

মোটা-সোটা নাদুস-নুদুস নাড়ুগোপাল প্যাটার্ণের ভুঁড়িয়াল সেই ভদ্রলোক। এবং দেহের অনুপাতে পদযুগল যার কিঞ্চিৎ ছোট এবং চৈনিক প্যাটার্ণের বলে বাজারের যাবতীয় জুতোই যার পায়ে কিছুটা সর্বদাই বড় হত।

যার প্রতিটি কথার মধ্যে বিশেষ মুদ্রাদোষ ছিল, কি আশ্চর্য।

বললাম, হঠাৎ সেই নির্মলশিব সাহেব তোকে গত একমাস ধরে অতিষ্ঠ করে তুলেছে মানে?

বলিস না আর তার কথা। আমিও শুনবো না, সেও শোনাবেই।

কৃষ্ণা ঐ সময় টিপ্পনি কেটে বলে ওঠে, অত ভনিতার প্রয়োজন কি। কেউ কোন কথা দশ হাত দূরে বসে বললেও যার ঠিক ঠিক কানে যায় সে ঐ ভদ্রলোকের কথা শোনে নি এ কথাটা আর যেই বিশ্বাস করুক ঠাকুরপোও বিশ্বাস করে না, আমিও করি না। কিন্তু সত্যি কথাটা বলতেই বা অত লজ্জা কিসের। কেন বলতে পারছ না, শুনে বুঝতে পেরেছো, রীতিমত জটিল ব্যাপার, শেষ পর্যন্ত মাত হবে তাই শুনেও না শোনার ভান। এড়িয়ে যাবার অছিলা করছ একমাস ধরে।

তাই সখি, তাই। পরাজয় স্বীকার করছি, হার মানছি। কিরীটী বলে ওঠে।

হ্যাঁ, তাই স্বীকার কর, তাই মানো।

বললাম তো, তোমার কাছে হার মানি সেই তো মোর জয়। কিরীটী হাসতে হাসতে আবার বলে।

কিন্তু কথা বললাম এবার আমি, কিন্তু কি, ব্যাপারটা কি রে?

কে জানে কি ব্যাপার। বলছিল—

কিরীটীর কথা শেষ হল না, সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শোনা গেল।

সঙ্গে সঙ্গে কিরীটীর শ্রবণেন্দ্রিয় সজাগ হয়ে ওঠে, সে বলে, ঐ যে এসে গিয়েছেন জুতো।

জুতো?

হ্যাঁ রে—মনে নেই তোর, নির্মলশিব সাহেবের জুতো সম্পর্কে তার অধীনস্থ কর্মচারীদের সেই বিখ্যাত রসিকতাটা? কে যায়? জুতো। কার? না ভুঁড়ির। ভুঁড়ি কার? নির্মলশিব সাহেবের। সাহেব কোথায়? আর একটু উপরে—

কিরীটীর কথা শেষ হল না, সত্যি সত্যি নির্মলশিব সাহেবই ঘরে এসে প্রবেশ করল। এবং ঘরে ঢুকেই আমার মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকিয়ে রইল।

তারপরই হঠাৎ ভ্রূ সোজা হয়ে এল এবং সহাস্য মুখে বলে ওঠে, কি আশ্চর্য! আরে—সুব্রতবাবু না?

হ্যাঁ—নমস্কার। চিনতে পেরেছেন তাহলে?

চিনব না মানে। কি আশ্চর্য! বলেই হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে নির্মলশিব সাহেব।

বসুন নির্মলশিব বাবু। কিরীটী এবার বলে।

কি আশ্চর্য! বসব না? আরে বসবার জন্যই তো আসা। আর আজ যতক্ষণ না হ্যাঁ বলবেন উঠব না—একেবারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েই এসেছি।

কথাগুলো বলতে বলতে জাঁকিয়ে বসে নির্মলশিব এবং কথা শেষ করে বলে, এই বসলাম।

কি ব্যাপার বলুন তো নির্মলশিব বাবু? এবারে আমিই প্রশ্ন করি।

কি আশ্চর্য! কিছুই জানেন না সত্যি বলছেন আপনি?

সত্যিই জানি না।

কি আশ্চর্য! আরে মশাই সে এক বিশ্রী নাজেহালের ব্যাপার। বুঝলেন কিনা সুব্রতবাবু, গোল্ড, একেবারে যাকে বলে সত্যি সত্যি pure gold মশাই।

গোল্ড?

হ্যাঁ, হ্যাঁ—সোনা, খাঁটি সোনা এনতার স্মাগল করছে

॥ ২ ॥

নির্মলশিববাবুর মুখে গোল্ড এবং সেই গোল্ড স্মাগল কথা দুটি শুনেই বুঝেছিলাম তার বক্তব্যটা কোন পথে এগুচ্ছে। এখন আরও স্পষ্ট হল।

নির্মলশিববাবু আবার বলতে শুরু করে, কিছুই খবর রাখেন না দেখছি।

মৃদু হেসে বললাম, আদার ব্যাপারী আমি। ওসব সোনা-দানার ব্যাপার। কিন্তু কিরীটীর শরণাপন্ন হয়েছেন যখন—

সাধে কি আর হয়েছি মশাই, আমি তো ছাড়, সরকারের এনফোর্সমেন্ট ব্র্যাঞ্চ, কাস্টমস্ এবং স্পেশাল ব্র্যাঞ্চ, সকলের চোখে ধুলো দিয়ে স্রেফ যাকে বলে সকলকে একেবারে গত কয়েক মাস ধরে বুদ্ধু বানিয়ে ছেড়ে দিল।

বুদ্ধ !

তা না হলে আর বলছি কি। স্রেফ বুদ্ধু।

তা কোন হদিসই করতে পারলেন না এখনও ?

কি আশ্চর্য ! কি বললাম তবে ?

তা যেন হল, কিন্তু ব্যাপারটা হঠাৎ কেমন করে আপনাদের নজরে এসে পড়ল, অর্থাৎ বলছিলাম ব্যাপারটা টের পেলেন কি করে ? শুধালাম।

কিরীটী কিন্তু একান্ত নির্বিকার ভাবে পাইপ টেনেই চলেছে সোফায় হেলান দিয়ে দুটি চক্ষু বুজে তখন।

কিন্তু যতই সে চক্ষু দুটি মুদ্রিত করে থাকুক না কেন, স্পষ্টই বুঝতে পারছিলাম তার ঐ নিষ্ক্রিয়তা আদৌ নিষ্ক্রিয়তা নয়, রীতিমতই যাকে বলে তার শ্রবণেন্দ্রিয় দুটি জাগ্রত হয়ে রয়েছে।

অনাগ্রহের ভাবটা তার ভান মাত্রই।

কি আশ্চর্য ! সেও এক অদ্ভুত ব্যাপার। আবার কথা বলে নির্মলশিব।

কি রকম ? শুধালাম।

একটা চিঠি।

চিঠি !

হ্যাঁ। একটা বেনামা চিঠি পেয়ে কর্তাদের সব টনক নড়ে উঠেছে। তাঁদের টনক নড়েছে—আর প্রাণান্ত হচ্ছে আমাদের।

তা সে বেনামা চিঠিটা আপনি দেখেছেন ?

তা আর দেখি নি, কি আশ্চর্য ! কি যে বলেন।

কি লেখা ছিল চিঠিতে ?

কি আশ্চর্য ! মুখস্থ করে নিয়েছি চিঠিটা, আর কি লেখা ছিল তা মনে থাকবে না ! শুনুন, লিখছে, মাননীয় কমিশনার বাহাদুরের সমীপেষু—ভেবে দেখুন একবার সুব্রতবাবু, ইয়ার্কির মাত্রাটা। কমিশনার বাহাদুরের সমীপেষু, কেন রে বাপু, পাকামি করতে কে বলেছিল, জানাতেই যদি হয় তো আগে আমাদের জানালেই হতো ?

তা তো নিশ্চয়ই।

তবেই বুঝুন। পাকামি ছাড়া কি আর বলুন তো।

কিন্তু চিঠিতে কি লেখা ছিল যেন বলছিলেন।

হ্যাঁ, সেই কথাই তো বলছি। লিখছে, আপনি কি খবর রাখেন স্বাধীন

ভারত থেকে একদল চোরা কারবারী কত সোনা গত এক বছর ধরে পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে আমেরিকায় চালান করে দিয়েছে আর আজও দিচ্ছে। এখনও যদি ওই ভাবে সোনার চোরাই রপ্তানি বাধা না দিতে পারেন তো জানবেন আর দু এক বছরের মধ্যে এক তোলা বাড়তি সোনাও এ দেশে আর থাকবে না।

বলেন কি, সত্যি!

কি আশ্চর্য! সত্যি মানে, চিঠিতে তো তাই লিখেছে।

লিখেছে বটে, তবে—

তবে কি?

মানে উড়ো চিঠি তো।

মানে!

মানে বলছিলাম এমনও তো হওয়া অসম্ভব নয় যে আপনাদের খানিকটা নাজেহাল করার জন্যই কোন দুষ্ট প্রকৃতির লোক ঐ উড়ো চিঠিটা দিয়েছে।

হুঁ। আপনি বুঝি তাই ভাবছেন সুব্রতবাবু।

মানে, বলছিলাম ব্যাপারটা খুব একটা অসম্ভব কি?

আরে মশাই, না না—সোনাদানার ব্যাপার ও ঠিকই। তাছাড়া—

তাছাড়া?

গত বছর দুই ধরে কতকগুলো খবরও যে আমরা পেয়েছি সোনা স্মাগলিংয়ের ব্যাপারে। তারপর ওই চিঠি।

কিরীটী এতক্ষণ চুপচাপই ছিল। আমাদের কথার মধ্যে কোন মন্তব্য করে নি। হঠাৎ ওই সময় কিরীটী কথা বললে।

প্রশ্ন করল, নির্মলশিব বাবু?

আজ্ঞে?

বলছিলাম, কিরীটী বললে, চিঠিটা আপনারা কিভাবে পেয়েছিলেন নির্মলশিববাবু? হাতে, না ডাক মারফত?

কি আশ্চর্য! ও সব চিঠি—বেনামা উড়ো ব্যাপার, ডাক মারফতই চলে জানবেন চিরদিন।

চিঠিটা হাতে লেখা, না টাইপ করা? পুনরায় প্রশ্ন করে কিরীটী।

টাইপ করা।

খামে, না পোষ্টকার্ড?

খামে।

খামের উপর ডাকঘরের ছাপটা দেখেছিলেন ?

কি আশ্চর্য ! বিলক্ষণ, তা আর দেখি নি। ভবানীপুরের পোস্ট অফিসের ছাপ মারা ছিল খামটার গায়ে।

ভবানীপুর ডাকঘরের ?

হুঁ।

কিরীটী তারপর চোখ বুজে যেন কি ভাবে। তারপর এক সময় চোখ খুলে বললে, চিঠিটা আপনারা যা ভাবছেন যদি সত্যিই তাই হয় তাহলে তো—

কি ?

তাহলে তো একদিক দিয়ে আপনারা নিশ্চিন্তই হতে পারেন।

নিশ্চিন্ত হতে পারি ?

হু।

কি রকম ?

হ্যাঁ, ধরে নিই যদি ব্যাপারটা সত্যিই, তাতে করে আপনাদের চিন্তার কি আছে এত ?

কি আশ্চর্য ! চিন্তার ব্যাপার নেই ? মানে—

নিশ্চয়ই। ভাঙনের মুখে আর কত দিন বাঁধ দিয়ে রোধ করবে ?

কি বলছেন ?

ঠিকই বলছি। বুঝতে পারছেন না, দলে ভাঙন ধরেছে। দলের কেউ মীরজাফরের রোল নিয়েছে এ নাটকে। অতএব নিশ্চিন্ত থাকুন, পলাশীর যুদ্ধ একটা শীঘ্রই হবে এবং হতভাগ্য সিরাজের পতন অবশ্যম্ভাবী।

কি আশ্চর্য !

আশ্চর্যের আর কি আছে ! প্রবাদই তো আছে History always repeats itself ! ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি—এ যে সর্বকাল ও সর্ববাদীসম্মত। আপনার কর্তাদের শুধিয়ে দেখবেন তাঁরাও কথাটা স্বীকার করবেন।

দোহাই আপনার মিঃ রায়, নির্মলশিব বাবু বলে ওঠে, আর কি আশ্চর্য ! আর আমাকে নাকানিচোবানি খাওয়াবেন না, একটা বুদ্ধি বাতলান।

কিরীটী আবার স্তব্ধ হয়ে যায়। কোন সাড়াই দেয় না।

মিঃ রায় ! করুণ কণ্ঠে আবার ডাকে নির্মলশিব বাবু, কি আশ্চর্য ! বুঝতে পারছেন না কি বিপদেই পড়েছি। এ যাত্রা আমাকে সাহায্য না করলে এই পেনসেনের কাছাকাছি এসে সত্যি বলছি যাকে বলে ভরাডুবি হয়ে যাব, বিশ্রী কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।

অবশ্যই নির্মলশিব সাহেবকে সেবারে কিরীটী শেষ পর্যন্ত সাহায্য করেছিল। এবং কিরীটী সাহায্য না করলে সে বারে সোনা পাচারের ব্যাপারটা আরও কতদিন ধরে যে চলত তার ঠিক নেই।

॥ ৩ ॥

এবং সে কাহিনীও বিচিত্র।

তবে এও ঠিক কৃষ্ণা সেবারে অমন ভাবে হঠাৎ সেদিন খোঁচা দিয়ে সুপ্ত সিংহকে না জাগালে নির্মলশিব বাবুর শিবত্ব প্রাপ্তি তো হতই তার এক চাকুরে ভাই মোহিনীমোহনের মত এবং চিরঞ্জীব কাঞ্জিলালেরও দর্শন আমরা পেতাম না হয়তো।

শুধু কি চিরঞ্জীব কাঞ্জিলাল!

সেই তিলোত্তমা-সম্ভব-কাব্য!

চিরঞ্জীব কাঞ্জিলাল।

তিলোত্তমা।

সত্যি, বার বার কতভাবেই না অনুভব করেছি, কি বিচিত্র এই দুনিয়া।

কিন্তু যাক্, যা বলছিলাম।

কিরীটীর ঐ ধরনের নিরাসক্তির কারণটা নির্মলশিব বাবুর জানা ছিল না, কিন্তু আমাদের—মানে আমার ও কৃষ্ণার জানা ছিল খুব ভালই।

সে কিরীটীর এক ব্যাধি।

মধ্যে মধ্যে সে এমন ভাবে শামুকের মত নিজেকে খোলের মধ্যে গুটিয়ে নিত যে কিছুতেই তখন যেন তার সেই নিরাসক্তির জাগ্রত তন্দ্রা ভাঙান যেতো না।

সত্যিই বিচিত্র তার সেই আত্মসমাহিতের পর্ব।

বলাই বাহুল্য, আত্মসমাহিতের সেই পর্ব তখন কিরীটীর চলেছিল বলেই নির্মলশিব বাবু প্রত্যহ এসে এসে ফিরে যাচ্ছিল।

শেষ পর্যন্ত একদিন বিধি যদি হন বাম তো ভাগ্যের হাতেই আত্মসমর্পণ ব্যতীত আর উপায় কি ভেবে সে কৃষ্ণার কাছেই আত্মসমর্পণ করল: আমাকে এবারটা বাঁচান মিসেস রায়।

তাই তো নির্মলশিব বাবু মহাদেবটির আমার এখন জেগে ঘুমাবার পালা চলেছে। নিজের নেশায় নিজে এখন ঊর্ধ্বনেত্র। ওর কানে তো এখন কোন কথাই যাবে না। কৃষ্ণা বলে।

কিন্তু আমি যে অনন্যোপায় মিসেস রায়।

আচ্ছা দেখি।

কিন্তু নানা ভাবে অনেক চেষ্টা করেও কৃষ্ণা কিরীটীর সাড়া জাগাতে পারে না।

তবু নির্মলশিবও আশা ছাড়ে না, সেও আশা ছাড়ে না।

অবশেষে সেদিন কিস্তি মাতের ব্যাপারের মোক্ষম মুহূর্তে ছোট্ট একটি মোক্ষম বাণে কিরীটীর নিদ্রা ভঙ্গ হলো।

কিন্তু পরে কথা প্রসঙ্গে জানতে পেরেছিলাম সেবারকার কিরীটীর নিরাসক্তির ব্যাপারটা সত্যি সত্যিই নিরাসক্তির তন্দ্রা ছিল না।

সোনা স্মাগলের ব্যাপারটা ইতিপূর্বেই তার মনকে নাড়া দিয়েছিল। এবং কিছুদিন যাবৎ ঐ ব্যাপারের প্রস্তুতির মধ্যেই ডুবে ছিল সে।

কাজেই কৃষ্ণার কিরীটীর তন্দ্রা ভাঙানোর ব্যাপারটা বাইরে থেকে আকস্মিক হলেও ভিতরে ভিতরে সত্যিই আকস্মিক ছিল না।

কিন্তু যা বলছিলাম—সেদিনকার কথা।

কিরীটীর সহসা আবার সাড়া পাওয়া গেল : নির্মলশিব বাবু?

আজ্ঞে?

মোহিনীমোহন চৌধুরীর কথা মনে আছে আপনার?

মোহিনীমোহন মানে আমাদের সেই ব্রাদার অফিসার মোহিনীমোহন?

হ্যাঁ—যিনি অকস্মাৎ মাস ছয়েক আগে এক রাত্রে এই কলকাতা শহর থেকে সুব্রতর ভাষায় যাকে বলে স্রেফ একেবারে কর্পূরের মত উবে গেলেন। এবং যার কোন পাত্তাই এখন পর্যন্ত আপনাদের বড় কর্তারাও করতে পারেন নি, মনে আছে তাঁর কথা?

আহা, মনে থাকবে না, মনে আছে বৈকি। মোহিনীর বেচারী বুড়ী মার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, সে কি কান্না—

কিন্তু আপনার তো শুধু মাতৃদেবীই নন, ওই সঙ্গে স্ত্রী ও আপনার পঞ্চকন্যা আছেন—এক সঙ্গে বার জোড়া চক্ষু যদি কাঁদতে শুরু করে—

মানে, মানে—

মানে অতীব প্রাঞ্জল। সোনার কারবার যাদের তাদের হৃদয়টা এ সোনার মতই নিরেট হয়ে থাকে বলেই আমার ধারণা।

সত্যি কথা বলতে কি, এ সময় আমরাও কিরীটীর কথাটা কেমন যেন

হেঁয়ালির মতই বোধ হচ্ছিল ; কারণ তখনও আমি বুঝতে পারি নি অতঃপর কোন দিকে কিরীটী মোড় নিচ্ছে।

নির্মলশিববাবু ? আবার কিরীটী ডাকল।

বলুন।

এবং প্রায় ওই সময়েই এই কলকাতা শহরে একটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল মনে আছে বোধ হয় ?

কোন্—কোন্ হত্যাকাণ্ডের কথাটা বলছেন বলুন তো মিঃ রায় ?

বলছি। তবে একটা ব্যাপার সে সময় অনেকেই লক্ষ্য করেন নি যে, নৃশংস দ্বিতীয় সেই হত্যাকাণ্ডটা ঘটে ঠিক মোহিনীমোহনের নিরুদ্দেশ হবার সাত দিন পরে।

তার মানে ?

এতক্ষণে দেখলাম সত্যি সত্যিই যেন নির্মলশিববাবু সচকিত হয়ে ওঠে।

মানে আর কি, খুব সম্ভবত অর্থাৎ মোহিনীমোহনের নিরুদ্দেশ ও ওই হত্যাকাণ্ড ব্যাপার দুটো যোগ দিলে দুয়ে দুয়ে চারের মতই তাদের যোগফল দাঁড়াবে।

কিন্তু—কিন্তু—

তাই বলেছিলাম, এ সোনা নয়—মায়ামৃগ। মৃত্যুবাণ যে কখন কোন পথে কার বুকে এসে বিঁধবে—

মনে হল কিরীটীর এই কথায় যেন নির্মলশিব সত্যি সত্যিই একেবারে হাওয়া বের হয়ে যাওয়া বেলুনের মতই চুপসে গেল মুহূর্তে।

এবং হঠাৎ যেন একেবারে চুপচাপ হয়ে গেল।

কিরীটীর সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথায় আমার তখন মনে পড়ে যায় ছয় মাস আগেকার সত্যি সত্যিই সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথাটা।

নৃশংসতারও বুঝি একটা সীমা আছে ; কিন্তু সেই বিশেষ হত্যাকাণ্ডটা যেন সে সীমাকেও অতিক্রম করে গিয়েছিল।

সংবাদপত্রে সেদিন প্রথম ব্যাপারটা জানতে পেরে সত্যিই যেন মূক হয়ে গিয়েছিলাম।

আজকের দিনের সভ্য মানুষের মনের কি নির্মম বিকৃতি !

অবশ্যই আজকের দিনে শিক্ষা, কৃষ্টি ও আভিজাত্যের দিক দিয়ে মানুষ

যত এগিয়ে চলেছে তাদের চরিত্রও যেন ততই বিচিত্র সব বিকৃতির মধ্যে দিয়ে বীভৎস হয়ে উঠছে।

তবু কিন্তু সেদিনকার সেই মর্মন্তুদ হত্যাকাণ্ডটা মনকে আমার বিমূঢ় বিকল করে দিয়েছিল।

কোন একটি মানুষের দেহকে সম্ভবতঃ কোন অতীব ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দেহের সেই টুক্‌রোগুলো বালীগঞ্জ স্টেশনের ধার থেকে কালীঘাট ব্রীজের ওপারে বেলভেডিয়ার পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

শহরের এক বিখ্যাত সার্জেনের সাহায্যে পুলিশের কর্তৃপক্ষ পরে সেই দেহখণ্ডগুলিকে একত্রিত করে সেলাই করে জোড়া দেয়।

তিন্তু তথাপি সে দেহ কোনমতেই আইডেনটিফাই করতে পারে না।

কারণ সেই খণ্ডগুলিতে কোন চামড়া, নখ বা কেশের কোন অস্তিত্ব না থাকায় দেহটি পুরুষ বা নারীর সেটুকুও তখন বোঝবার উপায় ছিল না।

কিরীটীর সাহায্য নেবার জন্য কর্তৃপক্ষ সে সময় তাকেও ডেকে নিয়ে মর্গে সেই সেলাই-করা দেহটি দেখিয়েছিল।

কিরীটী সে সময় কর্তৃপক্ষকে কেবল বলে এসেছিল, ওই সেলাই-করা বস্তুটির একটা ফটো তুলে রাখুন আর এই তল্লাট ও এর আশপাশের এলাকাগুলো ভাল করে একবার খোঁজখবর করে দেখুন।

বলাই বাহুল্য সেই সময়ের কিছু আগে থাকতেই কিরীটীর নিষ্ক্রিয় জাগরণ নিদ্রা চলেছে। অতএব সুপ্ত সিংহকে জাগান যায় নি ওই সময়।

অবশ্যই ব্যাপারটা ওইখানেই সে সময় চাপা পড়ে গিয়েছিল।

তবে কিরীটী কর্তৃপক্ষকে ওই সময় আরও একটা কথা বলেছিল, যার মধ্যে মোহিনীমোহন চৌধুরীর নিরুদ্দেশের ব্যাপারের একটা যোগাযোগের ইঙ্গিতও ছিল।

কিন্তু কর্তৃপক্ষ সেদিকে তখন দৃষ্টি দেওয়াই প্রয়োজন বোধ করেন নি।

তাঁদের তখন স্থির বিশ্বাস মোহিনীমোহন চৌধুরী সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়েছেন, কারণ তাঁর চরিত্রের মধ্যে সর্বস্ব ত্যাগের নাকি একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তো ছিলই—তাঁর কোষ্ঠিতেও নাকি সন্ন্যাস যোগ ছিল।

আরও একটা বিচিত্র ব্যাপার সে সময় ঘটেছিল।

মোহিনীমোহনের মা মোহিনীর নিরুদ্দিষ্ট হবার ঠিক পাঁচ দিন পরে হরিদ্বার থেকে ডাকযোগে পুত্রের হস্তলিখিত একটা চিঠি পান।

তাতে লেখা ছিল: আমি চললাম, আমার খোঁজ করো না। ইতি মোহিনী।

কর্তৃপক্ষ ওই চিঠিটা পেয়ে সে সময় দুর্নাম ও অকৃতকার্যতার লজ্জার হাত থেকে বুঝি নিষ্কৃতিও পেয়েছিল।

॥ ৪ ॥

নির্মলশিব আবার প্রশ্ন করল, কিন্তু কোন হত্যাকাণ্ডর কথাটা বলছিলেন মিঃ রায়?

কিরীটী তখন সংক্ষেপে সেই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের কথাটা বিবৃত করে গেল।

I see! আপনি সেই হত্যাকাণ্ডের কথাটা বলছেন।

হ্যাঁ।

কিন্তু?

কি?

কিন্তু মোহিনীমোহন তো সন্ন্যাস নিয়েছেন—এবং তার প্রমাণও আছে তাঁর সেই চিঠি—

হ্যাঁ, সেই চিঠি, কিন্তু সে চিঠি যে তাঁরই লেখা তার তো অবিসংবাদী প্রমাণ সেদিন আমরা পাই নি নির্মলশিববাবু?

সে কি! পেয়েছি বৈকি। তার মা-ই তো ছেলের হাতের লেখা দেখে চিনেছিলেন।

না—

মানে?

মানে হচ্ছে মোহিনীমোহনের মা তখন চোখে ছানি পড়ায় কিছুই এক প্রকার দেখতে পান না।

ছানি পড়েছিল তাঁর চোখে?

হ্যাঁ।

কিন্তু সে কথা আপনি জানলেন কি করে মিঃ রায়?

কারণ মোহিনীমোহনের ছোট একজন ভাই আছে জানেন?

হ্যাঁ, রমণীমোহন।

সেই রমণীমোহনই সে সময় এসেছিলেন আমার কাছে ওই ব্যাপারে তাঁদের সাহায্য করবার জন্য। এবং তাঁর মুখেই সেদিন সে কথা আমি শুনেছিলাম।

কিন্তু—

যাক সে কথা নির্মলশিববাবু, বলছিলাম সেদিনও যা বলেছিলাম আপনার কর্তৃপক্ষকে আজ আপনাকেও তাই বলব, সে চিঠি মোহিনীমোহন চৌধুরীরই যে হাতের লেখা তার কোন সত্য বা নির্ভরযোগ্য প্রমাণ ছিল না।

তবে কি আপনি মনে করেন মিঃ রায়, সত্যি সত্যিই—

হ্যাঁ, সেই সোনার হরিণের পশ্চাদ্ধাবনের জন্যই সত্য তাঁর মৃত্যু—অর্থাৎ তাঁর অকাল মৃত্যু হয়েছিল দানবীয় নৃশংস ভাবে।

ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করছিলাম ধীরে ধীরে নির্মলশিব সাহেবের সমস্ত উৎসাহই যেন নির্বাপিত হয়ে এসেছে।

তাহলে দেহটা তাঁর কোথায় গেল? শুধাল এবারে একটা ঢোক গিলে নির্মলশিব।

দেহ?

হ্যাঁ—

খোঁজেন নি ভাল করে চোখ মেলে তাই পান নি, নচেৎ নিশ্চয়ই পেতেন।

কিন্তু—

তবে মনে হচ্ছে এবারে সন্ধান পাবেন।

পাব!

পাবেন।

কৃষ্ণা কখন এক ফাঁকে ইতিমধ্যে ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিল লক্ষ্য করি নি। এমন সময় জংলীর হাতে চায়ের ট্রে নিয়ে সে পুনরায় ঘরে এসে প্রবেশ করল।

আমি ও কিরীটী একটা করে ধূমায়িত চায়ের কাপ তুলে নিলাম কিন্তু নির্মলশিববাবু জংলীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, ‘চা নয়, আমাকে এক গ্লাস জল দাও—

নির্মলশিবের শুষ্ক কণ্ঠে সেই ‘এক গ্লাস জল’ কথাটি যেন অতি কষ্টে উচ্চারিত হল।

কৃষ্ণা হেসে বলে, নিন, চা খান।

করুণ দৃষ্টিতে তাকাল নির্মলশিব কৃষ্ণার মুখের দিকে এবং পূর্ববৎ শুষ্ক কণ্ঠেই বললে, চা খাব?

হ্যাঁ—নিন।

কিরীটী টিপ্পনী কাটল, আরে মশাই, মৃত্যুকে ভয় করলে কি আপনাদের চলে—আপনাদের তো জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য—

অতঃপর চা নয়, যেন চিরতার জল এইভাবে অতিকষ্টে একটু একটু করে চাটুকু গলাধঃকরণ করলে নির্মলশিব সাহেব।

তারপর নিঃশেষিত চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বললে, কি আশ্চর্য, এ যে দেখছি কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরুল বলে মনে হচ্ছে—

কিরীটী মৃদু হেসে আবার টিপ্পনী কাটল, হ্যাঁ, ঢোঁরা নয়, জাত সাপ একেবারে। তা যাক গে সে কথা, আপনাকে আমি সাহায্য করব নির্মলশিববাবু, তবে এক শর্তে।

শর্তে ?

হ্যাঁ, আপাতত আপনি ঐ ব্যাপারে আমাকে যে সঙ্গে নিয়েছেন সে কথা কাউকেই জানাতে পারবেন না।

বেশ।

আপনার কর্তৃপক্ষকেও নয় কিন্তু।

তাই হবে।

সেদিনকার মত নির্মলশিব গাত্রোত্থান করল।

নির্মলশিবের প্রস্থানের পর আধ ঘণ্টা কিরীটী যেন কেমন ধ্যানস্থ হয়ে বসে রইল। দুটি চক্ষু বোজা। বুঝলাম কিরীটী নির্মলশিবের ব্যাপারটাই চিন্তা করছে।

অগত্যা আজ আর এ সময় এখানে বসে থাকা বৃথা। উঠব উঠব ভাবছি এমন সময় কিরীটী সহসা চক্ষু মেলে একটা আড়মোড়া ভেঙে বললে, চল সুব্রত, একটু সন্ধ্যার হাওয়া খেয়ে আসা যাক্‌ পদব্রজে।

জুন মাস—প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময় সেটা। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে এলেও বাইরের প্রচণ্ড তাপ যে এখনও অগ্নি বর্ষণ করছে সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ আমি।

কিরীটীর এয়ার কন্‌ডিশন ঘরে বরং আরামেই বসে আছি, তাই বললাম, বাইরে এখনও গরম।

চল, চল—বেশ ফুরফুরে দখিনা হাওয়া বাইরে দেখবি।

সত্যি সত্যিই অতঃপর কিরীটী উঠে দাঁড়াল।

কৃষ্ণাও এবারে স্বামীর মুখের দিকে একটু বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে শুধাল, সত্যিই বেরুচ্ছ নাকি ?

হ্যাঁ, যাই—অনেকদিন ঘরের বাইরে পা দিই নি। ভবানীপুর অঞ্চলটার মধ্যে নিশ্চয়ই অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বলতে বলতে কিরীটী ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কিরীটী ঘর থেকে বের হতেই সহাস্যে কৃষ্ণা বললে, ভাগ্যে তুমি দাবা খেলায় আজ ওর কাছে মাত হয়েছিলে ভাই, নচেৎ সত্যি বলছি, গত ছয় সাত মাস ও ঘরের বাইরেই পা দেয় নি।

কিন্তু তাতে করে তো তোমার দুঃখ হওয়া উচিত নয় বউদি। বরং—

না ভাই, ওকে নিষ্ক্রিয় দেখলে কেমন যেন আমার ভয় ভয় করে

ভয় করে নাকি!

হ্যাঁ, সে সময়টা ও যেন কেমন আলাদা মানুষ হয়ে যায়। কেমন অন্যমনস্ক—

হবেই তো, ও হচ্ছে প্রতিভার আত্মকণ্ডূয়ন প্রতিভা জেনো চিরদিনই একক—নিঃসঙ্গ।

আমাদের কথার মধ্যেই কিরীটী প্রস্তুত হয়ে পুনরায় ঘরে এসে ঢুকল। বললে, চল—

॥ ৫ ॥

দুজনে রাস্তায় বের হয়ে হেঁটে চললাম।

সন্ধ্যার অন্ধকার সবে ঘন হয়ে এসেছে, চারিদিকে রাস্তায় ও দোকানে দোকানে আলো জ্বলে উঠতে শুরু করেছে।

কিরীটী কিন্তু মিথ্যা বলে নি।

বাইরে সত্যিই যেন ভারি একটা মিষ্টি হাওয়া ঝিরঝির করে বইছিল।

সারাটা দিনের প্রচণ্ড তাপের দহনের পর ঐ ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়াটুকু সত্যিই উপভোগ্য।

কিন্তু রাস্তায় বের হয়ে কিরীটী যেন হঠাৎ কেমন বোবা হয়ে যায়।

নিঃশব্দে রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে লক্ষ্য করলাম কেবল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে।

অফিসের ছুটির পর ঘরমুখো হাজার হাজার চাকুরেদের রাস্তায় ও ট্রামে-বাসে বাদুর-ঝোলা ভিড় চোখে পড়ে।

হঠাৎ কিরীটী এক সময় বলে, শেষ কবে আদম সুমারী হয়েছে রে সুব্রত?

কেন ?

না, তাই বলছি। অনেকদিন বোধ হয় জনসংখ্যা গোনা হয় নি ?

বুঝলাম, মানুষের ভিড়কে লক্ষ্য করেই কিরীটীর ঈদৃশ বক্রোক্তি।

হেসে বললাম, জনসংখ্যা তো বাড়ছেই।

বাড়ছে বলেই তো এত খাদ্যাভাব, এত বাসস্থানের অভাব, আর তাই ক্রাইমও বেড়ে চলেছে। তবে লোকগুলোকে বাহবা না দিয়ে পারছি না।

কাদের কথা বলছিস ?

কেন ? যারা স্বর্ণর ব্যবসায়ে নেমেছে। যারা নির্মলশিবের মাথার চুলগুলো প্রায় পাকিয়ে তুলল।

হাসলাম আমি সশব্দে।

না রে না, হাসি নয়। কথাই তো আছে—অভাবেই স্বভাব নষ্ট, কিন্তু আমি ভাবছি—

কি ?

ভেক না নিলে তো ভিক্ষার্জন হয় না, তা কিসের ভেক নিয়েছে তারা ঐ স্বর্ণ-মৃগয়ায় ? বলতে বলতে চরকডাঙার কাছাকাছি এসে থেমে পড়ল ও।

কি রে, থামলি কেন ?

বিরাট ঐ নিয়ন বোর্ডটা লক্ষ্য করেছিস ? লাল সবুজের ঝিলিক হেনে জ্বলছে নিভছে। মাস ছয়েক আগেও তো ওটা দেখেছি বলে কই মনে পড়ছে না !

কিরীটীর কথায় সামনের দিকে তাকাতেই নজরে পড়ল, বিরাট একটি নিয়ন বোর্ড চারতলা একটা নতুন বাড়ির এক তলার মাথায় জ্বলছে নিভছে।

ওভারসিজ লিংক। বিচিত্র নামটা। নীচে লেখা গবর্ণমেণ্ট কনট্রাকটার অ্যাণ্ড জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার।

বাড়িটা তো দেখছি নতুন। কিরীটী পুনরায় মৃদুকণ্ঠে বললে।

হ্যাঁ, তবে একেবারে নতুন নয়, বছর খানেক হল বাড়িটা তৈরি হয়েছে।

ওভারসিজ লিংক কারবারটিও তা হলে নতুনই বল। বলতে বলতে কিরীটী পূর্ববৎ ফুটপাতের উপর দাঁড়িয়েই দেখলাম সেই নতুন চারতলা বাড়িটাই লক্ষ্য করছে।

লক্ষ্য করতে করতেই আবার এক সময় বললে, দোতলা, তিনতলা, আর চারতলা দেখছি ফ্ল্যাট সিস্টেমে ভাড়া দিয়েছে। কিন্তু—

কিন্তু কি ?

ব্যবসার আড্ডা ছেড়ে এখানে এসে অমন জাঁকজমক করে অফিস খুলেছে—

সে অঞ্চলে হয়তো তেমন মনোমত বাড়ি পায় নি।

তা বটে, বলতে বলতে লক্ষ্য করি, সেই অফিসের দিকেই এগুচ্ছে কিরীটী।

একটু অবাক হয়েই প্রশ্ন করি, কোথায় চললি?

চল, একবার অফিসটায় ঢুঁ দিয়ে আসা যাক। খোলাই যখন আছে এখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

তা যেন হল, কিন্তু হঠাৎ অর্ডার সাপ্লাই অফিসে তোর কি প্রয়োজন পড়ল?

আমার যে এখন সেই অবস্থা: খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর। চল—চল।

আমাকে আর দ্বিতীয় কোন প্রশ্ন বা বাদ-প্রতিবাদের অবকাশ মাত্রও না দিয়ে সহসা লম্বা লম্বা পা ফেলে সত্যি সত্যিই দেখি, ও ওভারসিজ লিংকের খোলা দ্বারপথের দিকেই এগিয়ে চলেছে।

অগত্যা অনুসরণ করতেই হল ওকে।

দরজার গোড়াতেই চাপদাড়ি শিখ দারোয়ান রাইফেল হাতে একটা টুলের উপর বসে প্রহরায় নিযুক্ত ছিল। আমাদের দেখে সেলাম জানিয়ে কাচের স্প্রিংডোর ঠেলে রাস্তা করে দিল।

ঘরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঠাণ্ডা একটা হাওয়ার ঝাপটা যেন সর্বাঙ্গ জুড়িয়ে দিল। এয়ার-কনডিশন করা ঘর বুঝলাম।

ঘর বলব না, বিরাট একটা হলঘরই বলা উচিত। একধারে কাউন্টার, অন্য দিকে পর পর তিনটি কাঠের পার্টিশন দেওয়া কিউবিকল।

দেওয়ালে দেওয়ালে ফ্লুরেসেন্ট টিউবের সাদা ধবধবে আলো জ্বলছে।

ঝকঝকে তকতকে পালিশ করা সব চেয়ার টেবিল।

এক কোণে সুসজ্জিত সোফা ইত্যাদি—ভিজিটার্সদের বসবার স্থান।

মেঝেতে দামী পুরু কার্পেট বিস্তৃত, কিন্তু সমস্ত কক্ষটিতে তখন নজরে পড়ল গুটি দু-তিন লোক মাত্র কাউন্টারের অপর দিকে টেবিলের সামনে বসে কি সব কাগজপত্র নিয়ে কাজ করছে।

একজন উর্দিপরা বেয়ারা এগিয়ে এল: কি চাই?

বড় সাহেব আছেন তোমাদের ?

সাহেব তো নেই। সেক্রেটারী দিদিমণি আছেন।

সেক্রেটারী দিদিমণি ?

আজ্ঞে।

বেশ, তাকেই বল গিয়ে একজন বাবু জরুরী কাজের জন্য দেখা করতে চান।

বসুন, খবর দিচ্ছি। বেয়ারা চলে গেল।

লক্ষ্য করলাম, বেয়ারা অদূরবর্তী একটা কিউবিকলের সুইং ডোর ঠেলে ভিতরে গিয়ে ঢুকল। আমরা সোফায় বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

বসে বসে আমি ভাবছি, কিরীটীর মতলবখানা কি। হুম করে এই অফিসে এসে ঢুকল কেন ও, তবে কি ওর ধারণা এই অফিসটাই চোরাই সোনার কারবারের কেন্দ্রস্থল ?

কিন্তু যদি ব্যাপারটা সত্যিই হয় তো স্বীকার করতেই হবে, অমন একটা চোরাই কারবার এমন প্রকাশ্য একটা স্থানে বসে জাঁকজমক সহ করার মধ্যে দুঃসাহসিকতা আছে সন্দেহ নেই। এবং যারাই ঐ কারবার করুক না কেন, তাদের সে দুঃসাহসটা রীতিমতই বুঝি আছে।

যাই হোক একটু পরেই কিন্তু বেয়ারা ফিরে এল। বললে, চলুন—

বেয়ারার নির্দেশমত আমরা সেক্রেটারী দিদিমণির কিউবিকলের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলাম। এবং প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই সুমিষ্ট নারীকণ্ঠে আহ্বান এল : বসুন।

কণ্ঠস্বর নয়, যেন সুরলহরী। আর শুধু কি সুরলহরীই, ঐ সঙ্গে রূপ এবং সাজ-সজ্জায়ও যেন অসামান্যা। এক কথায় সত্যই অতুলনীয়া। এবং সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য পড়ল আমার সম্মুখে উপবিষ্টা সেই অসামান্যা নারীর দুটি চক্ষুর প্রতি।

তীক্ষ্ণ ধারালো ছুরির ফলার মতো সে দুটি চক্ষুর দৃষ্টি।

সে দৃষ্টি কিরীটীর প্রতি স্থির নিবদ্ধ।

মুহূর্তের স্তব্ধতা। তারপরই প্রসন্ন একটুকরো হাসিতে তরুণীর মুখখানি যেন ভরে গেল। সে বললে, বসুন।

॥ ৬ ॥

বসলাম পাশাপাশি দুজনে দুটি চেয়ারে।

আজও মনে আছে রূপ অনেক এ পোড়া চোখে পড়েছে কিন্তু রূপের সঙ্গে বুদ্ধির ওরকম প্রাখর্য সত্যিই বুঝি আর চোখে পড়ে নি।

কিরীটী ফেরার পথে আমার প্রশ্নের উত্তরে সেদিন বলেছিল, তিলোত্তমা।

সত্যিই তিলোত্তমা।

আপনাদের কি করতে পারি বলুন? পুনরায় তরুণী প্রশ্ন করল।

আপনাদের ম্যানেজারের সঙ্গেই আমার দরকার ছিল।

মিঃ মল্লিক তো এখন নেই, আপনি তা হলে কাল দুপুরের দিকে আসুন। তবে কোন অর্ডার সাপ্লায়ের ব্যাপার হলে আমাকে বলতে পারেন।

অবশ্য অর্ডার সাপ্লায়ের ব্যাপারই। তবে—

কি সাপ্লাই করতে হবে?

আমার নিজস্ব একটা ছোটখাটো কেমিকেলের কারখানা আছে। তারই কিছু অর্ডার আমি ফরেন থেকে পেয়েছি। আপনাদের থ্রু দিয়ে সেটা আমি সাপ্লাই করতে চাই—

ও। তা সে রকম কোন সাপ্লাই তো আমরা করি না।

অবশ্যই আপনাদের আমি একটা ওভার-রাইডিং কমিশন দেব।

আপনি বরং কাল এসে ম্যানেজার মিঃ মল্লিকের সঙ্গেই দেখা করবেন।

বেশ, তাই করব। আমাদের কথাটা তাহলে তাঁকে বলে রাখবেন।

কি নাম বলব? তরুণী প্রশ্ন করে।

কিরীটী কি যেন বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। বাইরে একটা পুরুষকণ্ঠে বচসা শোনা গেল।

আরে রেখে দে তোর সেক্রেটারী দিদিমণি। ঘরে লোক আছে দেখা করবে না! তার বাপ দেখা করবে, চোদ্দ পুরুষ করবে—হামভি আর্থার হ্যামিলটন হ্যায়—

সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম আমাদের সামনে উপবিষ্টা তরুণীর মুখ থেকে অমায়িক ভাবটা যেন মুহূর্তে নির্বাপিত হয়ে গেল।

সমস্ত মুখখানা তো বটেই এবং দেহটাও সেই সঙ্গে সঙ্গে যেন কঠিন ঋজু হয়ে উঠল।

পাশ থেকে একটা প্যাড ও পেনসিল তুলে নিয়েছিল তরুণী ইতিমধ্যে,

বোধ করি কিরীটীর নামটাই টুকে নেবার জন্যে, হাতের পেন্সিল হাতেই থেকে গেল।

পরমুহূর্তেই একটা দমকা হাওয়ার বেগে ঘরের সুইং ডোর ঠেলে খুলে যে লোকটি ঠিক ভগ্নদূতের মতই ভিতরে এসে প্রবেশ করল সে দর্শনীয় নিঃসন্দেহে।

আমরা যে ঘরের মধ্যে বসে আছি তা যেন ভ্রূক্ষেপও করল না।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সামনে চেয়ারে উপবিষ্ট তরুণীকে সম্বোধন করে বললে, আমি জানতে চাই সীতা, তুমি আমার ওখানে ফিরে যাবে কি না? Say—yes or no।

আগন্তুককে দেখছিলাম আমি তখন। ঢ্যাঙা লম্বা চেহারা। একমুখ দাড়ি, ঝড়ো কাকের মত একমাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, তৈলহীন রুক্ষ। ডান কপালে দীর্ঘ একটা ক্ষতচিহ্ন। নাকটা তরোয়ালের মত যেন ধারালো তীক্ষ্ণ।

পরিধানে একটা জীর্ণ মলিন ক্রিজ ভাঙা কালো গরম কোট ও অনুরূপ সাদা ময়লা জিনের প্যাণ্ট। গলায় লাল বুটি-দেওয়া পুরাতন একটা টাই।

আরও চেয়ে দেখলাম তরুণীর মুখখানা অসহ্য ক্রোধে আর আক্রোশে যেন সিঁদুর বর্ণ ধারণ করেছে।

আগন্তুক আবার বললে, Say—yes or no।

বেয়ারাটাও ইতিমধ্যে আগন্তুকের সঙ্গে সঙ্গেই তার পিছনে ঘরে এসে ঢুকেছিল।

বেচারী মনে হল যেন আকস্মিক ঘটনায় একটু হতভম্ব হয়েই নির্বাক হয়ে গিয়েছে।

সহসা তরুণী সেই হতভম্ব নির্বাক বেয়ারার দিকে তাকিয়ে বললে, এই, হাঁ করে চেয়ে দেখছিস কি, দারোয়ানকে ডাক।

সঙ্গে সঙ্গে খিঁচিয়ে উঠলো আগন্তুক যেন, কি, দরোয়ান দেখাচ্ছ, আর্থার হ্যামিলটনকে আজও চেন নি সুন্দরী। সব ফাঁস করে দেব। সব—একেবারে চিচিং ফাঁক করে দেব—

সহসা ঐ সময় পিছনের সুইংডোরটা আবার খুলে গেল এবং স্ল্যাক্ ও হাফসার্ট-পরিহিত বিরাট দৈত্যাকৃতি একজন লোক এসে যেন অকস্মাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকল ও বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে ডাকল, আর্থার—

সঙ্গে সঙ্গে জোঁকের মুখে যেন নুন পড়ল।

হ্যামিলটন সাহেব সেই ডাকে ফিরে দাঁড়িয়ে আগন্তুকের মুখের দিকে তাকিয়ে এত হম্বিতম্বি ক্ষণপূর্বের যেন দপ্ করে নিভে গেল।

মুহূর্তে যাকে বলে একেবারে যেন চুপসে গেল মানুষটা।

ইয়ে—স্ স্যা—র—কথাটা বলতে গিয়ে তোতলায় হ্যামিল্টন।

কাম অ্যালং। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

প্রভুভক্ত কুকুর যেমন প্রভুর ডাকে তাকে অনুসরণ করে ঠিক তেমনি করেই যেন মাথা নীচু করে নিঃশব্দে সেই দৈত্যাকৃতি আগন্তুকের সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বের হয়ে গেল হ্যামিলটন।

দেখলাম সেক্রেটারী দিদিমণি যেন কেমন বিব্রত ও থতমত খেয়ে বসে আছে।

আকস্মিক যে এমনি একটা ব্যাপার ঘটে যাবে বেচারীর যেন ক্ষণপূর্বে স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

কিরীটী মৃদু কণ্ঠে বললে, তাহলে আমরা আজকের মত আসি।

তরুণী যেন চমকে ওঠে। বলে, অ্যাঁ, যাবেন!

হ্যাঁ, আমরা চলি।

বেশ।

অতঃপর কিরীটীর নিঃশব্দ ইঙ্গিতে কিরীটীর পিছনে পিছনে আমি ঘর থেকে বের হয়ে এলাম।

কিউবিক্যালের বাইরে এসে এদিক ওদিক তাকালাম, কিন্তু সেই হলঘরের মধ্যে কোথায়ও ক্ষণপূর্বের দৃষ্ট সেই বিচিত্র বেশভূষা পরিহিত আর্থার হ্যামিলটন বা দৈত্যাকৃতি সেই লোকটাকে দেখতে পেলাম না।

শুধু তাই নয়, হলঘরে আগে যাদের কাজ করতে দেখেছিলাম তাদেরও কাউকে আর দেখতে পেলাম না ঐ সময়।

হলঘরটা তখন শূন্য। দুজনে বাইরে বের হয়ে এলাম।

॥ ৭ ॥

রাস্তায় পড়ে কিরীটীর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে তখনো ভাবছি, ব্যাপারটা কি হলো?

কিরীটীও স্তব্ধ হয়ে হেঁটে চলেছে।

কিন্তু কিরীটী খুব বেশী দূর অগ্রসর হলো না। পনের বিশ গজ হেঁটে গিয়ে ঐ ফুটপাতেই একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে হিন্দুস্থানী

পানওয়ালাকে বললে বেশ ভাল করে জর্দা কিমাম দিয়ে দুটো পান তৈরী করতে।

পানওয়ালা পান তৈরী করে দিল।

পান নিয়ে দাম মিটিয়ে দিয়ে, পান মুখে পুরে দিয়ে বেশ আরাম করে কিরীটী চিবুতে লাগল সেই দোকানের সামনেই ফুটপাতের উপর দাঁড়িয়ে।

নড়বার নামগন্ধও নেই যেন। বুঝতে পারি, ঐ সময় পান কেনা ও পান খাওয়া কিরীটীর একটা ছল মাত্র। কিছু সময় হরণ করতে চায় সে ঐখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিশেষ কোন উদ্দেশ্যেই।

ইতিমধ্যে দেখি দিব্যি পানওয়ালার সঙ্গে এটা ওটা আলাপ শুরু করে দিয়েছে কিরীটী।

চার প্যাকেট কি এক নতুন ব্রাণ্ডের উর্বশী মার্কা সিগ্রেটও কিনলো যে সিগ্রেট কস্মিন কালেও খায় না।

এবং সর্বক্ষণ ওর মধ্যেই যে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এদিক ওদিকে, বিশেষ করে অদূরবর্তী ওভারসিজ লিংকের অফিসের দিকে নিবদ্ধ হচ্ছিল সেটা অবশ্য আমার নজর এড়ায় না।

প্রায় আধঘণ্টা পরে একটু বোধ হয় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ কিরীটী হাত ধরে আকর্ষণ করে নিম্নকণ্ঠে বললে, আয় সুব্রত—

কোথায়?

আয় না। বলে আমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে চলল।

বাধ্য হয়েই যেন কিরীটীকে আমি অনুসরণ করি।

কোথায় যাচ্ছে, কি ব্যাপার, কিছুই বুঝতে পারি না।

রাস্তার ধারে ট্যাকসি পার্কে একটা খালি ট্যাকসি দাঁড়িয়ে ছিল, এতক্ষণে নজরে পড়ল কিরীটী সেই দিকেই হনহন করে হেঁটে চলেছে।

সোজা গিয়ে কিরীটী খালি ট্যাকসিটায় উঠে বসল আমাকে নিয়ে।

তারপরেই ট্যাকসি-চালককে চাপা কণ্ঠে বললে, সামনের ঐ ট্যাকসিটাকে ফলো করে চলো সর্দারজী।

নজর করে দেখলাম সামনেই অল্পদূরে তখন একটা বেবী ট্যাকসি চৌরঙ্গীর দিকে ছুটে চলেছে।

হাতঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম রাত নটা বাজে প্রায়।

রাস্তায় তখন নানাবিধ যানবাহনের রীতিমত ভিড়। এবং থিয়েটার

রোড পর্যন্ত বেশ সমগতিতে এসে ট্রাফিকের জন্য আগের গাড়ির গতি ও সেই সঙ্গে আমাদের গাড়ির গতিও হ্রাস হয়।

কিরীটী ইতিমধ্যে ট্যাকসির ব্যাকে বেশ আরাম করেই বসেছিল, যদিও তার তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টি বরাবরই নিবদ্ধ ছিল সামনের চলন্ত ট্যাকসিটার উপরেই।

গাড়ির গতি আরো হ্রাস হতে এতক্ষণে কিরীটী মুখ খুলল, সত্যি কথা বলতে কি সুব্রত, একান্ত ঝোঁকের মাথায়ই বাড়ি থেকে আজ সন্ধ্যায় বেরোবার মুহূর্তে কল্পনাও করতে পারি নি, এমন একটা সরস রোমাঞ্চকর রাত্রি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

বলাই বাহুল্য কারণ ইতিমধ্যে কিরীটীর মনোগত ইচ্ছাটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।

তা যা বলেছিস। যোগাযোগটা অপূর্ব বলতেই হবে।

মৃদু কণ্ঠে জবাব দিলাম আমি।

কিরীটী আমার জবাবে সোৎসাহে বললে, অপূর্ব কি না জানি না এখনো, তবে অভূতপূর্ব নিশ্চয়ই।

তুই যে সত্যি সত্যিই নির্মলশিববাবুর স্বর্ণমৃগয়ার অকুস্থলের সন্ধানেই আজ বেরিয়েছিস, সত্যিই কিন্তু আমি প্রথমটায় কল্পনাও করতে পারি নি কিরীটী।

তবে তুই কি ভেবেছিলি, সত্যি সত্যিই আমি হাওয়া খেতে বের হয়েছি?

না, তা নয়—

তবে?

আচ্ছা তোর কি মনে হয় কিরীটী, ঐ ওভারসিজ লিংকই সত্যি সত্যি নির্মলশিববাবুর স্বর্ণমৃগয়ার অকুস্থল?

ততখানি এত তাড়াতাড়ি ভেবে নেওয়াটা কি একটু কল্পনাধিক্যই মনে হচ্ছে না? না ব্রাদার—not so fast। বঙ্কিমী ভাষায় বলব, 'ধীরে রজনী, ধীরে'।

তা অবিশ্যি ঠিক। তবে ঘটনাচক্রে অনেক সময় অনেক অভূতপূর্ব ব্যাপারও ঘটে তো।

তা যে ঘটে না তা আমি অবিশ্যি বলছি না, তবে—

তবে?

তবে সীতা মেয়েটি সত্যিই অনিন্দনীয়া। কি বলিস ?

হুঁ।

হুঁ কি রে ? ভাল লাগলো না দেখে তোর মেয়েটিকে ? আমার তো মন-প্রাণ এখনো একেবারে ভরে রয়েছে।

সত্যি নাকি !

হুঁ।

আর, আর্থার হ্যামিলটন ? তার সম্পর্কে তো কই কিছু বললি না ?

লোকটা রসিক নিঃসন্দেহে এইটুকুই বলতে পারি।

কি বললি, রসিক ?

নয় ? অমন একটি মেয়ের চিত্তহরণ যে একদা করে থাকতে পারে সে রসিক জন বৈকি। সত্যিই কবি যে বসে গিয়েছেন একদা 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে' কথাটা খুব খাঁটি কিন্তু তুই যা বলিস।

তা তোর কিসে মনে হল যে একদা ওই আর্থার হ্যামিলটন সীতার মনপ্রাণ সত্যি সত্যিই হরণ করেছিল ?

কেন সোজাসুজি এসে একেবারে বললে শুনলি না, ফিরে যাবে কি না বল ?

তার মানে বুঝি—

অতশত জানি না তবে আমার যেন মনে হল ক্ষণপূর্বে সেক্রেটারী সীতার ঘরে বৃত্ররূপী যে দৈত্যের আবির্ভাব ঘটেছিল সেই বৃত্রই ঐ শচীদেবীকে কোন এক সময় বেচারী ইন্দ্ররূপী দুর্বল আর্থার হ্যামিলটনের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে।

তুই বুঝি ঐ কাব্যই মনে মনে এতক্ষণ ধরে রচনা করছিলি কিরীটী ?

হ্যাঁ, ভাবছিলাম—

কী ?

দধীচির মত নিজ অস্থি দিয়ে ঐ দুর্বল ইন্দ্রকে যদি গিয়ে বলি, লহ অস্থি, কর নির্মাণ বজ্র—সংহার ঐ দৈত্যাসুর বৃত্রকে—

হো হো করে হেসে উঠি আমি।

হাসছিস কিন্তু বেচারীর সে সময়কার করুণ মুখখানার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখলে তোরও ঐ কথাই মনে হতো কিন্তু।

ইতিমধ্যে মেট্রোর কাছ বরাবর আমরা এসে গিয়েছিলাম।

আগের ট্যাকসিটা সোজা এগিয়ে গিয়ে ডাইনে বাঁক নিল। তারপর কিছু দূরে এগিয়ে বাঁ দিকে ঢুকে পড়ল।

আমাদের ট্যাকসি-চালক সর্দারজী ঠিক তাকে অনুসরণ করে যায়।

শেষ পর্যন্ত আগের ট্যাকসিটা কুখ্যাত চীনা পাড়ার এক অখ্যাত চীনা হোটেলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

বাবুজী, উও আগারি ট্যাকসি তো রুখ গিয়া।

হিঁয়াই রোখো সর্দারজী।

লক্ষ্য করলাম, আগের ট্যাকসি থেকে নেমে আর্থার হ্যামিলটন সাহেব ট্যাকসির ভাড়া মিটিয়ে দিচ্ছে।

ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে হ্যামিলটন হোটেলের ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করল।

বলা বাহুল্য, আমরাও একটু পরে সেই হোটেলেই গিয়ে প্রবেশ করলাম দুজনে।

॥ ৮ ॥

ভিতরে প্রবেশ করে যেন একটু বিস্মিতই হই।

এমন পাড়ায় অখ্যাতনামা একটি চীনা হোটেলে বেশ কসমোপলিটান ভিড়!

হোটেলটায় প্রবেশ করবার মুখে হোটেলের নামটা লক্ষ্য করছিলাম। বিচিত্র নামটিও—'চায়না টাউন'।

বেশী রাত নয়—মাত্র সাড়ে নটা তখন।

ভিতরে প্রবেশ করে দেখি, কসমোপলিটান খরিদ্দারের ভিড়ে তখন যেন গমগম করছে হোটেলের হলঘরটি।

এক পাশে ড্রিংকের কাউন্টার।

তারই গা ঘেঁষে বাঁয়ে প্যানট্রির দরজা এবং ডাইনে ছোট একটি ডায়াস।

ইংরাজী অর্কেস্ট্রা সহযোগে একটি ক্ষীণাঙ্গী, মনে হল অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েই হবে, নানাবিধ যৌনাত্মক অঙ্গভঙ্গী সহকারে নাকী সুরে কি একটা দুর্বোধ্য ইংরাজী গান গেয়ে চলেছে।

চারিপাশে টেবিল চেয়ারে জোড়ায় জোড়ায় নানা বয়সী পুরুষ ও নারী. কেউ খেতে খেতে, কেউ কেউ আবার ড্রিংক করতে করতে সেই যৌনরসাশ্রিত সঙ্গীত উপভোগ করছে।

একটা বিশেষ ব্যাপার ঘরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নজর করছিলাম:

উজ্জ্বল আলো নয়—ঈষৎ নীলাভ ম্রিয়মাণ আলোয় সমস্ত হলঘরটি স্বল্পালোকিত বলা চলে।

রীতিমত যেন একটা রহস্যনিবিড় পরিবেশ হোটেলটির মধ্যে।

ইতিমধ্যে দক্ষিণ কোণে একটা টেবিলে হলঘরের নিরিবিলিতে হ্যামিলটন সাহেব জায়গা করে বসে গিয়েছেন লক্ষ্য করলাম।

তারই পাশে আর একটা খালি টেবিল তখনও ছিল, কিরীটী আমাকে নিয়ে সেই দিকেই এগিয়ে চলল।

নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে আমার টেবিলটার দুটো চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম মুখোমুখি।

হ্যামিলটনের অত কাছাকাছি গিয়ে বসতে আমার যেন ঠিক মন সরছিল না কিন্তু দেখলাম হ্যামিলটন আমাদের দিকে ফিরেও তাকাল না।

সে অন্য দিকে অন্যমনস্ক ভাবে তখন চেয়ে আছে।

কিন্তু হ্যামিলটনের সঙ্গের সেই দৈত্যাকৃতি লোকটাকে আশেপাশে কোথায়ও নজরে পড়ল না।

ইতিমধ্যে একজন ওয়েটার দেখলাম একটা পুরো রামের বোতল, একটা গ্লাস ও একটা কাচের জাগভর্তি জল এনে হ্যামিলটন সাহেবের সামনের টেবিলের 'পরে নামিয়ে রাখল।

বোয়—

কিরীটীর আহ্বানে সেই লোকটাই আমাদের সামনে এগিয়ে এল।

দুটো কোল্ড বিয়ার।

তাড়াতাড়ি বললাম, আমি তো বিয়ার খাই না।

কিরীটী নির্বিকার ভাবে জবাব দিল, না খাস গ্লাস নিয়ে বসে থাকবি।

কি আর করা যায়, চুপ করেই থাকতে হল অগত্যা।

ওয়েটার কিরীটীর নির্দেশমত দু'বোতল ঠাণ্ডা বিয়ার ও দুটো গ্লাস এবং একটা প্লেটে কিছু কাজু বাদাম আমাদের টেবিলে রেখে গেল।

ইতিমধ্যে লক্ষ্য করছিলাম হ্যামিলটন সাহেব গ্লাসের আধাআধি রাম ঢেলে তাতে জল মিশিয়ে বার দুই চুমুক দিয়েই গ্লাসটা প্রায় অর্ধেক করে এনেছে।

কিরীটী দু গ্লাস বিয়ার ঢালল: নে, না খাস অন্তত মুখের কাছে তোল।

কিরীটীর নির্দেশমত তাই করি।

সময় গড়িয়ে যেতে থাকে। অর্কেস্ট্রা সহযোগে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সুন্দরী তখন দ্বিতীয় সংগীত শুরু করেছে।

হ্যামিলটন ড্রিংক করে চলেছে।

লোকটা যে সুরারসিক বুঝতে দেরি হয় না।

ঘড়ির দিকে তাকালাম এক সময়, রাত সাড়ে এগারোটা।

হলঘরের ভিড়টা তখন অনেকটা পাতলা হয়ে গিয়েছে বটে তবু মধুলোভীদের ভিড় একেবারে কমে নি।

সকলের চোখেই নেশার আমেজ, ঘরের মধ্যে তখনও যারা উপস্থিত তাদের তখন যেন নেশা জমাট বেঁধে উঠেছে।

ইতিমধ্যে হ্যামিলটন সাহেব রামের বড় বোতলটি প্রায় নিঃশেষিত করে এনেছে।

এবং সাহেবের যে রীতিমত নেশা ধরেছে সেটা তার দিকে তাকালেই বোঝা যায়।

কিরীটী ফিসফিস করে আমাকে বললে, চল, সাহেবের সঙ্গে একটু আলাপ করে আসি।

এতক্ষণ যে এত কষ্ট করে কিরীটী হোটেলে বসে আছে সেও ঐ কারণেই সেটা পূর্বাহ্ণেই বুঝতে পেরেছিলাম।

কিন্তু তবু ইতস্তত করি।

কি হল ওঠ।

কিন্তু যদি চিনে ফেলে আমাদের!

নেশার ঘোরে আছে, চল।

চল।

কিরীটীর সঙ্গে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালাম।

হ্যামিলটন সাহেবের টেবিলে আরও দুটি চেয়ার ছিল। তারই একটা টেনে নিয়ে আমি বসলাম এবং কিরীটী অন্যটায় বসতে বসতে বললে, গুড ইভনিং মিঃ হ্যামিলটন।

নেশায় ঢুলুঢুলু চোখ দুটি খুলে তাকাল আমাদের দিকে হ্যামিলটন সাহেব।

কে? জড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করে হ্যামিলটন।

তুমি তো আমাকে চিনবে না হ্যামিলটন, আমার নাম রথীন বোস।

আঃ—বোস! বলে নিঃশেষিত গ্লাসটার পাশ থেকে বোতলটা তুলে উপুড় করে ধরল। কিন্তু বোতলটায় তখন একবিন্দুও তরল পদার্থ অবশিষ্ট ছিল না।

কিরীটী মৃদু হেসে বলে, ওর মধ্যে তো একবিন্দুও নেই, ঢালছ কি।

নেই! বলে বোতলটা কম্পিত হাতে সামনে তুলে ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল, নেই—ইয়েস—সত্যিই নেই—অল ফিনিশড।

ডু ইউ লাইক টু হ্যাভ মোর মিঃ হ্যামিলটন?

গড ব্লেস ইউ মাই বয়। আই হ্যাভ নট এ ফারদিং লেফট ইন মাই পকেট।

কিরীটী ততক্ষণে ওয়েটারকে ডেকে হ্যামিলটনের শূন্য গ্লাসটার জায়গায় অন্য একটা ভর্তি গ্লাস এনে দিতে বললে।

ওয়েটার এনে দিল নির্দেশমত একটা গ্লাস।

সানন্দে নতুন গ্লাসটা তুলে নিয়ে দীর্ঘ একটা চুমুক দিয়ে জড়িত স্বরে হ্যামিলটন বললে, গড উইল ব্লেস ইউ মাই বয়, গড উইল ব্লেস ইউ। দ্যাট ডার্টি স্নেক, দ্যাট ফিলদি স্নেক গেভ মি ওনলি ফিফটিন রুপিজ। তাতে কি কিছু হয় মিঃ বোস, তুমিই বল। একজন ভদ্রলোকের একরাত্রের ড্রিঙ্কের খরচাও হয় না।

তা তো নিশ্চয়ই, কিন্তু তুমি তো ইচ্ছা করলে সীতার কাছ থেকে নিতে পার।

সীতা! ডোণ্ট টক অ্যাবাউট হার। ক্রুয়েল, হার্টলেস উয়োম্যান। জান, সে চলে যাবার পর থেকেই তো আমার এই অবস্থা। শি হ্যাজ ফিনিশড মি, শি হ্যাজ ফিনিশড মি! আই অ্যাম গন—গন ফর এভার। কিন্তু তবু—তবু আমি তাকে ভালবাসি।

তুমি তাকে সত্যিই ভালবাস হ্যামিলটন?

সহসা হাত বাড়িয়ে কিরীটীর একটা হাত চেপে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল হ্যামিলটন, হ্যাঁ—হ্যাঁ—বাসি—বিশ্বাস কর বোস—দো শি হ্যাজ ডেজার্টেড মি—তবু, তবু তাকে আমি ভালবাসি। আই লাভ হার, আই লাভ হার, আই লাভ হার লাইক এনিথিং। শি ইজ মাই ম্যারেড ওয়াইফ—শি ইজ—

কথাটা শেষ হল না হ্যামিলটনের। অকস্মাৎ আমাদের পিছন থেকে সরু মিহি গলায় কে যেন ডাকল, হ্যামিল্টন!

কে ? ও চিরঞ্জীব—

আগন্তুক ততক্ষণে বগলের ক্রাচের সাহায্যে আমাদের সামনাসামনি এসে দাঁড়িয়েছে।

বেঁটে খাটো মানুষটা, দৈর্ঘ্যে পাঁচ ফুটের বেশী হবে না।

রোগা লিকলিকে চেহারা।

পরিধানে একটা ঝলঝলে কালো রঙের পুরাতন জীর্ণ শ্ল্যাক ও গায়ে অনুরূপ একটু ওপন-ব্রেস্ট কোট।

ভিতরে ময়লা একটা ছিটের শার্ট, তাও গলার বোতামটা খোলা।

মাথায় নিগ্রোদের মত ছোট ছোট চুল—ঘন কুঞ্চিত।

ছড়ান কপাল. চাপা নাক, দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠ।

ছোট ছোট কুতকুতে দুটি চক্ষু যেন সতর্ক শিকারী বিড়ালের মত।

ডান পাটা বোধ হয় পঙ্গু—অসহায় ভাবে ঝুলছে।

এস চিরঞ্জীব, তোমাকে এদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই—মাই বেস্ট ফ্রেণ্ড অ্যাণ্ড ওনলি অ্যাডমায়ারার চিরঞ্জীব কাঞ্জিলাল অ্যাণ্ড মাই ফ্রেণ্ডস বোস—

কিন্তু হ্যামিলটনের আগ্রহে এতটুকু সাড়াও যেন দিল না চিরঞ্জীব।

সে বললে, তুমি এখানে বসে আছ আর তোমার জন্য পকেটে টাকা নিয়ে আমি তোমাকে সারা দুনিয়ায় খুঁজে বেড়াচ্ছি।

টাকা! আর ইউ রিয়েলি সেয়িং মানি।

ইয়েস—

ও, গড ব্লেস ইউ মাই বয়। ইউ ডোণ্ট নো হাউ আই অ্যাম ব্যাডলি ইন নিড অফ মানি। দাও, দাও—হাত বাড়াল হ্যামিলটন।

সে কি, পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ নাকি! চল, আমার বাড়ি চল।

চল, চল। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায় হ্যামিলটন।

আর একটু হলেই পা বাড়াতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিল হ্যামিলটন কিন্তু পলকে হাত বাড়িয়ে পতনোদ্যত হ্যামিলটনকে ধরে চিরঞ্জীব হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল।

কেমন বিহ্বল হয়েই যেন ওদের গমনপথের দিকে তাকিয়ে ছিলাম আমি।

হঠাৎ কিরীটীর মৃদু কণ্ঠস্বরে ওর দিকে মুখ ফেরালাম।

বন থেকে বেরুল টিয়ে সোনার টোপর মাথায় দিয়ে। টিয়া পাখি উড়ে গেল—সুব্রতচন্দ্র এবারে গৃহে চল।

তারপরই হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, উঃ, রাত বারোটা বাজতে মাত্র চোদ্দ মিনিট। গৃহিণী নিরতিশয় ব্যাকুলা হয়ে পড়েছেন নিশ্চয়ই।

তা হবারই তো কথা, সান্ধ্য ভ্রমণ যদি মধ্যরাত্রি পর্যন্ত গড়ায়—মৃদু হেসে বললাম আমি, ব্যাকুলা তো হবেনই।

তাড়াতাড়ি বিল চুকিয়ে দিয়ে আমরা হোটেলের বাইরে চলে এলাম।

হোটেলের বাইরে এসে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলাম।

একটু আগে হ্যামিলটনকে নিয়ে এই পথেই চিরঞ্জীব কাঞ্জিলাল হোটেল থেকে বের হয়ে এসেছে।

কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না।

কিরীটী আমাকে তাড়া দিয়ে বললে, নেই হে বন্ধু, সে টিয়া পাখি অনেক আগেই উড়ে গিয়েছে। এবারে একটু পা চালিয়েই চল, কারণ পাড়াটা বিশেষ করে এই মধ্যরাত্রে তেমন সুবিধার নয়।

ট্রামরাস্তায় এসেও অনেক অপেক্ষার পর ট্যাকসি মিলেছিল সে রাত্রে এবং কিরীটীকে তার গৃহে নামিয়ে দিয়ে বাসায় পৌঁছতে রাত সোয়া একটা বেজে গিয়েছিল।

সেই রাত্রের পর পুরো দুটো দিন কিরীটী আর বাড়ি থেকে কোথায়ও এক পাও বেরুল না।

কেবল নিজের বসবার ঘরে বসে বসে দুটো দিন সর্বক্ষণ পেসেন্স খেলা নিয়েই মেতে রইল।

তৃতীয় দিনও দ্বিপ্রহরে গিয়ে দেখি বসবার ঘরে চারিদিকে লাল পর্দা টেনে এয়ারকনডিশন মেশিন চালিয়ে ঠাণ্ডায় বসে পেসেন্স খেলছে সে।

আজ কিন্তু সত্যিই আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটবার উপক্রম হয়।

কারণ গত দুটো দিন আমার মনের মধ্যে সর্বক্ষণ সে রাত্রের ঘটনাগুলি ও কতকগুলো নরনারীর মুখ ভেসে ভেসে উঠছিল।

মনে মনে একটা আঁচও করে নিয়েছিলাম যে অতঃপর নিশ্চয়ই তোড়জোর করে কিরীটী গিয়ে ওভারসিজ লিংকে হানা দেবে।

কিন্তু কিরীটী যেন সে রাত্রের ব্যাপার সম্পর্কে একেবারে বোবা।

ধৈর্যচ্যুতি ঘটতও হয়তো আর একটু পরেই, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে সিঁড়িতে জুতোর শব্দ পেয়ে উৎকর্ণ হই।

জুতোর শব্দটা ঠাণ্ডা ঘরের দরজা বরাবর যখন প্রায় এসেছে, কিরীটী তাস সাজাতে সাজাতেই আমাকে বললে, দরজাটা খুলে দে সুব্রত, নির্মলশিব এলেন।

সত্যি দরজা খুলে দিতে নির্মলশিবই এসে ঘরে প্রবেশ করল।

ঘরে পা দিয়েই নির্মলশিব বলে, আঃ, প্রাণটা বাঁচল। কি আশ্চর্য! কি ঠাণ্ডা!

কিরীটী তাস সাজাতে সাজাতেই বললে, মল্লিক সাহেবের সঙ্গে আলাপ হল নির্মলশিব বাবু?

কি আশ্চর্য! তা আর করি নি। খাসা লোক—তবে—

তবে আবার কি?

প্রচণ্ড সাহেব।

তা বাঙালীরা ধুতি ছেড়ে কোট পাতলুন পরিধান করলে একটু সাহেব হয়ে পড়েন বৈকি। কিন্তু যে জন্য আপনাকে সেখানে যেতে বলেছিলাম তার কোন সংবাদ পেলেন কিনা?

কি আশ্চর্য! তা পেয়েছি বৈকি।

পেয়েছেন তাহলে।

হ্যাঁ।

বিদেশে কোন মালটা বেশী রপ্তানি হয় ওদের জানতে পারলেন কিছু?

হ্যাঁ। চা, চাটনি আর ছাতি।

ছাতি?

হ্যাঁ—আমব্রেলা। আমেরিকায় নাকি প্রচুর চা আর ছাতি চালান যাচ্ছে আর বোয়ামে বোয়ামে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে আমের আচার।

আমের আচার আর ছাতার স্যাম্পল দিলে বুঝি আপনাকে?

স্যাম্পল মানে?

না বলছিলাম, শুধু ছাতি আর আমের আচার, সিংগাপুরী কলা নয়?

বেচারী নির্মলশিব, কিরীটীর সূক্ষ্ম পরিহাস উপলব্ধি করবে কি করে? আমি কিন্তু ততক্ষণে রুদ্ধ হাসির বেগটা আর না সামলাতে পেরে হো হো করে হেসে উঠলাম।

কি আশ্চর্য! সুব্রত বাবু, আপনিও হাসছেন?

নির্মলশিববাবুর কথায় কিরীটীও এবারে হেসে ওঠে।

যাক, সীতা আর আর্থার হ্যামিলটনের খোঁজ নিয়েছিলেন নির্মলশিববাবু? কিরীটী আবার প্রশ্ন করল।

কি আশ্চর্য! নিয়েছিলাম বৈকি। হাজবেণ্ড অ্যাণ্ড ওয়াইফ। তবে বর্তমানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ওদের সেপারেশন হয়ে গিয়েছে।

ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে?

না, তা হয় নি বটে, তবে—

তবে কি?

ওরা বছরখানেক হল আলাদা ভাবে বসবাস করছে।

হু। আর চিরঞ্জীব কাঞ্জিলাল? তার কোন সংবাদ পেলেন?

আপনার অনুমানই ঠিক। চায়না টাউন হোটেলের মালিক লোকটা।

তাহলে লোকটার দু পয়সা আছে বলুন?

কি আশ্চর্য! তা আর নেই! হোটেলটা খুব ভালই চলে। লোকটিও সজ্জন সন্দেহ নেই। আর মুরগীর রোস্ট যা করে না, আশ্চর্য, একেবারে যাকে বলে ফার্স্ট ক্লাস, অতি উপাদেয়।

মুরগীর রোস্ট বুঝি খাইয়েছিল আপনাকে?

নিশ্চয়ই। দু-প্লেট ভর্তি।

আমিই এবারে প্রশ্ন করলাম. দু প্লেটই খেলেন?

কি আশ্চর্য! দিলে আর খাব না? না মশাই, আমার অত প্রেজুডিস নেই।

তা তো সত্যিই, আগ্রহভরে যখন বিশেষ করে সে দিয়েছে। কিন্তু নির্মলশিববাবু, শত্রুশিবিরে গিয়ে ঐ ধরনের প্রেজুডিসটা বর্জন করাই ভাল জানবেন।

কিরীটী শান্ত মৃদু কণ্ঠে কথাগুলো বললে।

কথাটা বলেই কিরীটী আবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে এলো, আচ্ছা নির্মলশিব-বাবু, ওভারসিজ লিংকের ম্যানেজার ভদ্রলোকটির চেহারাটা কেমন? মানে বলছিলাম কি, দেখতে শুনতে কেমন। খুব লম্বাচওড়া দৈত্যের মত কি?

কি আশ্চর্য! কই না তো!

তবে কি রকম দেখতে?

রোগা লিকলিকে, একটু আবার খোনা। নাকী সুরে কথা বলেন।

তাই নাকি!

হ্যাঁ, একটা চোখও আবার বিশ্রী রকম ট্যারা।

একটা পা খোঁড়া নয়?

খোঁড়া! কই না তো।

হুঁ। বলুন তো কি রকম চেহারাটা তার ঠিক ঠিক।

নির্মলশিব বর্ণনা করে গেল মল্লিক সাহেবের চেহারাটা।

ওভারসিজ লিংকের ম্যানেজারের চেহারার বর্ণনাটা মনে হল নির্মলশিবের মুখে শুনে ঠিক যেন মনঃপূত হল না কিরীটীর।

ব্যাপারটা যেন কিছুটা তার প্রত্যাশার বাইরেই মনে হল।

বুঝতে পারি লোকটার চেহারার একটা বর্ণনা কিরীটীর মনের মধ্যে ছিল। সেই বর্ণনার সঙ্গে না মেলায় সে যেন একটু চিন্তিতই হয়ে পড়েছে।

কিছুক্ষণ অতঃপর কিরীটীর মুখ দিয়ে কোন কথাই বের হয় না।

ভ্রু দুটো কুঞ্চিতই হয়ে থাকে।

তারপর এক সময় ভ্রু দুটো সরল হয়ে আসে।

চাপা খুশির একটা ঢেউ যেন কিরীটীর মুখের উপর দিয়ে খেলে যায়।

মৃদু কণ্ঠে সে বলে, না সত্যি, আমারই ভুল হয়েছিল, ঘটোৎকচের মাথায় বা সেই ভদ্রলোকের মস্তিষ্কে তো অতখানি বুদ্ধি থাকতে পারে না।

কিরীটীর উচ্চারিত ঘটোৎকচ কথাটা নির্মলশিবের কানে গিয়েছিল, সে বলে, কি আশ্চর্য! ঘটোৎকচ আবার কে মিঃ রায়!

একটা দৈত্য। ওভারসিজ লিংকে আমরা সে রাত্রে একটা দৈত্যাকৃতি লোক দেখেছিলাম, কিরীটী তার কথাই বলছে নির্মলশিববাবু।

জবাব দিলাম আমি।

কি আশ্চর্য! তাই বলুন। আপনারা মিঃ গড়াই, গজানন্দ গড়াইয়ের কথা বলছেন। তা সত্যি আমি মশাই একটু লেটে বুঝি। বলেই প্রাণ খুলে হো হো করে হেসে উঠল নির্মলশিব।

নির্মলশিবের কাছ থেকে আরও সংবাদ পাওয়া গেল ওভারসিজ লিংক সম্পর্কে।

ম্যানেজার লোকটা অফিসে বড় একটা থাকেই না।

ঐ গজানন্দ গড়াই-ই সব একপ্রকার দেখাশোনা করে বলতে গেলে।

আর অফিসে সর্বদা থাকে সেক্রেটারী দিদিমণি সীতা মৈত্র।

আর একটা প্রশ্ন করেছিল কিরীটী নির্মলশিবকে।

যে সমস্ত মাল ওরা এদেশ থেকে অন্যান্য দেশে পাঠায় সে সমস্ত মাল সাধারণত কিসে যায়?

বলাই বাহুল্য সে সংবাদটা দিতে পারে নি নির্মলশিব সাহেব কিরীটীকে।

অবশেষে নির্মলশিব গাত্রোত্থান করেছিল। এবং বিদায় নেবার পূর্বে সে কিরীটীকে শুধাল, এবার আমাকে কি করতে হবে বলুন মিঃ রায়।

কিরীটী মৃদু হেসে বলে, একটা বা দুটো বিশেষ নম্বরের ট্যাকসি কিংবা কোন ভ্যান নিশ্চয়ই ওভারসিজ লিংক অফিসে ঘন ঘন যাতায়াত করে আমার ধারণা। ধারণাটা আমার সত্য কিনা একটু লক্ষ্য রাখবেন তো নির্মলশিববাবু।

কি আশ্চর্য! এ আর এমন শক্ত কথা কি, আজই এখুনি গিয়ে একজন প্লেন ড্রেসকে ওখানে দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টার জন্য পোস্ট করে রাখছি।

হ্যাঁ, তাই করুন। আপাতত ওইটুকুই করুন।

নির্মলশিব বিদায় নেওয়ার পর আমি জিজ্ঞাসা করি, তোর কি তাহলে সত্যি সত্যিই ধারণা ঐ ওভারসিজ লিংকটাই হচ্ছে স্বর্ণ-মৃগয়ার ঘাঁটি?

তাই আমার এখন মনে হচ্ছে সুব্রত।

কিন্তু কেন, সেটাই তো জিজ্ঞাসা করছি। কারণ সে রাত্রে ওভারসিজ লিংককে কেন্দ্র করে পর পর যে ব্যাপারগুলো ঘটেছিল সেগুলোর স্রেফ ঘটনাচক্র ছাড়া আর কি বলা যায়?

জানবি, ঘটনাচক্রই বহু ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর সত্যেরও ইঙ্গিত দেয়। আমি অবিশ্যি ব্যাপারটা নিছক একটা ঘটনাচক্রই বলি না, বলি সাম্ আনসিন্ ফোর্স, কোন অদৃশ্য শক্তি আমাদের অজ্ঞাতেই আমাদের সত্য পথে চালিত করে, যেটা বহু ক্ষেত্রেই আমরা জীবনে অনুভব করি। কিন্তু এক্ষেত্রে কেবল ঐ ঘটনাচক্র ও আনসিন্ ফোর্সেরই ইঙ্গিত ছিল না। দেয়ার ওয়্যার সামথিং মোর।

কি?

প্রথমত স্বর্ণমৃগয়ার ব্যাপারটা যে সত্য সেটা পূর্বেই আমার মন বলেছিল একটি কারণে।

কি শুনি?

সংবাদপত্র লক্ষ্য করলেই দেখতে পেতিস, গত বছর তিন সময়ের মধ্যে জাহাজঘাটায় এবং প্লেনের ঘাঁটিতে পাঁচ-পাঁচটা বিরাট গোল্ড বা সোনার স্মাগলিংয়ের ব্যাপার ধরা পড়েছে। এবং সেই সূত্রে এক বা ততোধিক লোক স্মাগলার হিসেবে ধরা পড়লেও আসলে তারা চুনোপুঁটি মাত্র। ওই ব্যাপারের আসল রুইকাতলার টিকিটিও স্পর্শ করতে পারে নি পুলিস

কোনদিন। তবে ঐ সঙ্গে আর একটা সংবাদে প্রকাশ, পাঁচ বারের মধ্যে বার তিনেক বিরাটকায় দৈত্যাকৃতি একটা লোককে বিভিন্ন অকুস্থানের আশেপাশে নাকি দেখা গিয়েছে; অবশ্য ঐ ব্যাপারের সঙ্গে তাকে কোন রকম সন্দেহই পুলিস করতে পারে নি। মাস আষ্টেক পূর্বে আমাদের সাউথের ডি. সি.-র সঙ্গে তাঁর জীপে চেপে এক জায়গায় যাচ্ছিলাম। পথের মাঝে ট্রাফিকের জন্য ডি. সি.-র জীপটাও দাঁড়ায়। পাশেই এমন সময় একটা নতুন ঝকঝকে ডজ কিংসওয়ে গাড়ি এসে দাঁড়ায় ব্রেক কষে। সেই গাড়ির মধ্যেই একটা দৈত্যাকৃতি লোক অর্থাৎ আমাদের ঐ ঘটোৎকচ বা গজানন্দ গড়াইকে আমি চাক্ষুষ প্রথম দেখি এবং বলাই বাহুল্য মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হই।

তারপর? শুধালাম আমি।

সেই সময়ই ডি. সি. লোকটার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে হঠাৎ বলেছিলেন, মিঃ রায়, ঐ যে গাড়িটার মধ্যে দৈত্যের মত একটা লোক দেখছেন, বিখ্যাত তিনটে গোল্ড স্মাগলিংয়ের কেস যখন ধরা পড়ে, দুবার এরোড্রোম ও একবার জাহাজঘাটায়, ঐ লোকটাকে নাকি আশেপাশে দেখা গিয়েছিল।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, ওকে সন্দেহ করলেও আজ পর্যন্ত লোকটার একটি কেশও স্পর্শ করা যায় নি।

কিরীটী বলতে লাগল, যাই হোক, সেই যে ঘটোৎকচকে আমি গাড়ির মধ্যে দেখেছিলাম, ভদ্রমহোদয়কে কেন যেন আর ভুলি নি। এবং সেদিন নির্মলশিবের সমস্ত ব্যাপার মনোযোগ দিয়ে শুনে আমার মনে হল, স্বর্ণমৃগয়ার ব্যাপারটার দক্ষিণ কলকাতার মধ্যেই কোথাও ঘাঁটি আছে। অবিশ্যি সেখানেও আমি কিছুটা যোগ-বিয়োগ করে অনুমানকেই আমার প্রাধান্য দিয়েছি বরাবরের মত।

যথা?

আমার অনুমান ভুলও হতে পারে। তবে যা মনে হয়েছিল—

কি?

যোগ-বিয়োগটা করেছিলাম আমি দক্ষিণ কলকাতা অঞ্চলেই সংঘটিত দুটি বীভৎস ও রহস্যপূর্ণ হত্যাকাণ্ড থেকে। সে হত্যাকাণ্ড দুটো তোমাদের সকলেরই জানা।

কোন দুটি হত্যাকাণ্ড ?

যে হত্যাকাণ্ড দুটোর কথা সেদিন নির্মলশিবের কাছে আমি উল্লেখ করেছিলাম।

মানে সেই পুলিশ অফিসার মোহিনীমোহন—

হ্যাঁ, এবং দ্বিতীয়তঃ যে নিহত ব্যক্তির পরিচয়ের কোন হদিশ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

সে যাই হোক আমার বক্তব্য হচ্ছে প্রথমত, আবার কিরীটী বলতে লাগল, সেই দ্বিতীয় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির ভয়াবহ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নিদর্শন অর্থাৎ তার টুকরো টুকরো দেহখণ্ডগুলো এই দক্ষিণ কলকাতাতেই পাওয়া গিয়েছিল এবং দ্বিতীয়ত সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মাত্র সাত দিন পূর্বে এই এলাকারই অন্যতম পুলিশ অফিসার মোহিনীমোহনের রহস্যময় নিরুদ্দেশের ব্যাপার ঘটে। যাই হোক আপাতত ঐ দুটি কারণই সেদিন যেন অলক্ষ্যে আমার মনকে দক্ষিণ কলকাতার প্রতিই আকৃষ্ট করে। একটা ব্যাপার কি জানিস সুব্রত, বহুবার আমার জীবনে আমি দেখেছি, ঐ ধরণের ইঙ্গিত মনকে আমার কখনো প্রতারিত করে নি।

শুধু কি সেই কারণেই সেদিন সন্ধ্যায় তুই অকস্মাৎ বের হয়েছিলি সান্ধ্য-ভ্রমণের নাম করে ?

না, আরও একটা কারণ ছিল অবিশ্যি সেদিনকার সান্ধ্য-ভ্রমণের পশ্চাতে।

কী ?

ঐ ভাবে সোনা স্মাগল করা যে এক-আধ জনের কর্ম নয়, সুনিশ্চিত ভাবে তাদের যে একটা গ্যাংগ বা দল আছে এবং নির্দিষ্ট সুচিন্তিত একটি কর্মপদ্ধতিও আছে কথাটা কেন যেন আমার মনে হয়েছিল এবং ঐ সঙ্গে এই মনে হয়েছিল ঐ সব কিছুর জন্য চাই একটি মিলনকেন্দ্র, যে মিলনকেন্দ্রটির বাইরে থেকে একটা সকলের চোখে ধুলো দেওয়ার মত শো থাকবে।

অর্থাৎ ?

অর্থাৎ একটা অফিস।

অফিস ?

হ্যাঁ, অফিস। কিন্তু অফিস সংক্রান্ত ব্যাপার সাধারণত ক্লাইভ স্ট্রীট বা ডালহউসি অঞ্চলেই হয় অথচ সেখানে আবার পুলিশেরও আনাগোনা বেশী।

সে ক্ষেত্রে স্বর্ণমৃগয়া করছে যারা তাদের পক্ষে দক্ষিণ কলকাতায় অফিস করাটাই হয়তো নিরাপদ হবে। বিশেষ করে সেই জন্যেই একবার যতটা সম্ভব আশপাশটা ঘুরে ফিরে দেখবার জন্য বের হয়েছিলাম সেই সন্ধ্যায় যদি ঐ ধরণের কোন কর্মস্থল মানে অফিস ইত্যাদি চোখে পড়ে। কিন্তু ভাগ্যদেবী বরাবরই দেখেছি আমার প্রতি প্রসন্ন। সেদিনও তাই ঘটলো। ঘুরতে ঘুরতে ওভারসিজ লিংকের অফিসের কাছাকাছি যেতেই হঠাৎ একটা ব্যাপারে আমি সচকিত হয়ে উঠলাম।

কি ব্যাপার ?

ঘটোৎকচ—

ঘটোৎকচ ?

হ্যাঁ, তাকে দেখলাম একটা ট্যাকসি থেকে নেমে ওভারসিজ লিংকের অফিস বাড়িতে ঢুকতে। সঙ্গে সঙ্গেই ওভারসিজ লিংক আমার মনকে আকর্ষণ করে। তারপর যখন শুনলাম তোর মুখে বাড়িটা নতুন, বুঝলাম অফিসটাও নতুন, নামটাও দেখলাম বিচিত্র এবং সাইন বোর্ডে বোল্ড লেটার্সে তাদের বিজ্ঞাপিত কাজ কারবারটাও সবকিছুর সঙ্গে জড়িয়ে মনকে আমার সন্দিগ্ধ করে তুলল যেন সঙ্গে সঙ্গেই। সর্বোপরি সেখানে ক্ষণপূর্বে ঘটোৎকচের যখন প্রবেশ ঘটেছে—যাকে ইতিপূর্বে সোনার স্মাগল কেসে অকুস্থলের আশেপাশে দেখা গিয়েছিল বার তিনেক। অতএব কালবিলম্ব না করে আমি অন্দরে পা বাড়ালাম। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করে ঘটোৎকচকে প্রথমটায় না দেখে হতাশা আর রইলো না তিলোত্তমা সন্দর্শনের পর।

অর্থাৎ ?

অর্থাৎ দেহ ও মন পুলকিত ও চমৎকৃত হলো। কিরীটী মৃদু হেসে বললে।

তাহলে তোর ধারণা কিরীটী, নির্মলশিবের রহস্যের মূলটা ঐ ওভারসিজ লিংকের সঙ্গেই জড়িত ?

সেই রকমই তো মনে হচ্ছে। বিশেষ করে সে রাত্রে সেখানকার আবহাওয়া ও তিনটি প্রাণীকে দেখবার পর থেকে।

তিনটি প্রাণী ?

হ্যাঁ, ঘটোৎকচ, তিলোত্তমা ও আর্থার হ্যামিলটন।

কিন্তু—

I have not yet finished। অমন একটা কাজের জায়গায় তিলোত্তমা কাব্যও যেমন বেখাপ্পা তেমনি ঘটোৎকচ পর্বের জুলুম ও হ্যামিলটনের নিরুপায়তা সব কিছুই যেন কেমন একটা এলোমেলো—জটপাকানো। জটপাকানো মানেই গোলযোগ অতএব যোগ বিয়োগ করে নিতে আমার অসুবিধা হয় নি। তাই—

তাই কি?

তাই সেদিন তার কেসের আলোচনা প্রসঙ্গে নির্মলশিবকে যে আশ্বাস দিয়েছিলাম সেটাও যে মিথ্যে নয় সেটাও সে রাত্রে ওখানে হানা দেবার পরই সুস্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম।

মানে দলে ভাঙন ধরেছে?

হ্যাঁ, এসব কারবারে সাধারণত যা হয়ে থাকে। মারাত্মক লোভের আগুনে সব ধ্বংস হয়ে যায়—মানে নিজেরাই শেষ পর্যন্ত নিজেদের ধ্বংসের বীজ বপন করে। কথাটা নির্মলশিবকেও বলেছিলাম। কিন্তু সে গা দিল না কথাটায়। অবিশ্যি নিজে থেকে তারা ধ্বংস না হলেও এটা বুঝতে পারছি যে তাদের দিন সত্যিই সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে।

যেহেতু কিরীটী—শনির দৃষ্টি তাদের ভাগ্যের উপর পড়েছে।

হাসতে হাসতেই এবার আমি কথাটা বললাম।

॥ ১১ ॥

তারপরও কিরীটী একটা সপ্তাহ বাড়ি থেকে বের হলো না।

একান্ত উদাসীন ও নিষ্ক্রিয়ভাবে সে তার সময় কাটাতে লাগল তাস নিয়ে পেসেন্স খেলে খেলেই।

কিন্তু লক্ষ্য করেছিলাম তাস নিয়ে সর্বক্ষণ উদাসীন থাকলেও কিছু একটার প্রত্যাশায় যেন তার দেহের প্রতিটি ইন্দ্রিয় উন্মুখ হয়ে রয়েছে।

সমস্ত অনুভূতি তার যেন যাকে বলে সেতারের তারের মত চড়া সুরেই বাঁধা হয়ে আছে।

ঠিক এমনি সময় একদিন বেলা এগারোটা নাগাদ রীতিমত যেন হন্তদন্ত হয়েই নির্মলশিব এসে ঘরে প্রবেশ করল কিরীটীর।

কি আশ্চর্য! মিঃ রায়—

কিরীটী পূর্বের মতই তাস নিয়ে খেলছিল, সঙ্গে সঙ্গে মুখ তুলে হাতের

তাসগুলো একান্ত অবহেলায় টেবিলের 'পরে একপাশে ঠেলে দিয়ে, যেন আপাতত তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, নিশ্চিত দৃষ্টিতে নির্মলশিবের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, কি, ইতিহাসের আবার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে এই তো নির্মলশিববাবু?

কি আশ্চর্য! ইতিহাস—

হ্যাঁ। নির্বিকারভাবেই পুনরাবৃত্তি করে কথাটার কিরীটী।

কি আশ্চর্য! সুব্রতবাবু, এক গ্লাস জল।

আমি দরজার কাছে উঠে গিয়ে জঙ্গলীকে একগ্লাস জল দিতে বললাম।

জঙ্গলী জল আনার পর চোঁ চোঁ করে একগ্লাস জল প্রায় এক টানেই নিঃশেষ করে নির্মলশিব বলে, আর এক গ্লাস।

জঙ্গলী শূন্য গ্লাসটা নিয়ে চলে গেল।

কিন্তু ততক্ষণে এক গ্লাস জল পান করে কিছুটা ধাতস্থ হয়েছে নির্মলশিব।

সে বললে. আবার খুন হয়েছে আমার এলাকায় মিঃ রায়—

জানতাম হবে! নির্বিকার ভাবেই কিরীটী কথাটা বলে।

জানতেন?

হ্যাঁ. এবং আপনার কাছে সংবাদটা পেয়ে দুটো ব্যাপার অন্তত প্রমাণিত হলো।

দুটো ব্যাপার?

হ্যাঁ—

মানে?

প্রথমত আপনারই যে এলাকার সঙ্গেই যে স্বর্ণমৃগয়ার একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে আমার সেই অনুমানটা, এবং দ্বিতীয়ত খুব শীঘ্রই পূর্বের সেই হত্যাকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি ঘটবে সেটা। বিশেষ করে যে সংবাদটার জন্য এই কয়দিন সত্যিই আমি অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু যাক সে কথা। নিহত ব্যক্তিটি কে? তার কোন পরিচয় পেলেন বা তাকে আইডেনটিফাই করতে পারা গিয়েছে?

না, তবে—

তবে কি?

লোকটার বাঁ হাতে হিন্দীতে উল্কি-করে নাম লেখা আছে—

কি নাম লেখা আছে?

ভিখন—

কি, কি বললেন? কি নামটা বললেন? উত্তেজিত কণ্ঠে কিরীটী প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করল।

ভিখন।

ভিখন!

হ্যাঁ—

লোকটার গায়ের রঙ কালো? আবার প্রশ্ন করল কিরীটী।

হ্যাঁ—

কপালে ডান দিকে একটা কাটা দাগ আছে?

আছে—কী আশ্চর্য!

নাকের উপরে একটা আঁচুলি আছে?

আছে। কিন্তু কি আশ্চর্য! এসব কথা, মৃতদেহ সম্পর্কে এত ডিটেলস্, আপনি জানলেন কি করে? আপনি কি মর্গে গিয়ে ইতিমধ্যে মৃতদেহটা দেখে এসেছেন নাকি মিঃ রায়?

না. আপনিই তো দেখেছেন।

কি আশ্চর্য! তা তো দেখেছিই, কিন্তু আপনি এত সব জানলেন কি করে!

বাঃ, আপনিই তো বললেন সব। যাক সে কথা, কি ভাবে লোকটাকে হত্যা করা হয়েছে?

শ্বাস রুদ্ধ করেই অর্থাৎ স্ট্র্যাঙ্গল করেই অবিশ্যি তাকে হত্যা করা হয়েছে। তবে কি বলব মিঃ রায়, কি আশ্চর্য! কোন রকম ভাবে কোন স্ট্র্যাঙ্গল করার কোন চিহ্নই গলায় নেই মৃতের।

পোস্ট মর্টেমে বুঝি প্রমাণিত হয়েছে?

কি আশ্চর্য! পোস্ট মর্টেম এখন তো হয়ই নি। পুলিশ সার্জেনের তাই মত।

অভিমত! ও—তা মৃতদেহটা আবিষ্কৃত হল ঠিক কোথায়?

কালীঘাট ব্রীজের তলায়।

হত্যাকারীর তাহলে বলুন এখনও কিছুটা ধর্মভীতি রয়েছে!

কি আশ্চর্য! তার মানে?

এটা বুঝলেন না—সম্মুখেই পতিতোদ্ধারিণী মা গঙ্গা আর হাত বাড়ালেই সর্বপাপহারিণী সর্বমঙ্গলা মা কালী। হত্যার পাপ যদি হয়েই থাকে তাতেই স্খলন হয়ে গিয়েছে।

কথাগুলো বলে কিরীটী মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

॥ ১২ ॥

আমি কিন্তু তখনও রীতিমত অন্ধকারে হাতড়াচ্ছি।

মৃতের অনুরূপ কোন ব্যক্তিবিশেষকে স্মৃতির সাহায্যে মনের মধ্যে তোলপাড় করে খুঁজছি।

কিরীটী এমন সময় আবার কথা বললে, আপনার অনুসন্ধানের কাজটা তো এবার অনেক সহজ হয়ে এল নির্মলশিববাবু—

কি আশ্চর্য! সত্যি বলছি, দয়া করে আপনার হেঁয়ালি ছেড়ে সহজ করে যা বলবার বলুন।

সহজ করেই বলছি। কিন্তু তার আগে আপনার 'পরে যে কাজের ভার দিয়েছিলাম তার কি করলেন বলুন তো?

কোন কাজ?

বিশেষ কোন নম্বরের ট্যাকসির বা ভ্যানের ওভারসিজ লিংকে যাতায়াত আছে কিনা সংবাদটা পেলেন কিছু?

না। গত কয়দিন ভিন্ন ভিন্ন নম্বরের অন্তত গোটা পঁচিশেক ট্যাকসি ও ভ্যান ওই অফিসে যাতায়াত করতে দেখা গিয়েছে।

হুঁ। সোনার কারবারীরা খুবই সতর্ক আছে দেখছি। তবে টোপ যখন গিলেছে একবার ফসকে যেতে নিশ্চয়ই পারবে না।

কি আশ্চর্য! টোপ গিলেছে?

হ্যাঁ। ভিখনের মৃত্যুটা সেই টোপ গেলবারই অকাট্য নিদর্শন।

নির্মলশিব তারপর আরও কিছুক্ষণ ধরে নানাভাবে নানা প্রশ্ন করে কিরীটীর কাছ থেকে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার করে জানবার যাকে বলে আপ্রাণ চেষ্টা করল কিন্তু কিরীটী সে দিক দিয়েই গেল না আর।

নির্মলশিব যেন একটু বিষণ্ণই হয়ে পড়ে।

কিছুক্ষণ মুখ গোমড়া করে বসে থাকে।

অবশেষে এক সময় বলে, আমি কিন্তু একজনকে অ্যারেস্ট করব বলে এক প্রকার স্থিরই করে ফেলেছি ইতিমধ্যে মিঃ রায়।

অ্যারেস্ট করবেন? কাকে? এতক্ষণে মুখ তুলে তাকাল কিরীটী একটু যেন কৌতুকের সঙ্গেই।

আর্থার হ্যামিলটনকে। নির্মলশিব বললে।

সে কি! কেন?

আমার স্থির বিশ্বাস ওকে অ্যারেস্ট করলেই ঐ দলটার অনেক গোপন কথা পাওয়া যাবে।

সত্যিই পাওয়া যাবে মনে করেন?

নির্ঘাৎ পাওয়া যাবে।

এ ধারণা আপনার কেন হলো বলুন তো?

কেন?

হু।

ও একটি বাস্তু ঘুঘু।

বাস্তু ঘুঘু!

হ্যাঁ। ওকে চাপ দিলেই অনেক কিছু প্রকাশ হয়ে পড়বে। নির্ঘাৎ ও অনেক কিছু জানে।

কিরীটী প্রত্যুত্তরে এবারে হাসল।

কি আশ্চর্য! হাসছেন যে?

কারণ, তাতে করে আপনি যেটুকু এ কয়দিনে এগিয়েছেন তার দশগুণ আপনাকে পিছিয়ে আসতে হবে।

কি আশ্চর্য! তাহলে আমি কি করব বলতে পারেন?

আজ নয়, তিন দিন বাদে আসুন এই সময়। বলবো।

কি আশ্চর্য! কিন্তু—

কিন্তু নয়। জানেন না, সবুরে মেওয়া ফলে? শনৈঃ শনৈঃ পর্বত লঙ্ঘন করতে হয়—শাস্ত্রের বচন।

অতঃপর কতকটা ক্ষুণ্ণ মনেই বেচারী নির্মলশিবকে সেদিনের মত বিদায় নিতে হলো।

আরও আধঘণ্টা পরে।

সহসা কিরীটী গাত্রোত্থান করে বললে, চল সুব্রত, বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসা যাক।

বেলা তখন প্রায় বারটা। গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রের তাপে বাইরেটা তখন যে ঝলসে যাচ্ছে অনায়াসেই সেটা বোঝা যায় ঘরের মধ্যে বসেও।

বললাম, এই অসময়ে?

বেরুবার আবার সময় অসময় আছে নাকি? চল—ওঠ—

অগত্যা উঠতেই হলো।

এবং ঐ প্রখর রৌদ্রতাপের মধ্যে বাইরে বের হয়ে পদব্রজেই কিরীটী নির্বিকার চিত্তে পথ অতিক্রম করে চলল এবং বলাই বাহুল্য আমাকেও তার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলতে হলো।

হাঁটতে হাঁটতে লক্ষ্য করলাম কিরীটী ওভারসিজ লিংকের অফিসের দিকেই চলেছে।

তবু জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় চলেছিস?

পান খাবো। কিরীটী মৃদু কণ্ঠে হাঁটতে হাঁটতে বলে।

কিন্তু চলেছিস কোথায়?

বললাম তো পান খেতে।

পান!

হ্যাঁ, লোকটা—মানে সেই পানওয়ালাটা—চমৎকার পান সাজে রে, সেদিন চমৎকার লেগেছিল। বলতে বলতে হঠাৎ কিরীটী দাঁড়িয়ে যায়।

দাঁড়ালি কেন?

না, কিছু না, চল। চলতে শুরু করে আবার।

কয়েক পা চলে আবার কিন্তু দাঁড়ায়।

এবার মিনিট দু-তিন দাঁড়িয়ে থেকে আবার চলতে শুরু করে।

ব্যাপারটা কিন্তু এবার কিছুটা অনুমান করেই পিছনে তাকালাম।

হাত দশ-পনের দূরে দেখি একটা জীর্ণ-বেশ-পরিহিত পথের ভিক্ষুক-লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

মৃদু কণ্ঠে এবারে কিরীটী বললে, ঐ ভিখিরীটা বোধ হয় ভিক্ষে চায় না সুব্রত—

পুনরায় হাঁটতে শুরু করে এবং হাঁটতে হাঁটতেই কথাটা বলে কিরীটী।

তাই মনে হচ্ছে না কি?

হুঁ, সেই দোরগোড়া থেকেই একবার দেখছি অনুগত দেবর লক্ষ্মণের মতই আমাদের অনুগমন করে আসছে।

কথাটা কিরীটী বললে বটে তবে মনে হলো কিরীটী অতঃপর যেন আর পিছনের ভিখারীটার দিকে কোন মনোযোগই দিল না। হাঁটতে লাগল।

ততক্ষণ আমরা পানের দোকানের কাছাকাছি এসে গিয়েছি।

কিন্তু আজ দেখলাম পানের দোকানে অন্য একটি লোক বসে।

কিরীটী ক্ষণকাল লোকটার দিকে তাকিয়ে বলে, চার আনার ভাল পান সেজে দাও তো।

মিঠা না সাদা পান বাবু ?

মিঠা নয়, সাদা।৹ জর্দা কিমাম দিয়ে দাও।

লোকটি পান সাজতে লাগল।

আড় চোখে লক্ষ্য করে দেখলাম সেই ভিখারীটা অল্পদূরে একটা লাইট পোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে হাত পেতে পথচারীদের কাছে ভিক্ষা চাইছে।

॥ ১৩ ॥

কিরীটী অদূরবর্তী সেই ভিখারীর কথা উল্লেখ করার পর থেকেই আমার নজরটা সেই ভিখারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।

কিরীটী যখন পানওয়ালার সঙ্গে কথা বলছে আমার নজর তখন ভিখারীর প্রতিই নিবদ্ধ।

একটু অন্যমনস্কও হয়েছিলাম।

হঠাৎ সেই সময় কিরীটীর চাপা কণ্ঠস্বরে চমকে উঠি।

সুব্রত !

কি ?

ঐ ভিখারী সাহেবকে চিনতে পারছিস ?

অ্যাঁ ! কি বললি ?

বলছি ঐ ভিখারী সাহেবটিকে চিনতে পারছিস ?

সত্যি কথা বলতে কি তখনি লোকটা ভিখারীর ছদ্মবেশে যে আসলে কে বুঝে উঠতে পারি নি বলেই সেই দিকেই তখনও তাকিয়েছিলাম।

এবার কিরীটীর কথায় অদূরে দণ্ডায়মান ভিখারীর দিকে ভাল করে তাকালাম আর একবার।

চেহারা দেখে লোকটার বয়স ঠিক ঠিক বোঝবার উপায় নেই।

তবে মোটামুটি মধ্যবয়সী বলেই লোকটিকে মনে হয় ছদ্মবেশ থাকা সত্ত্বেও। পরিধানে একটা জীর্ণ সেলাই-করা মলিন ঝলঝলে গরম প্যাণ্ট।

গায়ে অনুরূপ একটা টুইডের ওপন-ব্রেস্ট কোট।

মাথায় একটা বহু পুরাতন জীর্ণ ফেল্ট ক্যাপ।

মুখভর্তি খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। হাতে একটা মোটা লাঠি।

ভিক্ষার জন্য পথচারীদের কাছে হাত পেতে দাঁড়িয়ে থাকলেও সেটা যে একটা ভেক মাত্র সেটা এবারে লোকটার দিকে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবার পরই বুঝতে পারলাম।

এবং ভিক্ষাটা যখন একটা ভেক মাত্র, লোকটার পোশাক ও বাইরের চেহারাটার মধ্যেও যে ছল রয়েছে, সেটাও তো সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু তবু যেন চিনতে পারলাম না লোকটাকে।

এমন সময় কিরীটীর মৃদু আকর্ষণে ওর মুখের দিকে তাকাতেই নিম্ন কণ্ঠে সে বললে, চল, গলাটা বড় শুকিয়ে গিয়েছে, সামনের ঐ 'পান্থ পিয়াবাস' থেকে চা দিয়ে গলাটা ভিজিয়ে নেওয়া যাক—

আমি এবারে কিরীটীর প্রস্তাবে দ্বিরুক্তি মাত্রও না করে রাস্তা অতিক্রম করে অপর দিককার ফুটপাতে সামনের দোকানটার মুখোমুখি প্রায় চায়ের রেস্টুরেন্টের দিকে এগিয়ে চললাম।

এবং ঠিক যেন ঐ সময়েই একটা চকচকে ভ্যান আমাদের পাশ কাটিয়ে গিয়ে পাশের দোকানটার সামনে রাস্তার 'পরে ব্রেক কষে দাঁড়াল।

ভ্যানটার গায়ে একটি নর্তকীর ছবি আঁকা ও তার মাথায় লেখা 'উর্বশী সিগারেট'।

ভ্যানটা প্রায় আর একটু হলেই আমাদের চাপা দিয়ে যাচ্ছিল আর কি, এমন ভাবে গা ঘেঁষে গিয়েছিল।

যাই হোক, দুজনে এসে অপর ফুটপাতে 'পান্থ পিয়াবাস' রেস্টুরেন্টের মধ্যে প্রবেশ করলাম।

ছোট রেস্টুরেন্ট ঐ সময়টা প্রায় নির্জনই ছিল।

মাত্র একটি চা-পিয়াসী লোক বসে বসে চা পান করছিল।

ঘর বলা যায় না, একটা চিলতে-মত জায়গায় রেস্টুরেন্টটি।

সিলিং থেকে দুটি ঘূর্ণ্যমান পাখা এবং দুটি পাখাই যে কত কালের পুরনো তার ঠিক নেই। ঘড়ং ঘড়ং একটানা শব্দ তুলে যেভাবে ঘুরছে তার তুলনায় হাওয়া কিছুই দিচ্ছে না।

ছোট ঐ এক চিলতে জায়গার মধ্যেই কাঠ ও চট সহযোগে একটা পার্টিশন দিয়ে চা ও অন্যান্য সব কিছু তৈরীর ব্যবস্থা।

অর্থাৎ রেস্টুরেন্টের রন্ধনশালা বা প্যানট্রি।

আর বাকী অংশে মালিকের ছোট টেবিল ও টুলটি ছাড়া ছয়টি টেবিল ও প্রত্যেক টেবিলের সঙ্গে চারটি করে চেয়ার পাতা।

হোটেলের মালিকের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে বলেই যেন মনে হল।

রীতিমত কৃষ্ণবর্ণ ও গোলালো মাংসল চেহারা লোকটার।

গায়ে বোধ হয় একটা মার্কিনের পাঞ্জাবি।

ঘরে ঘূর্ণ্যমান ইলেকট্রিক পাখা থাকা সত্ত্বেও হাতে একটি তাল পাতার পাখা সবেগে চালনা করছিল লোকটা থেকে থেকে, কারণ লোকটা ঘেমে একেবারে স্নান করে যাচ্ছিল।

আমাদের রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করতে দেখেই সবেধন নীলমণি ছোকরা চাকরটি এগিয়ে আসে।

কি দেব বাবু?

দু কাপ চা দে। কিরীটী বললে।

রাস্তার দিকে মুখ করে দরজা ঘেঁষে একেবারে দুজনে বসলাম দুটো চেয়ার টেনে।

কিরীটীর দিকে চেয়ে দেখি সে যেন অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে বাইরের দিকে।

এবং চেয়ে আছে যেন মনে হল রাস্তার অপর ফুটপাতের ধারে সামনের দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সেই উর্বশী সিগারেটের ভ্যানটার দিকেই।

আর ঐ সঙ্গে নজরে পড়ল খাঁকী বুশ-কোট ও প্যান্ট পরিহিত বোধ করি ঐ ভ্যানেরই ড্রাইভারটা পাশের দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে দোকানদারের সঙ্গে কথা বলছে।

ছোকরা চাকরটা এসে দু কাপ চা আমাদের দুজনের সামনে টেবিলটার 'পরে নামিয়ে দিয়ে গেল।

কিরীটীর কিন্তু যেন সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই।

থেকে থেকে ওষ্ঠধৃত সিগারটায় টান দিতে দিতে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে বাইরের দিকে দেখলাম তখনও।

বললাম, কি দেখছিস?

উর্বশী সিগারেট খেয়েছিস কখনও সুব্রত? পালটা প্রশ্ন করে আমার প্রশ্নের জবাবে কিরীটী।

না বললাম।

খেয়ে দেখ—এই নে, বলে পকেট থেকে সত্যি সত্যিই একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করে দিল।

আশ্চর্য হয়ে দেখলাম সেদিন যে ঐ দোকান থেকে দু-তিন প্যাকেট সিগারেট ও কিনেছিল তারই একটা।

কি বলব ভাবছি। এমন সময় কিরীটী আবার বললে, তা যাই বলিস, সিগারেটের ব্যবসা কিন্তু লাভজনক।

বললাম, জানি।

লেকের ধারে একটা বিরাট নতুন বাড়ি হয়েছে দেখেছিলাম।

নজর করি নি কোন বাড়িটার কথা বলছিস।

বিরাট চারতলা গেট ও লনওয়ালা বাড়িটার কথা বলছি। বাড়িটা শুনেছি এক বিড়ির ব্যবসায়ীর। 'হনুমানজী বিড়ি'; কিন্তু—

কি?

মোহিনী বিড়ি, মহালক্ষ্মী বিড়ি, হনুমানজী বিড়ি, হাউই জাহাজ বিড়ি, রেলমার্কা বিড়ি—নানা ধরনের বিড়ির বিজ্ঞাপন দেখেছি, কিন্তু সিগারেট বলতে তো সবেধন নীলমণি ন্যাশন্যাল টোবাকো কোম্পানি। হঠাৎ উর্বশী সিগারেট যে কোথা থেকে এল বুঝতে তো পারছি না। তা ছাড়া এর আগে ঐ নামটা চোখে পড়েছে বলেও তো মনে পড়ছে না।

তুই তো আর সিগারেট খাস না, খেলে হয়তো নজরে পড়ত।

তা বটে—অনেকগুলো প্যাকেট ভ্যান থেকে নামাচ্ছে দেখছি—

হুঁ। ব্যবসাটা বেশ জমে উঠেছে মনে হচ্ছে। তাই ভাবছি উর্বশীর আবির্ভাব কবে থেকে হল এ শহরে?

আমি ব্যাপারটায় আদৌ মনোযোগ দিই নি গোড়া থেকেই। তাই একটু হাল্কাভাবেই কথাগুলো বলছিলাম।

কিন্তু কিরীটীর পরবর্তী কথায় হঠাৎ যেন এতক্ষণে মনে হল আমার, কিরীটীর আজকের দ্বিপ্রহরের অভিযানটা ঐ পানের দোকানটিকে কেন্দ্র করেই।

এবং এতক্ষণে বুঝতে পারলাম এই খর-রৌদ্রতাপেও কিরীটীকে ঐ পানের দোকানটিই ঘরের বাইরে টেনে এনেছে।

কিন্তু নিশ্চয়ই তোর সীতা মৈত্র—আমাদের সেক্রেটারী দিদিমণি সিগারে খায় না সুব্রত?

বলাই বাহুল্য, কিরীটীর ঐ কথার সঙ্গে সঙ্গেই আমার দৃষ্টি পানের দোকানটার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

দেখলাম, আশ্চর্য! সত্যিই, সীতা মৈত্রই তো!

কাঁধে একটা র‍্যাশন ব্যাগের মত ব্যাগ ঝুলিয়ে পানের দোকানটার দিকে চলেছে ছাতা মাথায় দিয়ে।

সেই দিকেই তাকিয়ে রইলাম।

সীতা মৈত্র সোজা উর্বশী সিগারেট ভ্যানটার মধ্যে উঠে বসল এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ভ্যানটা ছেড়ে দিল।

ব্যাপারটা যেমনি বিস্ময়কর তেমনি আকস্মিক।

অতঃপর কিং কর্তব্যম্। মনে মনে বোধ হয় নিজের অজ্ঞাতেই তাই ভাবছিলাম।

হঠাৎ ঐ সময় আবার কিরীটীর কথায় চমকে উঠলাম, তোর নাম কি রে?

চেয়ে দেখি কিরীটীর সামনে দাঁড়িয়ে তখন রেস্ট রেণ্টের সবেধন নিলমণি ছোকরাটি।

এজ্ঞে—গদাই।

গদাই কি?

এজ্ঞে ঢোল।

কত মাইনা পাস এখানে?

এজ্ঞে কিছুই না।

হঠাৎ সেই সময় হোটেলের মালিকের গর্জন শোনা গেল, এই গদাই, এদিকে আয়—

গদাই তাড়াতাড়ি মনিবের ডাকে এগিয়ে গেল।

ওঠ সুব্রত। কিরীটী মৃদু হেসে বললে।

কোথায় যাবি?

কোথায় আবার যাব; বাড়ি যেতে হবে না?

রেস্টুরেণ্টের দাম মিটিয়ে দিয়ে দুজনে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম।

কয়েক পা অগ্রসর হতেই একটা খালি ট্যাকসি পাওয়া গেল।

হাত-ইশারায় ট্যাকসিটা থামিয়ে কিরীটী আমাকে নিয়ে ট্যাকসিতে উঠে বসল।

পথে কিরীটী একেবারে চুপ করে বসে রইল চলন্ত ট্যাকসির মধ্যে।

বুঝলাম গভীরভাবে কিছু একটা ও চিন্তা করছে।

এসময় কোন প্রশ্ন করলেও জবাব মিলবে না।

॥ ১৪ ॥

দিন দুই পরে একদিন দ্বিপ্রহরে।

কিরীটীর বাড়িতেই তার ঠাণ্ডা ঘরে বসে বসে কৃষ্ণার সঙ্গে গল্প করছিলাম।

গত পরশু সকালে কিরীটী কৃষ্ণাকে বলে গিয়েছে বর্ধমানে সে যাচ্ছে একদিনের জন্য। কিন্তু দুদিন হতে চললো প্রায় তার এখনও দেখা নেই।

কৃষ্ণার সঙ্গে বসে সেই আলোচনাই হচ্ছিল।

হঠাৎ তার বর্ধমানে কি দরকার পড়লো? শুধালাম আমি।

তা তো কিছু বলে যায় নি। কৃষ্ণা জবাব দেয়।

নির্মলশিববাবুর ব্যাপারেই গেল নাকি?

কে জানে!

ঐ দিনই বেলা তিনটে নাগাদ কিরীটী ফিরে এলো।

শুধালাম, হঠাৎ বর্ধমান গিয়েছিলি যে?

এই ঘুরে এলাম। একটা সোফার 'পরে বসতে বসতে কিরীটী জবাব দেয়।

তাই তো জিজ্ঞাসা করছি, হঠাৎ সেখানে কি কাজ পড়লো?

কাজ তেমন কিছু নয়, শ্বশুর বাড়ির দেশটা দেখে এলাম।

কার? কার শ্বশুর বাড়ির দেশ?

তিলোত্তমার। কিন্তু সখি—এবারে কিরীটী কৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে বললে, রন্ধনশালায় কিছু কি অবশিষ্ট আছে?

আছে।

তাহলে স্নানটা সেরে নিই।

কিরীটী উঠে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল।

কিরীটী মুখ খুললো আহারাদির পর আমি কৃষ্ণা ও কিরীটী তিনজনে যখন ঠাণ্ডা ঘরে এসে বসেছি।

গভীর জলের মাছ এইটুকু বোঝা গেল আজ। হঠাৎ কিরীটী একসময় বললে।

কিরীটীর খাপছাড়া কথায় ওর মুখের দিকে তাকালাম।

কিরীটী ওষ্ঠধৃত পাইপটায় একটা টান দিয়ে পাইপটা হাতে নিয়ে এবার বললে, বেচারী নির্মলশিব তাই কোন হদিস করতে পারে নি।

তুই তাহলে হদিস করতে পেরেছিস বল? প্রশ্ন করলাম আমি।

পুরোপুরি হদিস্ করতে পারি নি বটে তবে মোটামুটি রাস্তাটা মনে হচ্ছে বোধ হয় খুঁজে পেয়েছি।

রাস্তা!

হ্যাঁ, চারটে ঘাঁটির সন্ধান পেয়েছি কিন্তু শেষ অর্থাৎ পঞ্চম ঘাঁটিটা কোথায় সেটা জানতে পারলেই কিভাবে কোথা দিয়ে চোরাই সোনার লেন-দেনটা হয় জানতে পারতাম।

চারটে ঘাঁটির সন্ধান পেয়েছ? কৃষ্ণা প্রশ্ন করে এবার।

হ্যাঁ, এক নম্বর ঘাঁটি হচ্ছে 'ওভারসিজ লিংক', দুই নম্বর 'চায়না টাউন,' আর তৃতীয় ঘাঁটি পানের দোকানটি এবং অনুমান যদি আমার ভুল না হয় তো চতুর্থ ঘাঁটি হচ্ছে 'পান্থ পিয়াবাস'। অবিশ্যি স্বীকার করতেই হবে খুব planned wayতে কারবারটা চলছে যাতে করে কোনক্রমেই কোন দিক থেকে তাদের 'পরে সন্দেহ না জাগে কারও বিন্দুমাত্রও।

কিরীটীর কথার মধ্যেই ঐ সময় ঘরের কোণে রক্ষিত ফোনটা ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠল।

কিরীটীই তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ফোনটা ধরল, হ্যালো! কে, বাজারিয়া? হ্যাঁ, হ্যাঁ—রায় কথা বলছি। পাওয়া গিয়েছে! good—সুসংবাদ! আজ থেকেই তাহলে ফ্ল্যাটটা পাওয়া যাবে বলছে! তবে আজই যাব। হ্যাঁ—হ্যাঁ—আজই। সব ব্যবস্থা করে ফেল। ঠিক আছে।

কিরীটী ফোনটা নামিয়ে রেখে এসে পুনরায় সোফায় বসল।

কি ব্যাপার, কে ফোন করছিল? কি ফ্ল্যাটের কথা বলছিলে ফোনে? কৃষ্ণা শুধায়।

ওভারসিজ লিংকের উপরে একটা খালি ফ্ল্যাট পাওয়া গিয়েছে। কিরীটী মৃদুকণ্ঠে বলে।

ওভারসিজ লিংকের উপর খালি ফ্ল্যাট!

হ্যাঁ—

তা হঠাৎ ফ্ল্যাটের তোমার কি প্রয়োজন হলো?

এক বাড়িতে বেশীদিন থাকা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়। তাই একটু বাসা বদল আর কি।

মানে সেখানে তুমি যাচ্ছ?

হ্যাঁ, একটা সুটকেশে কিছু জামা-কাপড় আর বেডিং তৈরী করে রাখ।

কি হেঁয়ালি শুরু করলে বল তো? বলে কৃষ্ণা।

বাঃ, ঐ দেখ! হেঁয়ালি এর মধ্যে কি দেখলে? দিন্ কতক গিয়ে ওই ফ্ল্যাটটায় থাকব একটু নিরিবিলিতে ভাবছি।

ফ্ল্যাটটায় থাকবে?

হ্যাঁ, অবিশ্যি একা নয়, সহ সুব্রত।

আমি! প্রশ্নটা করে আমি কিরীটীর মুখের দিকে তাকালাম।

কি আশ্চর্য! নিশ্চয়ই তুই। 'কি আশ্চর্য'. নির্মলশিবকেও অবিশ্যি নেওয়া যেত কিন্তু ভিখারী সাহেবের চক্ষুকে কি ফাঁকি দিতে পারবে নির্মলশিবের ঐ বিশেষ প্যাটার্নের চেহারাটা?

কোন আর প্রতিবাদ করলাম না। কারণ বুঝতে পেরেছি তখন সবটাই কিরীটীর পূর্ব পরিকল্পিত।

এবং এও বুঝতে পেরেছি ওর সঙ্গে গিয়ে আমাকে সেই ফ্ল্যাটে আপাতত কিছুদিন থাকতে হবে। কেন যে তার মাথায় হঠাৎ ঐ পরিকল্পনার উদ্ভব হয়েছে তারও কোন উত্তর যে আপাততঃ ওর কাছ থেকে পাওয়া যাবে না তাও জানি।

তাই বললাম, তাহলে আমি উঠি—

উঠবি? ব্যস্ত কেন বোস।

বাঃ, তোর সঙ্গে যে যেতে হবে বললি।

হ্যাঁ—সে তো রাত এগারোটায়। এখন বোস, সন্ধ্যানাগাদ বের হয়ে যাবি, তারপর রাত ঠিক এগারোটায় গিয়ে হাজির হবি ৫নং ফ্ল্যাটে।

কিন্তু—

আমি থাকবো। অতএব কিন্তুর কোন প্রয়োজন নেই।

তুই কখন যাবি?

যথা সময়ে।

বলাই বাহুল্য ওভারসিজ লিংকের ফ্ল্যাটে গিয়ে না উঠলে ব্যাপারের গুরুত্বটা সত্যিই বোধ হয় অত শীঘ্র উপলব্ধি করতে পারতাম না।

আর সেখানে না গেলে অত তাড়াতাড়ি সীতা মৈত্রের পরিচয়টাও পেতাম না।

অথচ সীতা মৈত্রর পরিচয়টা জানা যে আমাদের কতখানি প্রয়োজন ছিল সেটা পরে বুঝতে পেরেছিলাম।

আর এও বুঝেছিলাম সেবারে কিরীটীর সূক্ষ্ম দৃষ্টি কতদূর পর্যন্ত দেখতে পায়।

যাক, যা বলছিলাম।

রাত এগারোটা বেজে ঠিক সাত মিনিটে গিয়ে ৫নং ফ্ল্যাটে পৌঁছতেই দরজা খুলে গেল।

কিরীটী পূর্ব হতেই তার কথামত ফ্ল্যাটে উপস্থিত ছিল। সে আহ্বান জানাল, আয়।

ভিতরে প্রবেশ করে সিঁড়ি বেয়ে উঠবার সময় যথাসম্ভব বাড়িটার গঠনকৌশল ও প্ল্যান দেখে নিয়েছিলাম।

প্রায় সাত কাঠা জায়গার উপরে বাড়িটা।

ভিতরে একটা চতুষ্কোণ বাঁধানো আঙিনা।

সেই আঙিনার দক্ষিণ দিকে সোজা খাড়া প্রাচীর দোতলা পর্যন্ত উঠে গেছে।

সেই প্রাচীরের ওপাশে অনেকটা জায়গা জুড়ে একটা টিনের শেড দেওয়া মোটর রিপেয়ারিংয়ের কারখানা।

তারপরেই তিনতলা দুটো বাড়ি পাশাপাশি।

ঐ দুটো বাড়ির মধ্য দিয়ে অপ্রশস্ত কাঁচা রাস্তা কারখানায় প্রবেশের। সেই বাড়ি দুটো রাস্তার উপর।

রাস্তা থেকে বুঝবারও উপায় নেই যে বাড়িটার দক্ষিণ দিকে অতখানি জায়গা নিয়ে একটা অমন বিরাট গাড়ি মেরামতের কারখানা রয়েছে।

পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিম দিকে পর পর সব ফ্ল্যাট।

এক-এক তলায় ছয়টি করে ফ্ল্যাট। এক-একটি ফ্ল্যাটে তিনখানি করে ঘর। পরে জেনেছিলাম বাথ্ ও কিচেন ছাড়া।

তিন দিকেই অর্থাৎ পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিমে বারান্দা এবং বারান্দার গায়ে গায়ে ফ্ল্যাটগুলো।

সিঁড়িটা বরাবর পূব-উত্তর কোণ দিয়ে উপরে উঠে গিয়েছে।

বারান্দায় দাঁড়ালে নীচের বাঁধানো আঙিনাটা দেখা যায়।

আঙিনার অর্ধেকটায় মোটা ও ভারী ত্রিপল খাটানো। দোতলা ও তিনতলার মত আঙিনার তিন দিকে নীচেও বারান্দা আছে।

নীচের তলায় উত্তর ও পশ্চিম দিকে গোটা চারেক যে ঘর ছিল সে ঘরগুলোও ওভারসিজ লিংকের ভাড়া নেওয়া।

পরে অবিশ্যি জেনেছিলাম সে কথাটা।

অর্থাৎ বাইরে রাস্তা থেকে যে 'ওভারসিজ লিংকে'র অফিস দেখা যায় সেটাই সবটা নয়, ভিতরেও অনেকটা অংশ জুড়ে তাদের কারবার।

৫নং ফ্ল্যাটের ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি, আকারে ঘরটা বেশ বড়ই।

এক দিকে দুটো খাট পাতা, খাটের 'পরে সজ্জা বিছানো।

এক ধারে একটি টেবিল ও দেওয়াল আলমারি।

ঘরের মাঝখানে একটা ক্যামবিসের আরামচেয়ারে বসে, সামনে ছোট একটা চতুষ্কোণ টুলের 'পরে তাস বিছিয়ে কিরীটী বোধ হয় পেসেন্স খেলছিল।

আমাকে দরজা খুলে দিয়ে পুনরায় গিয়ে চেয়ারে বসে পেসেন্স খেলার দিকে মন দিল।

দরজা বন্ধ করে দে সুব্রত। মৃদুকণ্ঠে কিরীটী বললে।

দরজাটা খোলাই ছিল, এগিয়ে গিয়ে ভিতর থেকে ছিটকিনি এঁটে দিলাম।

ঘরের সামনে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেই সামনের বড় ট্রামরাস্তাটা এদিক থেকে ওদিক বহুদূর পর্যন্ত চোখে পড়ে।

বারান্দাটা একবার ঘুরে অন্য ঘর দুটোও একবার দেখে নিলাম।

বাকি দুটো ঘর খালি।

ফিরে এলাম আবার কিরীটী যে ঘরে বসে তাস নিয়ে পেসেন্স খেলছিল সেই ঘরে।

॥ ১৫ ॥

আরও কিছুক্ষণ পরে ঐ রাত্রেই।

কিরীটী কিন্তু তখনও দেখি বসে বসে একমনে পেসেন্স খেলছে। হাত-ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি রাত সাড়ে এগারটা বাজে।

কি রে, তোর ব্যাপার কি বল তো? জিজ্ঞাসা করি কিরীটীকে।

কেন? মাথা না তুলেই জবাব দেয় কিরীটী।

না, তাই জিজ্ঞাসা করছি। এখানে এলি কি পেসেন্স খেলবার জন্যে?

তাস সাজাতে সাজাতে কিরীটী বললে, একেবারে মিথ্যে বলি কি করে, কতকটা তাই বটে।

মানে?

বেশ নিরিবিলি, বসে বসে রাত কাবার করে দিলেও কারও আপত্তির কিছু থাকবে না। তুই যদি দেখতিস ইদানীং কৃষ্ণা কি রকম খিটখিট করে তাস হাতে দেখলেই—সে যাক গে। তোর আপত্তি থাকলে ঘণ্টাখানেক তুই ঘুমিয়ে নিতে পারিস।

ঘুমিয়ে নেব মানে?

ঘুমোবি। ঘুমের ঘুম ছাড়া অন্য কোন মানে আছে নাকি? যা, শুয়ে পড়—

আর তুই বুঝি বসে বসে পেসেন্স খেলবি?

কি করি বল। পেসেন্স খেললে তবু জেগে থাকতে পারব।

বুঝলাম কিরীটী আপাতত জেগে থাকতেই চায়। তা সে যে কারণেই হোক না কেন।

আমি আর কোন কথা না বলে রাস্তার ধারের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

রাত্রি গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বড় রাস্তাও নির্জন হয়ে আসছে।

রাস্তায় পথিকের চলাচল কমে এসেছে।

গ্রীষ্মের রাত, নচেৎ এতক্ষণে রাস্তা হয়তো একেবারে নির্জন হয়ে যেত।

হঠাৎ ঐ সময় নজরে পড়ল রাস্তার ওদিকে 'পান্থ পিয়াবাস' রেস্টুরেণ্টটা তখনও খোলা আছে।

ভিতরে এখনও আলো জলছে এবং দরজা এখনও খোলা।

এত রাত্রেও 'পান্থ পিয়াবাসে'র অর্গল খোলা! এখনও কি খরিদ্দারের আশা করে নাকি!

পানের দোকানটা এই ফুটপাতে হওয়ায় বোঝা যায় না ওখান থেকে যে, ওটা খোলা কি বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

মধ্যে মধ্যে ট্যাকসি ও প্রাইভেট গাড়িগুলো রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করছে, তবে সংখ্যায় অনেক কম।

রিকসারও টুং-টুং শব্দ শোনা যায়।

রাস্তার দু ধারে সমস্ত দোকানই বন্ধ।

গ্রীষ্মের রাত, রাস্তায় খাটিয়া পেতে সব শোবার ব্যবস্থা করছে।

ঝিরঝির করে বেশ একটা ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিল।

তাছাড়া দিনের বেলায় ও রাত দশটা এগারটা পর্যন্ত মানুষের চলাচলে, যান-বাহনের ভিড়ে, নানাবিধ শব্দে গমগম-করা সেই রাস্তা যখন নির্জন হয়ে যায়, তার দিকে তাকিয়ে থাকতে কেমন যেন একটা নেশা ধরে।

তাই বোধ হয় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম।

এক সময় খেয়াল হতে তাড়াতাড়ি ঘরে এসে ঢুকলাম, কিন্তু ঘরে ঢুকে দেখি ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে।

টেবিলটায় তাস সাজানো রয়েছে কিন্তু কিরীটী ঘরে নেই।

কোথায় গেল কিরীটী?

পাশের ঘরের মধ্যবর্তী দরজাটা খোলাই ছিল। সেদিকে তাকিয়ে দেখলাম ঘরটা অন্ধকার।

সদর দরজার দিকে তাকালাম, সেটা কিন্তু বন্ধ।

বাথরুমেই হয়তো গিয়েছে মনে করে শয্যায় এসে বসলাম।

কিন্তু পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট করে আধঘণ্টা কেটে গেল, কিরীটির দেখা নেই।

এতক্ষণ কারো বাথরুমে লাগে নাকি!

শয্যা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছি এমন সময় পাশের অন্ধকার ঘরটা থেকে কিরীটী বের হয়ে এল।

কোথায় ছিলি রে?

ছাতে গিয়েছিলাম।

ছাতে!

হ্যাঁ, দেখছিলাম বাথরুমে যাতায়াত করবার জন্য সুইপারদের যে ঘোরান লোহার সিঁড়িটা আছে সেই সিঁড়িটা দিয়ে সোজা ছাতে চলে যাওয়া যায়। রাত নয়টার সময় এসে ঘুরে ফিরে দেখতে দেখতেই অবশ্য সব জানা হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু এত রাত্রে ছাতে গিয়েছিলি হঠাৎ?

উর্বশীর খোঁজে।

উর্বশী!

হ্যাঁ রে—সেদিনকার সেই সিগ্রেট উর্বশীর খোঁজে।

ছাতে উর্বশীর খোঁজে গিয়েছিলি মানে?

বোস, তোকে তাহলে সব বলি।

সাগ্রহে শয্যাটার উপর আবার বসলাম।

কিরীটী বলতে লাগল, ছাতে গেলেই তোর চোখে পড়বে এই বাড়ির পিছনে একটা গ্যারাজ ও মোটর রিপেয়ারিংয়ের কারখানা আছে। খোঁজ

নিয়ে জেনেছি ওটার নাম হচ্ছে লাটুবাবুর গ্যারাজ ও মোটর রিপেয়ারিং শপ। অবিশ্যি খোঁজটা দিয়েছিল নির্মলশিবের লোকই।

নির্মলশিবের লোক? মানে তুই তাহলে তাকে খোঁজ নিতে বলেছিলি?

অবশ্যই, য়্যাক্ শোন, কিছু দূরপাল্লার মালবাহী লরির গ্যারাজও ঐ লাটুবাবুর গ্যারাজটা। কলকাতা টু পুরুলিয়া, কলকাতা টু হাজারীবাগ ইত্যাদি প্লাই করে। নির্মলশিবের সেই নিযুক্ত লোকটি বেশ বুদ্ধিমান। চোখ খুলেই সে সব দেখেছিল। এবং সেই আমাকে খবর দেয় উর্বশী সিগারেটের একটা ভ্যানও নাকি ঐ গ্যারাজেই থাকে।

উর্বশী সিগারেটের ভ্যানটার কথা তাহলে তুই আগে থাকতেই জানতিস?

না।

তবে?

তুই আসার ঘণ্টাখানেক আগে এখানে এসে সে আমাকে ঐ খবরটা দিয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয় আরও একটা খবর সে দিয়ে গিয়েছে।

কি?

ঐ ভ্যানটি ছাড়া উর্বশী সিগারেটের অন্য কোন ভ্যানের নাকি কোন অস্তিত্বই নেই। যাই হোক, তাই দেখতে গিয়েছিলাম ছার্ত থেকে উর্বশী সিগারেটের ভ্যানটা গ্যারাজে ফিরে এসেছে কিনা।

দেখতে পেলি?

পেয়েছি। কিন্তু আজ রাত অনেক হল, আর না। এবারে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করা যাক।

সে রাত্রের মত আবার কিরীটী মুখ বন্ধ করল।

॥ ১৬ ॥

তারপরের দিন ও রাত কিরীটী ঐ ঘরের মধ্যে স্রেফ চেয়ারে বসে পেসেন্স খেলেই কাটিয়ে দিল।

নির্বিকার নিশ্চিন্ত।

ভাবটা যেন—বিশেষ বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল তাই বিশ্রাম নিচ্ছে।

সঙ্গে গোটা কয়েক নভেল এনেছিলাম, আমারও সেগুলো পড়ে সময় কাটতে লাগল।

তার পরের দিনটাও ঐ ভাবেই অতিবাহিত হল।

ক্রমে রাত্রি হল।

কোথায় কিরীটি খাবারের ব্যবস্থা করেছিল জানি না, একটা লোক নিয়মিত চা ও আহার্য সরবরাহ করে যাচ্ছিল।

সে রাতটাও ঐ ভাবেই কাটাতে হবে তখনও তাই মনে করেই শয্যায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। এবং বোধ করি ঘুমিয়েও পড়েছিলাম এক সময়।

হঠাৎ কিরীটীর হাতের স্পর্শে ঘুমটা ভেঙে গেল।

কি রে? ধড়ফড় করে উঠে বসি।

আয় আমার সঙ্গে। চাপা সতর্ক কণ্ঠে কিরীটি বললে।

কোথায়?

ও দিককার ঘরে।

কৌতূহলে কিরীটীর সঙ্গে গিয়ে সর্বশেষ ঘরটার মধ্যে প্রবেশ করলাম। ঘরটা অন্ধকার।

দেওয়ালে, দক্ষিণের দেওয়ালে, কান পেতে শোন তো কিছু শুনতে পাস কিনা।

কান পাততেই স্পষ্ট নারীকণ্ঠ কানে এল দেওয়ালের ও-পাশের ঘর থেকে।

পারব না, পারব না—আমি কিছুতেই পারব না।

পুরুষকণ্ঠে জবাব এল, পারতে হবেই তোমাকে।

না।

পারতে হবেই।

না, না—কি তোমার সে করেছে যে তাকে এইভাবে শেষ করতে চাও তুমি?

শেষ আমি করতাম না সীতা—

চমকে উঠলাম সীতা নামটা শুনে।

পুরুষকণ্ঠে তখনও বলছে, কিন্তু ঐ ইডিয়টটা যখন সব জেনে ফেলেছে একবার তখন ওকে সরে যেতেই হবে। পরশু এই সময় সে আসবে, তুমি তাকে শুধু গাড়িতে তুলে দেবে। তারপর যা করবার আমিই করব।

সত্যিই তাহলে তাকে তুমি প্রাণেই মারা স্থির করেছ?

একটু আগেই তো যা বলবার আমি বলেছি।

কিন্তু আমি সত্যিই বলছি, ওর দ্বারা তোমার কোন অনিষ্টই হবে না।

কিন্তু তোমারই বা তার জন্য এত মাথাব্যথা কেন?

মাথাব্যথা! না, না—

তাই তো দেখছি! না, পুরনো প্রেমের ঘাটা বুক থেকে তোমার এখনও শুকায় নি?

পুরনো প্রেম?

তাই তো মনে হচ্ছে, সম্পর্কচ্ছেদ করেও যেন তাকে ভুলতে পার নি আজও।

নারীকণ্ঠের কোনরূপ প্রতিবাদ আর শোনা গেল না।

যাক, আমি চললাম। যা বলে গেলাম ঠিক সেইভাবে যেন পরশু রাত্রে তুমি প্রস্তুত থাক।

একটু পরেই বারান্দায় পদশব্দ শোনা গেল।

ঘরের বাইরে ঠিক সামনের বারান্দা দিয়ে কে যেন চলে গেল।

আমরা দুজনে তখনও অন্ধকারে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে।

নারীকণ্ঠস্বরটি চিনতে না পারলেও নাম শুনেছি—সে সীতা মৈত্র। ওভারসিজ লিংকের সেক্রেটারী দিদিমণি। কিন্তু পুরুষটি কে! কণ্ঠস্বরে চিনতে পারলাম না তাকে।

দুজনে আমাদের পূর্বের ঘরে আবার ফিরে এলাম।

ঘরে ফিরে এসে কিরীটী কিছুক্ষণ পায়চারিই করতে লাগল।

বুঝলাম পায়চারি করতে শুরু করেছে যখন—এখন ঘুমাবে না।

আমারও ঘুম চোখ থেকে পালিয়েছিল ইতিমধ্যে।

কিরীটী পায়চারি করতে লাগল আর আমি চেয়ারটায় গিয়ে বসলাম।

এক সময় সহসা পায়চারি থামিয়ে কিরীটী আমার মুখের দিকে তাকাল, সুব্রত!

কি?

বর্ধমান গিয়েছিলাম কেন জানিস?

কেন?

এক সময় মানে চাকরির শেষ দিকে বছর দুই আগে আর্থার হ্যামিলটন বর্ধমান স্টেশনের এ. এস্. এম্. ছিল।

তাই নাকি!

হ্যাঁ। ওর অতীত সম্পর্ক খোঁজ করতে বলেছিলাম পুলিসকে। তারাই আমাকে সংবাদটা দিয়েছিল। দুবছর আগে ওর সার্ভিস রেকর্ড থেকে জানা যায় হ্যামিলটন কাজে ইস্তফা দেয়।

কেন ?

কারণটা অবিশ্যি জানা যায় নি। কিন্তু সীতার সঙ্গে তখন ওর রীতিমত নাকি সখ্যতাই ছিল।

তবে হঠাৎ গোলমালটা বাধল কেন ?

সম্ভবত অতি লোভে।

অতি লোভে!

হ্যাঁ। তাঁতী নষ্ট হয়েছে অতি লোভেই। কিন্তু থাক সে কথা, আপাতত কাল সকালে তোকে একটা কাজ করতে হবে।

কি কাজ ?

লাটুবাবুর গ্যারেজে তোকে একবার যেতে হবে।

লাটুবাবুর গ্যারেজে!

হ্যাঁ।

কেন ?

একটা সংবাদ তোকে যেমন করেই হোক যোগাড় করে আনতে হবে। লাটুবাবুর কারখানা ও গ্যারেজের বর্তমান মালিক কে ?

বেশ। কিন্তু একটা কথা তোকে জিজ্ঞাসা করব ভাবছিলাম কিরীটী।

কি ?

এটা অবশ্য বুঝতে পেরেছি যে সীতা মৈত্র আমাদের ঠিক পাশের ফ্ল্যাটেই থাকে। কিন্তু সে জন্যই কি—

কি ?

তুই এখানে এসে উঠেছিস ?

হ্যাঁ, এবং সেই সংবাদটা পেয়েই বাজোরিয়াকে যখন সেদিন ফোনে বলেছিলাম এই বাড়িতে আমাকে একটা ফ্ল্যাট যোগাড় করে দিতে তখন ঘুণাক্ষরেও ভাবি নি ঘটনাচক্রে ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় তার পাশের এই ফ্ল্যাটটাই খালি হয়ে যাবে। অনেক সময় পৃথিবীতে অনেক বিচিত্র যোগাযোগ ঘটে, এ ব্যাপারও ঠিক তাই হয়েছে।

তোর কি ধারণা সোনার চোরাকারবারীদের সঙ্গে ঐ সীতা মৈত্র ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ?

জড়িত কিনা এখনও সঠিক বুঝে উঠতে পারি নি। তবে—

কি ?

সীতা মৈত্রের যৌবন ও রূপ কোনটাই তো অস্বীকার করবার নয়।

অর্থাৎ—

অর্থাৎ এমনও হতে পারে, সীতা মৈত্রের রূপ ও যৌবন দুটোই শাণিত দুটি তরবারির মত মোক্ষম অস্ত্র হয়েছে ওদের হাতে।

আমারও তাই মনে হচ্ছিল কয়দিন থেকে। তবে একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না—

কি? কিরীটী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকাল।

আর্থার হ্যামিলটনের সঙ্গে সীতা মৈত্রের বর্তমান সম্পর্কটা কি?

কি আবার, পরস্পর পরস্পরের একদা স্ত্রী ও স্বামী ছিল। কোন কারণে বিচ্ছেদ ঘটেছে।

কারণটা কি আমাদের ঘটোৎকচ?

কিরীটী হেসে ওঠে।

বললাম, হাসলি যে?

কারণ তোর অনুমান যদি সত্যিই হয় তো বলব সীতা মৈত্রের রুচি নেই। কিন্তু মা ভৈষী! তা নয় বন্ধু, তুই নিশ্চিন্ত থাকতে পারিস। কিন্তু রাত অনেক হল, একবার একটু নিদ্রাদেবীর আরাধনা করলে মন্দ হত না।

কথাটা বলে সত্যি সত্যিই দেখলাম কিরীটী শয়নের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল।

কিরীটী!

কি?

পাশের ঘরে একটু আগে যারা কথা বলছিল তাদের মধ্যে একজনকে চিনতে পারলাম—সীতা মৈত্র। কিন্তু পুরুষের কণ্ঠস্বরটা কার বুঝতে পারলাম না তো?

কিরীটী ততক্ষণে শয্যায় আশ্রয় নিয়েছে।

একটা হাই তুলতে তুলতে বললে, পিয়ারীলাল।

পিয়ারীলাল! সে আবার কে?

লাটুবাবুর গ্যারেজের একজন মোটর মেকানিক। কিন্তু তোর ব্যাপার কি বল তো! তোর চোখে কি ঘুম নেই? আমার কিন্তু ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে।

কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে কিরীটী পাশ ফিরে শুল।

কিন্তু আমার চোখে সত্যিই তখন ঘুম ছিল না।

কয়েকটা মুখ আমার মনের পাতায় পর পর ভেসে উঠতে লাগল একের পর এক।

ঘটোৎকচ, সীতা মৈত্র, চিরঞ্জীব কাঞ্জিলাল ভিখারী সাহেব এবং আর্থার হ্যামিলটন। ঐ মুখগুলোর সঙ্গে নিজের অজ্ঞাতে যেন আর একখানি মুখ ভাববার চেষ্টা করতে লাগলাম, যাকে ইতিপূর্বে আমি না দেখলেও কিরীটী নিশ্চয়ই দেখেছে, নচেৎ ও জানল কি করে যে, নাম তার পিয়ারীলাল ?

লাটুবাবুর কারখানার একজন মোটর মেকানিক পিয়ারীলাল।

তা হোক, কিন্তু তার সঙ্গে সীতা মৈত্রের কি সম্পর্ক ?

আর ঘনিষ্ঠতাই বা লোকটার সঙ্গে তার কোন সূত্রে ?

এবং কেই বা সেই নিরীহ ইডিয়ট প্রকৃতির লোকটা যার প্রতি এখনও সীতা মৈত্রের পুরনো প্রেম বুকের মধ্যে জমানো রয়েছে, যে প্রেমের জন্য মোটর মেকানিক পিয়ারীলালের বুকে ঈর্ষাটা টনটনিয়ে উঠে রক্তনখর বিস্তার করেছে !

অন্ধকার ঘরে শুয়ে পিয়ারীলাল আর সীতা মৈত্রের কথাই ভাবছিলাম।

পিয়ারীলালের কণ্ঠস্বরে সেই ঈর্ষার সুরটুকু আমার কানকে এড়িয়ে যায় নি।

কেবল মাত্র ইডিয়ট ও সব জেনে ফেলেছে বলেই নয়, সীতা মৈত্রের বুকের মধ্যে আজও তার জন্য ভালবাসা রয়েছে বলেই এ দুনিয়া থেকে সরে যেতে হবে আজ তাকে ; পিয়ারীলাল তাই চায়।

আর যেতে তো হবেই, এই যে চিরাচরিত নীতি।

এক আয়েষার ভাগ্যাকাশে তো দুটি চন্দ্র থাকতে পারে না—ওসমান ও বীরেন্দ্র সিংহ।

ইডিয়ট ও মোটর মেকানিক পিয়ারীলাল।

কিন্তু কে ঐ ইডিয়ট ?

আর সত্যিই যদি সে ইডিয়ট হত সীতা মৈত্রের মত মেয়ের সেই ইডিয়টটার উপর দুর্বলতা থাকে কি করে ?

পিয়ারীলাল এক কথার মানুষ, সে তার কণ্ঠস্বরেই বোঝা গিয়েছে।

ইডিয়টটার আজ প্রাণ সংশয় হয়ে উঠেছে নিঃসন্দেহে। তাকে আজ এ দুনিয়া থেকে চলে যেতে হবেই।

শুধু স্বর্ণসন্ধানীদের রহস্য কিছুটা জেনে ফেলেছে বলেই নয়, পিয়ারীলালের প্রতিদ্বন্দ্বী আজ সে।

হায়রে বিচিত্র মানুষের মন, ভালবেসেও মুক্তি নেই, ভালবাসা পেয়েও মুক্তি নেই।

পঞ্চশরের ছমুখো শর।

কিন্তু ইডিয়ট—ইডিয়টটা কে? তবে কি—

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতই যেন নামটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখখানাও মনের পাতায় ভেসে উঠল : আর্থার হ্যামিলটন।

আর্থার হ্যামিলটনকে সীতা মৈত্র তাহলে আজও ভুলতে পারে নি!

॥ ১৭ ॥

পরের দিন সকাল আটটা নাগাদ কিরীটীর পূর্বরাত্রের নির্দেশ মত ঘর থেকে বের হলাম লাটুবাবুর গ্যারাজ ও ওয়ার্কশপের বর্তমান মালিকের অনুসন্ধানে।

আর মনের পাতায় যে অদেখা মানুষটার মুখটাকে তখনও কোন একটা পরিচিতের আকার দেবার চেষ্টা করছিলাম, সেই মোটর মেকানিক পিয়ারীলালের যদি সন্ধান পাই, দেখা পাই—সেই কথাটা ভাবতে ভাবতেই গেলাম।

তিনতলা ও চারতলা দুটো বাড়ির মাঝখান দিয়েই বলতে গেলে প্রায় গ্যারাজ ও ওয়ার্কশপে প্রবেশের কাঁচা অপ্রশস্ত রাস্তাটা।

বড় লরি বা বাস সে রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে পারবে বটে তবে একটু অসাবধান হলেই দেওয়ালে ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা।

ঢোকার মুখেই একটা হিন্দুস্থানীদের মিঠাইয়ের দোকান—'লক্ষ্মীনারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'।

একটা ভুষো কালির মত কালো কুচকুচে রঙ বিরাট ভুঁড়িওয়ালা লোক খালি গায়ে হাঁটুর 'পরে কাপড় তুলে বিরাট উনুনের ধারে বসে বিরাট একটা কড়াইয়ে গরম গরম জিলাপি ভাজছে।

সদ্যভাজা জিলাপির গন্ধটা কিন্তু বেশ লাগে।

এগিয়ে চললাম ভিতরের দিকে।

অনেকটা জায়গা নিয়ে বিরাট টিনের শেডের তলায় গ্যারাজ ও ওয়ার্কশপ। সবটা জায়গাই অবিশ্যি টিনের শেড দেওয়া নয়, উন্মুক্ত জায়গাও অনেকটা রয়েছে।

বিশেষ কোন লোকজন সামনাসামনি চোখে পড়ল না।

কেবল দেখলাম একটা রোগা ডিগডিগে লম্বা শিখ দাঁতনের একটা

কাঠি দিয়ে দাঁতন করছে আর অদূরের কলতলায় কে একটা লোক সাবান দিয়ে মাথা ঘষছে।

এদিক ওদিক আট-দশটা ট্রাক, বাস ও ট্যাকসি দাঁড়িয়ে রয়েছে উন্মুক্ত জায়গাটায়।

টিনের শেডটার মধ্যেও উঁকি দিলাম।

সেখানেও বাস, ট্রাক, প্রাইভেট কার অনেকগুলোই আছে।

বাতাসে একটা মোবিল ও পেট্রলের গন্ধ।

এ গেঁড়াইয়া, গাল শুন!

কে যেন কাকে সম্বোধন করল!

কে কাকে সম্বোধন করল জানবার জন্য এদিক ওদিক তাকাচ্ছি হঠাৎ গ্যারাজের মধ্যে একটা পার্টিশনের ভিতর থেকে বের হয়ে এলো ঘটোৎকচ, পরিধানে স্ট্রাইপ-দেওয়া ময়লা পায়জামা, গায়ে একটা গেঞ্জি, সদ্য সদ্য বোধ হয় ঘুম ভেঙেছে।

একেই প্রথম দিন ওভারসিজ লিংকের সেক্রেটারী দিদিমণির অফিস-ঘরে কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখেছিলাম।

ঘটোৎকচও পার্টিশান থেকে বের হয়েই আমাকে সামনে দেখে বুঝি মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ায়।

রোমশ জোড়া ভ্রূ দুটো যেন একটু কুঞ্চিত হয়েই পরক্ষণে আবার সরল হয়ে আসে।

কাকে চান? ঘটোৎকচই প্রশ্ন করে আমাকে।

মুহূর্ত না ভেবেই জবাব দিলাম, মিঃ পিয়ারীলালের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

ভ্রূ যুগল আবার মুহূর্তের জন্য কুঞ্চিত হল এবং আবার সরল হল।

ধূর্ত শিয়ালের মত চোখের দৃষ্টিটা এক লহমার জন্য বোধ হয় আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নিল একবার।

কেন, পিয়ারীলালকে দিয়ে কি হবে?

দরকার ছিল আমার একটু—

আমিই পিয়ারীলাল।

আপনিই পিয়ারীলাল? নমস্কার। আপনিই মোটর মেকানিক পিয়ারীলাল?

হ্যাঁ।

ঠিক ঐ সময় টিনের শেডের মধ্যে পূব কোণে নজর পড়ল, উর্বশী সিগারেটের ভ্যানটা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কিন্তু বাঁদিকে যেন নজরই পড়ে নি এমনিভাবে ঘটোৎকচের মুখের দিকে আবার তাকিয়ে বললাম, আপনিই কি এই গ্যারাজ-ওয়ার্কশপের মালিক?

ঐ সময় একটা ছোকরা এসে পিয়ারীলালের সামনে দাঁড়িয়ে বললে, চা দেব?

হুঁ, ঘরে দে।

ছোকরাটা চলে গেল।

অ্যাঁ, কি বলছিলেন, মালিক? তা বলতে পারেন বৈকি, আমি—আমি ছাড়া আর মালিক কে? কিন্তু কি দরকার আপনার এই গ্যারেজের মালিক কে জেনে?

কথাটা তাহলে আপনাকে খুলেই বলি মিঃ পিয়ারীলাল। আমার একটা বেশ বড় করে গ্যারাজ ও মোটর রিপেয়ারিং শপ খুলবার ইচ্ছা আছে। উলটাডাঙার ওদিকে একটা জায়গাও লিজ নিয়েছি।

কথাটা বলায় দেখলাম কাজ হল।

পিয়ারীলালের ভ্রূ যুগল কুঞ্চিত হয়ে আবার সরল হল।

আবার একবার যেন নতুন করে পিয়ারীলাল আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল।

আবার বললাম, তাই বড় বড় মোটর রিপেয়ারিং শপগুলো আমি ঘুরে ঘুরে যথাসম্ভব দশ দিক জানবার চেষ্টা করছি। আপনারা তো অভিজ্ঞ লোক, আপনাদের পরামর্শ মূল্যবান।

তা কি রকম ক্যাপিটাল নিয়ে নামছেন?

খুব বেশী নয়, হাজার পঞ্চাশ ষাট। রিপেয়ারিং তো হবেই আমার কারখানায়, সঙ্গে বডি বিলডিং, ছোটখাট একটা লেদ মেশিন আর স্প্রে পেনটিংয়ের ব্যবস্থাও থাকবে। আপনি কি বলেন, সেটাই বিবেচনার কাজ হবে না কি? তবে যাই করি, ভাল এক-আধজন মেকানিক না হলে তো আর কারখানা চালান যাবে না। আচ্ছা, সে রকম ভাল কোন মেকানিক আপনার খোঁজে আছে মিঃ পিয়ারীলাল?

না।

হঠাৎ পিয়ারীলালের কণ্ঠস্বরে আমার যেন কেমন খটকা লাগল।

নিজের অজ্ঞাতেই চমকে ওর মুখের দিকে তাকাই।

এখানে কোন সুবিধা হবে না। আপনি রাস্তা দেখুন—

কথাটা বলে পিয়ারীলাল আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না, সটান পার্টিশনের মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

॥ ১৮ ॥

বলাই বাহুল্য আমিও আর অতঃপর সেখানে দাঁড়াই না।

অবিলম্বে স্থান ত্যাগ করাই সমীচীন মনে হওয়ায় আমিও গ্যারাজ থেকে সোজা বের হয়ে এলাম।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ফ্ল্যাটে গেলাম না।

বড় রাস্তা পার হয়ে সোজা দক্ষিণমুখে হাঁটতে শুরু করলাম।

কিন্তু কিছুদূর হাঁটবার পরই মনটা কেমন সন্দিগ্ধ হওয়ায় পিছন ফিরে তাকালাম, কেউ অনুসরণ করছে না তো!

পশ্চাতে যারা ছিল তাদের মধ্যে তেলকালি-মাখা একটা নীল রঙের হাফপ্যাণ্ট ও হাওয়াই শার্ট পরিধানে রোগা লোককে দেখতে পেলাম।

সেই লোকটার সঙ্গে আমার ব্যবধান মাত্র হাত দশেক।

কেন যেন মনে হলো, লোকটা আমারই পিছু পিছু আসছে।

যাই হোক, আবার সামনের দিকেই চলতে শুরু করলাম।

কিন্তু মনের মধ্যে সন্দেহ জেগেছে, আবার কিছুদূর গিয়ে ফিরে তাকালাম।

ঠিক সেই ব্যবধানেই পূর্বের লোকটিকে পশ্চাতে দেখতে পেলাম।

অতঃপর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েই রইলাম।

লক্ষ্য করলাম, লোকটিও দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আবার চলা শুরু করতেই সেও দেখি চলতে শুরু করেছে।

আর কোন সন্দেহ রইলো না।

বুঝলাম লোকটা সত্যিই আমাকে অনুসরণ করছে।

মনে মনে হেসে একটা ট্যাক্সির সন্ধানে এদিক ওদিক তাকাতেই একটা খালি ট্যাকসি পাওয়া গেল।

অতঃপর প্রায় ঘণ্টা দুই এদিক ওদিক ঘুরে পূর্বোক্ত ফ্ল্যাটে যখন ফিরে এলাম বেলা তখন প্রায় সোয়া এগারোটা।

এসে দেখি ঘরের দরজা বন্ধ। সঙ্গে ডুপলিকেট ইয়েল লকের চাবি ছিল, চাবি দিয়ে ঘর খুলে ভিতরে প্রবেশ করলাম।

কিরীটী তখন ঘরে নেই, কোথাও বের হয়েছে নিশ্চয়ই।

ফ্যানটা চালিয়ে দিয়ে চেয়ারটার উপর গা ঢেলে দিলাম।

এবং এতক্ষণে যেন নিরিবিলিতে একাকী সকাল বেলাকার ব্যাপারটা আদ্যপান্ত মন্থন মনে ভাববার অবকাশ পেলাম।

কিরীটী কেন আমাকে পাঠিয়েছিল লাটুবাবুর গ্যারেজের আসল মালিকের অনুসন্ধান করতে!

আসল মালিকের নামটার কি সত্যিই কোন প্রয়োজন ছিল কিরীটীর!

তবে কি কিরীটীর সেই শেষ ও আসল ঘাঁটিটিই ঐ লাটুবাবুর গ্যারেজটা!

কিন্তু কথাটা যেন মন কিছুতেই মেনে নেয় না।

তা ছাড়া ঐ ঘটোৎকচ!

সে রাত্রে সীতা মৈত্রর ঘরে যে পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনেছিলাম সে ঘটোৎকচের গলা নয়।

অথচ ঘটোৎকচ বললে তারই নাম পিয়ারীলাল।

মিথ্যা বলেছে বলে মনে হয় না।

লোকটাকে আর একটু বাজিয়ে দেখতে পারলে হত।

আরও একটা কথা।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ ঘটোৎকচের গলার স্বর যখন বদলে গেল তখন বোঝাই যাচ্ছে আমাকে সে সন্দেহ করেছে বা সন্দেহের চোখে দেখেছে।

কিন্তু হঠাৎ আমার প্রতি তার মনে সন্দেহই বা জাগল কেন? আর কি করেই বা জাগল?

একদিন মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য ওভারসিজ লিংকের সেক্রেটারী দিদিমণি সীতা মৈত্রের ঘরে সে আমাকে দেখেছে।

তাও ঐ সময় সে আর্থার হ্যামিলটনকে নিয়েই ব্যস্ত ছিল, আমার দিকে নিশ্চয়ই ভাল করে নজর দেবারও তার অবকাশ হয় নি।

ঐটুকু সময়ের জন্য দেখেই সে আমাকে চিনে রেখেছে, নিশ্চয়ই তা সম্ভব নয়।

আর চিনেই যদি থাকে তো প্রথম থেকেই বা সেটা প্রকাশ করে নি কেন তার কথায় বার্তায় ও ব্যবহারে।

কিরীটীর ধারণা গত রাত্রে সীতা মৈত্রর ঘরে ঐ ঘটোৎকচ বা পিয়ারীলালই এসেছিল।

সীতা মৈত্রর সঙ্গে ঘটোৎকচের একটা সম্পর্ক আছে।

কিন্তু সে সম্পর্কটা কতখানি ?

ঘটোৎকচের সঙ্গে সীতা মৈত্রর সম্পর্কের কথাটা চিন্তা করতে গিয়ে কখন যে সীতা মৈত্রই মনটা জুড়ে বসেছে বুঝতে পারি নি।

কিরীটী মিথ্যা বলে নি, সত্যিই মেয়েটির অদ্ভুত যেন একটা আকর্ষণ আছে।

এমন এক-একখানি মুখ আছে যা একবার চোখে পড়লে মনের মধ্যে এমনভাবে একটা দাগ কেটে বসে যা কখনও বুঝি মুছে যায় না।

সীতা মৈত্রর মুখখানি তেমনি করেই যেন মনের মধ্যে দাগ কেটে বসে গিয়েছিল।

বার বার কেবলই একটা কথা ঘুরে ফিরে মনে হচ্ছিল, সীতা মৈত্র যেন ওদের দলের নয়।

ওদের দলে সীতা মৈত্র একান্তভাবেই বেমানান যেন।

সত্যিই দুর্ভাগ্য আর্থার হ্যামিলটনের, সীতা মৈত্রর মত স্ত্রী পেয়েও আজ সে ছন্নছাড়া, এক পাপচক্রের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে।

সীতা মৈত্রর মত স্ত্রী পেয়েও আজ তার ঘর নেই কেন ?

জীবনে কেন শান্তি নেই ?

কেন তাকে মদ খেয়ে নিজেকে ভুলবার চেষ্টা করতে হয় ?

আর কেনই বা তাকে সেই নেশার খরচ যোগাবার জন্য আজ অন্যের কাছে ভিক্ষুকের মত হাত পাততে হয় ?

রাজার ঐশ্বর্য পেয়েও আজ কেন সে ভিক্ষুকেরও অধম ?

যে ভালবাসা দিয়ে একদিন সে সমস্ত পৃথিবীকে অধিকার করতে পারত আজ সেই ভালবাসা কেন তাকে পেয়েও অমন করে হারাতে হলো ?

আর কেনই বা সে অমন ভাল চাকরীটা ছেড়ে দিল ?

সীতা মৈত্রর কথা ভাবতে ভাবতে কখন এক সময় বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কিরীটীর ডাকে ঘুম ভেঙে গেল।

কিরে সুব্রত, ঘুমে যে একেবারে কুম্ভকর্ণকেও হার মানালি !

কখন এলি ?

এই তো ফিরছি। কাল রাত্রে ঘুম হয় নি নাকি ?

সে কথার জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করলাম, কোথায় গিয়েছিলি ?

বিশেষ কোথাও না। তারপর পিয়ারীলালের সঙ্গে আলাপ হলো ?

হলো আর কই—

কেন ?

তাড়িয়ে দিল যে আলাপটা ঠিক জমে উঠবার মুখেই।

কি রকম ?

সংক্ষেপে সকাল বেলার ঘটনাটা খুলে বললাম।

সব শুনে কিরীটী শুধু বললে, হুঁ।

কিন্তু আমাকে সন্দেহ করল কি করে তাই ভাবছি।

কিরীটী কিন্তু আমার কথার ধার দিয়েও গেল না।

সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল সে।

বললে, একটা জরুরী কাজ একদম ভুলে এসেছি সুব্রত। সে কাজটা এখুনি একবার বের হয়ে গিয়ে তোকে সেরে আসতে হবে।

কি কাজ ?

রমেশ মিত্র রোডে আমার বন্ধু সন্তোষ রায় থাকে, সেখানে গিয়ে ফোন করে কৃষ্ণাকে একটা কথা বলবি—

বল্।

কাল রাত সাড়ে বারটা থেকে একটার মধ্যে হীরা সিং যেন আমার পাশের বাড়িতেই যে অ্যাডভোকেট সুহাস চৌধুরী থাকেন তাঁর গাড়িটা নিয়ে যোধপুর ক্লাবের মাঠের কাছে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে। কৃষ্ণা গিয়ে যেন সুহাস বাবুকে আমার কথা বলে গাড়িটা তাঁর চেয়ে নেয়। যা, আর দেরি করিস না। আজ শনিবার, হাইকোর্ট বন্ধ বটে, তবে বেলা একটার মধ্যেই সুহাস বাবু মাছ ধরতে একবার বের হয়ে গেলে আর তাঁর গাড়িটা পাওয়া যাবে না। গাড়িটা ভাল, rough রাস্তায় dependable।

আমি আর দ্বিরুক্তি না করে উঠে পড়লাম।

॥ ১৯ ॥

ফিরে এসে ঘরে ঢুকে দেখি চেয়ারটার 'পরে নিশ্চিন্ত আরামে গা ঢেলে দিয়ে কিরীটী ঘুমোচ্ছে।

ইতিমধ্যে ভৃত্য টিফিন ক্যারিয়ার করে টেবিলের 'পরে আহার্য রেখে গিয়েছিল।

হাতঘড়িতে দেখলাম বেলা তখন সাড়ে বারোটা বেজে গিয়েছে। ক্ষুধায় পেটে যেন পাক দিচ্ছিল।

বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে এসে কিরীটীকে ডেকে তুললাম : খাবি না ?

কিরীটী উঠে বসে আলস্যের একটা হাই তুলতে তুলতে বললে, আচ্ছা সুব্রত, বেদব্যাস-রচিত মহাভারত তো পড়েছিস তুই নিশ্চয়ই ?

প্লেটে খাবার সাজাতে সাজাতে বললাম, একদা বাল্যকালে।

সে যুগের অর্জুনের মত এ যুগের সুভদ্রাটিকে নিয়ে পালা না কেন তুই।

বলতে বলতে উঠে এসে খাবারের প্লেটটা টেনে নিয়ে বসল কিরীটী।

হাসতে হাসতে বললাম, তা মন্দ বলিস নি, কিন্তু মুস্কিল আছে যে একটা।

একটা মাছের ফ্রাই প্লেট থেকে তুলে নিয়ে বড় রকমের একটা কামড় দিয়ে আয়েস করে চিবুতে চিবুতে কিরীটী ভ্রু কুঁচকে নিঃশব্দে আমার মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, কেন ?

বললাম, সে যুগের হলধারী বলরাম যে এ যুগে রেঞ্চ হাতে ঘটোৎকচ হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন।

দুর, দুর—ওটা একটা একের নম্বরের গবেট। ওকে তো কাবু করতে দু মিনিট সময়ও লাগে না। ওসব নিয়ে মন খারাপ করিস না, বুঝলি। বলে আর একটা ফ্রাই তুলে নিয়ে আরাম করে তার স্বাদ গ্রহণ করতে করতে বললে, বুঝলি, বাবা বিশ্বনাথ বলে ঝুলে পড়।

ঝুলে পড়ব ?

হুঁ। দিবারাত্রি ঐ শ্রীমুখপঙ্কজখানি চিন্তা করার চাইতে ঝুলে পড়াই তো বুদ্ধিমানের কাজ।

দরজার গায়ে ঐ সময় মৃদু তিনটি নক্ পড়ল।

দরজাটা খুলে দে, আমাদের 'কি আশ্চর্য' নির্মলশিব এলেন।

সত্যি। নির্মলশিববাবুই।

কি আশ্চর্য! আপনার কথা শেষ পর্যন্ত একেবারে সেণ্ট পারসেণ্ট মিলে গেল মিঃ রায়।

একটা মাঝারি সাইজের প্যাকেট হাতে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে নির্মলশিব বললে।

আসুন নির্মলশিববাবু, বেশ গরম গরম ফ্রাই আছে, খাবেন নাকি ? কিরীটী ফ্রাইসমেত টিফিন ক্যারিয়ারের বাটিটা এগিয়ে দিল।

হঠাৎ তার অত্যধিক উৎসাহ ও উত্তেজনার মুখে কিরীটীর ঐরকম নিরাসক্ত ভাবে ফ্রাইয়ের বাটি এগিয়ে দেওয়ায় ভদ্রলোক যেন কেমন একটু থতমত খেয়ে যায়।

হাতের প্যাকেটটা হাতেই থাকে, কেমন যেন বোকার মতই প্রশ্ন করে। বলে, ফ্রাই ?

হ্যাঁ, অতি উপাদেয় ভেটকি মাছের ফ্রাই। খেয়েই দেখুন না।

বলতে বলতে কিরীটী নিজেই আর একটা ফ্রাই বাটি থেকে তুলে নিল।

কিন্তু মিঃ রায়—

কি বলুন ? বামাল তো পেয়েছেন আর কেমন করে পাচার হয় তারও হদিস পেয়েছেন।

তা—তা—পেয়েছি বটে, তবে—

কারবারীদের সন্ধান পান নি এই তো ? মা ভৈষী যজ্ঞের যখন সন্ধান পেয়েছেন হোতার সন্ধান পাবেন বৈকি !

কিন্তু বামালেরই বা সন্ধান পেলাম কোথায় ?

পান নি ?

কই, সবই তো উর্বশী সিগারেটের প্যাকেট। বলতে বলতে হাতের প্যাকেটটা সামনের টেবিলের 'পরে নামিয়ে রেখে নির্মলশিব হতাশায় একেবারে ভেঙে পড়ল সত্যি সত্যিই, দেখুন না উর্বশী সিগারেট।

প্যাকেটটা সঙ্গে সঙ্গেই আমি প্রায় টেবিল থেকে তুলে নিয়েছিলাম।

সত্যিই উর্বশী সিগারেটের লেবেল আঁটা একটা মাঝারি আকারের সাধারণ প্যাকিং পেপারে প্যাক-করা প্যাকেট।

আমি প্যাকেটটা খুলতে শুরু করেছি ততক্ষণে।

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, আপনি মশাই অত্যন্ত অবিশ্বাসী। বিশ্বাস না থাকলে কি কৃষ্ণ মেলে ? ঐ দেখুন সুব্রতকে, জহুরী ঠিক জহর চিনেছে, ইতিমধ্যেই প্যাকেটটা খুলতে শুরু করেছে—

উপর থেকে সাধারণ সিগারেটের প্যাকেট মনে হলেও যত্ন নিয়ে প্যাকেটটা বাঁধা হয়েছে।

এবং প্যাকেটটা খুলতেই চোখের সামনে বের হল আমাদের পর পর সাজান যত্ন করে সব ছোট ছোট সিগারেটের প্যাকেট।

আমি প্যাকেটগুলো সব এক-এক করে টেবিলের 'পরে নামালাম সবই। সিগারেটের প্যাকেট, মধ্যে তার অন্য কিছু নেই।

সিগারেটের প্যাকেটগুলো দেখে নির্মলশিবের মুখে তো হতাশার চিহ্ন ফুটে উঠেছিলই, আমারও মুখে বোধ হয় কিছুটা প্রকাশ পেয়েছিল।

কিরীটী কিন্তু নির্বিকার।

মৃদু হেসে বললে, কি, পরশপাথর মিলল না ?

এবং কথাটা বলতে বলতেই সহসা হাত বাড়িয়ে একটা প্যাকেট তুলে নিয়ে সেটা খুলে ফেলল।

খোলা প্যাকেটের সমস্ত সিগারেট চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

কিরীটী পরমুহূর্তেই আর একটা প্যাকেট তুলে নিল। সেটা খুলতেও সিগারেট দেখা গেল সবই।

তবু কিন্তু নিরতিশয় উৎসাহের সঙ্গে একটার পর একটা প্যাকেট তুলে নিয়ে কিরীটী খুলে যেতে লাগল।

কিন্তু সিগারেট—শুধু সিগারেট।

ততক্ষণে কিরীটীরও মুখের হাসি বুঝি মুছে গিয়েছিল।

সে যেন পাগলের মতই সিগারেটের প্যাকেটগুলো একটার পর একটা খুলতে থাকে।

সিগারেটগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

আমি আর নির্মলশিব নির্বাক।

কিরীটীর চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে একটা চাপা উত্তেজনায়।

কঠিন ঋজু চাপা কণ্ঠে যেন কতকটা আত্মগত ভাবেই বললে, না, ভুল হতে পারে না। কিছুতেই না। বলতে বলতে হাতে যে প্যাকেটটা তখন তার ছিল সেটা খুলতেই চকচকে একটা লম্বা চাবির মত কি বের হয়ে পড়ল। সাইজে সেটা দুই ইঞ্চি প্রায় লম্বা হবে।

পেয়েছি, এই যে পেয়েছি। ভুল হতে পারে ? ভুল হয় নি আমার—এই যে দেখুন—

উত্তেজনায় ততক্ষণে আমি ও নির্মলশিববাবু কিরীটীর হাতের দিকে ঝুঁকে পড়েছি।

কি আশ্চর্য ! এ যে সত্যি সত্যিই—

নির্মলশিবের অর্ধসমাপ্ত কথাটা কিরীটীই শেষ করল, হ্যাঁ, সোনার চাবি। ওজনে অন্তত তিন থেকে চার ভরি তো হবেই।

কি আশ্চর্য! দেখি, দেখি মিঃ রায়, দেখি। সোনার চাবিটা সাগ্রহ কৌতূহলে হাতে তুলে নিল নির্মলশিববাবু।

কিরীটী কথা বললে আবার, আজকের প্লেনে কতগুলো বাক্স যাচ্ছিল নির্মলশিববাবু ?

দশটা বাক্স।

দশটা বাক্স? এক-একটা বাক্সে কতগুলো করে প্যাকেট রয়েছে নিশ্চয়ই গুণে দেখেছেন?

দেখেছি বৈকি, কুড়িটা করে প্যাকেট।

কুড়িটা! তাহলে কুড়ি ইনটু দশ, দুইশত প্যাকেট, অর্থাৎ তাহলে হল দুইশত ইনটু চার অর্থাৎ আটশ ভরি সোনা আজ পাচার হচ্ছিল এ দেশ থেকে।

কি আশ্চর্য! বলেন কি! তাহলে তো সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে!

সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে মানে! বাক্সগুলো ছেড়ে দিয়েছেন নাকি? কিরীটী শুধাল।

তা, তা—দিয়েছি—কেমন করে জানব বলুন মশাই যে সিগারেট চালান যাচ্ছে, তার মধ্যে সত্যি সত্যিই সোনা রয়েছে?

কিন্তু আমি তো আপনাকে সেই জন্যই—অর্থাৎ মালগুলো আটক করবার জন্যই পাঠিয়েছিলাম।

কি আশ্চর্য! তা তো পাঠিয়েছিলেন—কিন্তু—

ঠিক আছে। আপনি এখুনি গিয়ে কাবুল কাস্টমসে একটা ওয়্যারলেস মেসেজ পাঠিয়ে দিন মালগুলো সেখানে আটক করবার জন্য।

কি আশ্চর্য! তা আর বলতে? এখুনি, আমি যাচ্ছি—

এক প্রকার যেন ছুটেই নির্মলশিব ঘরে থেকে বের হয়ে গেল।

কিরীটী আর একটা ফ্রাই বাটি থেকে তুলে কামড় দিতে দিতে বললে, নাঃ, ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে।

ঘণ্টা দেড়েক বাদেই আবার নির্মলশিব হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল আমাদের ফ্ল্যাটে।

কি হল, দিয়েছেন মেসেজ পাঠিয়ে?

হ্যাঁ, প্লেন এতক্ষণে বোধ হয় পৌঁছল কাবুল পোর্টে। কিন্তু কি আশ্চর্য! সত্যি সত্যিই সুব্রতবাবু, যাকে বলে তাজ্জব বনে গিয়েছি। অ্যাঁ—সিগারেটের প্যাকেটের মধ্যে সোনা! এ যে রূপকথাকেও হার মানাল!

সত্য, রূপকথার চাইতেও যে সময় সময় বিস্ময়কর কিছু ঘটে নির্মলশিববাবু।

কিন্তু তা যেন হল, এই উর্বশী সিগারেটের ব্যাপারটা আপনাকে সন্ধান দিল কে মিঃ রায় ?

মৃদু হেসে কিরীটী বলে, কে আবার দেবে। ভগবান যে দু' জোড়া চক্ষু কপালের 'পরে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিয়েছেন সেই চক্ষুজোড়াই সন্ধান দিয়েছে। তা যেন হল—আপনাকে আর একটা যে কাজের ভার দিয়েছিলাম সেটার কতদূর করলেন ?

কিসের ? সেই হরগোবিন্দবাবুর কুকুর দুটোর কথা তো ?

হ্যাঁ।

বললেন, তিনি কুকুর নিয়ে প্রস্তুত থাকবেন ঠিক সময়ে কথা দিয়েছেন।

ঠিক আছে, তাহলে আপনাকে ঠিক যে জায়গায় থাকতে বলেছি সেইখানে সশস্ত্র একেবারে হাজির থাকবেন কাল রাত্রে যথাসময়ে।

কি আশ্চর্য ! থাকব বৈকি।

তাহলে এবারে আসতে আজ্ঞা হোক।

কি আশ্চর্য ! উঠতে বলছেন তাহলে ?

হ্যাঁ।

বেশ, বেশ। কি আশ্চর্য ! তাহলে আমি চলি, কি বলেন ?

হ্যাঁ।

নির্মলশিববাবু বিদায় নেবার পর কিরীটী বললে, সুব্রত, ঘরটা একটু পরিষ্কার করে রাখ।

কেন, কি ব্যাপার ?

বলা তো যায় না, হঠাৎ ধর তোরই খোঁজে কোন ভদ্রমহিলার যদি এ ঘরে এই সময়ে আবির্ভাব ঘটে তিনি কি ভাববেন বল তো ? ভাববেন হয়তো আমরা বুঝি কেবল দক্ষিণ হস্তের একটি ব্যাপারের সঙ্গেই পরিচিত। সেটা কি খুব শোভন হবে ?

তা যেন বুঝলাম, কিন্তু আসছেন কে ?

কে বলতে পারে—হয়তো চিত্রাঙ্গদা, নয়তো রাজনটী বসন্তসেনা, কিংবা স্বয়ং উর্বশীই এই ক্ষুদ্র ফ্ল্যাটে আবির্ভূতা হতে পারেন।

হেঁয়ালি রাখ। কথাটা খুলে বল।

আমিই কি সঠিক জানি নাকি যে হেঁয়ালি ছেড়ে সঠিক বলব ? সবটাই তো আমার অনুমান।

কিন্তু কিরীটীর অনুমান সে রাত্রে মিথ্যেই হল।

অথচ সে রাত্রে প্রতিটি মুহূর্ত যে কার অপেক্ষাতে কিরীটী অসীম আগ্রহে কাটিয়েছে একমাত্র তা আমিই জানি।

এবং শেষ পর্যন্ত যতক্ষণ না রাত্রি প্রভাত হল কিরীটী শয্যায় গেল না।

জেগেই কাটিয়ে দিল রাতটা।

পরের দিনও সারাটা দিন কিরীটী ঘরে বসেই কাটিয়ে দিল।

কোথায়ও বের হল না।

কেবল চেয়ারটার 'পরে চোখ বুজে বসে রইল।

কিন্তু বুঝতে পারছিলাম তার কান দুটো খাড়া হয়ে আছে।

এবং সে কারো আসারই প্রতীক্ষা করছে।

অবশেষে এক সময় ক্রমশ বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা এল।

এবং ক্রমশ যতই সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হতে চলল, কিরীটী একটা চাপা উত্তেজনায় যেন অস্থির হয়ে উঠতে লাগল।

এবং ব্যাপারটা যে আদৌ হেঁয়ালি নয় সেটাই যেন ক্রমশ আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

কিরীটী সত্যি সত্যিই কারও আগমন প্রতীক্ষায় ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত অস্থির, অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে গত কালের মতই।

কিন্তু কে?

কার আগমন প্রতীক্ষা করছে কিরীটী?

কার আগমন প্রতীক্ষায় কিরীটী এমন চঞ্চল হয়ে উঠেছে?

এমন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে?

ইতিমধ্যে কিরীটী চেয়ার থেকে উঠে পায়চারি শুরু করেছিল।

আমি নির্বাক চেয়ারে বসে, আর কিরীটী ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে।

পায়চারি করছে দেখছি সে সমানে সেই বেলা তিনটা থেকে।

মধ্যে মধ্যে অস্থির ভাবে নিজের মাথার চুলে আঙুল চালাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ একটানা কয়েক ঘণ্টার প্রতীক্ষার বুঝি অবসান হল রাত্রি সাড়ে নয়টায়।

ঘরের বন্ধ দরজায় অত্যন্ত মৃদু নক্ পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু কিরীটী গিয়ে দরজা খুলে দিল।

আসুন—আপনার জন্যেই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম। আমি জানতাম

আপনি আসবেন। ও কি, বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? ঘরের ভিতরে আসুন—

ঘরে এসে ঢুকল সীতা মৈত্র।

আমিও দরজার কাছে এগিয়ে গিয়েছিলাম।

কিরীটী দরজাটা বন্ধ করে দিল।

বসুন।

সীতা মৈত্র কিন্তু বসল না।

হাতের হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে একখানা চিঠি বের করে কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললে, আপনিই তাহলে এই চিঠি আমাকে পাঠিয়েছেন?

চিঠির নীচে তো আমার নামস্বাক্ষরই তার প্রমাণ দিচ্ছে সীতা দেবী।

কিন্তু আমি আপনার চিঠির কোন অর্থই তো বুঝতে পারলাম না মিঃ রায়।

মৃদু হেসে কিরীটী বললে, পেরেছেন বৈকি।

পেরেছি?

হ্যাঁ। পেরেছেন। নচেৎ আমার কাছে চিঠি পড়েই ছুটে আসতেন না।

কিন্তু—

বসুন ঐ চেয়ারটায়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তো কথা হয় না।

বিশ্বাস করুন আপনি, আপনার এই চিঠির অর্থটা জানবার জন্যেই আমি এসেছি।

সত্যিই কি এখনও আপনি বলতে চান সীতা দেবী, চিঠির অর্থ আপনি বোঝেন নি? সত্যিই কি আপনি বলতে চান আপনার নিজের বর্তমান অবস্থার গুরুত্বটা আপনি এখনও বুঝতে পারেন নি?

আমার বর্তমান অবস্থার গুরুত্ব?

হ্যাঁ, মৃত্যু আপনার সামনে আজ এসে ওত পেতে দাঁড়িয়েছে।

মৃত্যু কথাটার সঙ্গে সঙ্গেই যেন চমকে তাকায় সীতা দেবী কিরীটীর মুখের দিকে।

কিরীটী নির্মম কণ্ঠে বলতে লাগল, আপনি জানেন না এখনও কিন্তু আমি জানি সীতা দেবী, যে দলের সঙ্গে আজ আপনি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক ভিড়েছেন, তাদের আসল ব্যাপারটা কি। ওভারসিজ লিংকের আসল ও সত্যিকার ব্যবসাটা কি, জানেন কি?

জানি বৈকি। কেমিক্যালস, চা, সিগারেট—

জোর গলাতেই কথাগুলো সীতা মৈত্র বলবার চেষ্টা করলেও যেন মনে হল গলাটা তার শুকিয়ে উঠেছে।

- -দু চোখে শঙ্কাব্যাকুল দৃষ্টি।

কিন্তু ওগুলো তো বাহ্য। আসলে যে মৃগয়া ওদের চলেছে সেটা কি জানেন?

কী?

চোরাই সোনা চালান দেওয়া।

সোনা?

ছোট একটা ঢোক গিলে যেন প্রশ্নটা করল সীতা।

হ্যাঁ, চোরাই সোনা। যে সোনা এদেশ থেকে নানা ভাবে চুরি করে, গালিয়ে, ছোট ছোট চাবির আকারে উর্বশী সিগারেটের প্যাকেটে ভরে বিদেশে চালান দিচ্ছে আপনাদের ওভারসিজ লিংকের কর্তারা

না, না—কি বলছেন আপনি?

ঠিকই বলছি।

কিরীটীবাবু. আমি—সত্যিই একেবারে কিছুই জানি না।

এতক্ষণে সত্যি সত্যিই সীতা মৈত্র যেন ভেঙে পড়ল।

॥ ২১ ॥

আপনি জানেন না যে তা আমি জানি. কিরীটী বলে, কিন্তু আর্থার হ্যামিলটন জানে।

আর্থার? না না—সে অত্যন্ত নিরীহ গোবেচারী লোক। তাকে আপনারা জানেন না, কিন্তু আমি জানি। সে এসবের মধ্যে সত্যিই নেই, বিশ্বাস করুন।

আপনার সঙ্গে তো তার গত দেড় বছর ধরে কোন সম্পর্ক নেই। আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তো সেপারেশন হয়ে গিয়েছে।

হয়েছে, তবু তাকে আমি জানি। সে এসবের কিছু জানে না। He is so innocent! এত নিরীহ—

বলতে বলতে সীতা মৈত্রের দু চোখের কোল ছলছল করে ওঠে।

টপটপ করে তাই দুই চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু সীতা দেবী. পিয়ারীলাল তো সে কথা বিশ্বাস করে না। কিরীটী এবারে বললে।

পিয়ারীলাল! চমকে তাকায় সীতা মৈত্র কিরীটীর মুখের দিকে।

হ্যাঁ, পরশু রাত্রে সে কথা কি সে আপনাকে এসে বলে যায় নি?

ঐ কথার সঙ্গে সঙ্গে সীতার সমস্ত মুখখানা যেন একেবারে মড়ার মতই ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

আর্থার হ্যামিলটনকে সে শেষ করে দিতে চায় সেই কথাই কি গতরাত্রে পিয়ারীলাল এসে আপনাকে জানিয়ে যায় নি?

সীতা একেবারে বোবা হয়ে যায় যেন।

কয়েক মুহূর্ত তার মুখ দিয়ে কোন শব্দই বের হয় না।

কি, চুপ করে রইলেন কেন? কোথায় গাড়িতে করে যাবার কথা আছে আজ রাত্রে আপনাদের? বলুন, এখনও আর্থারকে যদি বাঁচাতে চান তো বলুন।

সীতা নির্বাক। পাথর।

আর্থারকে তো আজও আপনি ভালবাসেন। কেন তবে চুপ করে থেকে তার সর্বনাশ ডেকে আনবেন মিস মৈত্র?

জানি না, আমি কিছুই জানি না—

দু হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলল সীতা মৈত্র।

কোন ভয় নেই আপনার সীতা দেবী, নির্ভয়ে আপনি বলুন, আমি কথা দিচ্ছি আপনার নিরাপত্তার জন্য দায়ী আমি থাকব। বলুন, চুপ করে থাকবেন না।

কোথায় তাকে নিয়ে যাবে আমি জানি না, তবে—

তবে?

আজ অফিসে পিয়ারীলালকে বলতে শুনেছিলাম আমাদের উর্বশী সিগারেটের ভ্যানটা নাকি বারুইপুরে যাবে।

বারুইপুরে?

হ্যাঁ—সিগারেটের কারখানাটা শুনেছিলাম এক সময় বারুইপুরে নাকি কোথায়।

হ্যাঁ। তাহলে আমার অনুমান মিথ্যে নয়!

কিরীটী যেন অতঃপর চিন্তিতভাবে কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে পায়চারি করলে।

তারপর এক সময় পায়চারি থামিয়ে বললে, ঠিক আছে, আপনি আপনার ঘরে যান—

এখন তো আমি ঘরে যাব না—

তবে ?

—চায়না টাউন হোটেলে একবার যেতে হবে।

কেন ? সেখানে কি ?

সেখানেই আর্থার থাকে—সেখান থেকে তাকে নাকি ওরা গাড়িতে তুলে নেবে সেই রকম কথা হয়েছে।

আপনার সঙ্গে কি সেই রকম কথা ছিল ?

না। আমার এখানেই থাকবার কথা। কিন্তু—

ঠিক আছে, আপনি যান চায়না হোটেলে, আপনার কোন ভয় নেই।

যাব ?

হ্যাঁ, যান।

সীতা মৈত্র ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

॥ ২২ ॥

সেই রাত্রেই।

ভবানীপুর থানায় আমি, কিরীটী ও নির্মলশিববাবু অপেক্ষা করছিলাম এমন সময় ফোনে সংবাদ এল, সীতা মৈত্র তখনও নাকি চায়না টাউনে যায় নি।

একটু অবাকই হলাম আমরা সংবাদটা পেয়ে।

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ আমাদের ফ্ল্যাট থেকে সীতা মৈত্র বের হয়ে গিয়েছে।

এখন রাত সাড়ে এগারটা : এখনও চায়না টাউনে সে পৌঁছায় নি মানে কি !

সংবাদটা পেয়ে কিরীটী যেন একটু চিন্তিতই হয়ে ওঠে।

বলে, তবে কি সে সেখানে আদৌ পৌঁছাতেই পারল না ?

কিরীটী মুহূর্তকাল যেন কি চিন্তা করে।

তারপরই মৃদু কণ্ঠে ডাকে, সুব্রত !

কি ?

ব্যাপারটা ভাল মনে হচ্ছে না। এ দিকে হরিপদও তো এখনও পর্যন্ত কোন ফোন করল না। উর্বশী সিগারেটের ভ্যানের সংবাদটা তার দেওয়ার কথা ছিল—

কিরীটীর কথা শেষ হল না। ফোন বেজে উঠল।

নির্মলশিবই ফোন ধরেছিল।

কি আশ্চর্য! কে, হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমি ও. সি. কথা বলছি। সন্ধ্যার সুমন্ত যে সেই ভ্যান গ্যারাজ থেকে বের হয়ে গেছে আর ফেরে নি!

ফোন রেখে দিয়ে নির্মলশিব কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল, কি আশ্চর্য! শুনলেন তো মিঃ রায়, ভ্যান এখনও ফেরে নি।

হুঁ, শুনলাম আর দেরি নয়—চলুন—

সকলে আমরা এসে জীপে উঠে বসলাম।

কিরীটী নিজেই ড্রাইভারকে সরিয়ে দিয়ে ষ্টীয়ারিং ধরল।

রাত পৌনে বারটা প্রায়।

কলকাতা শহর প্রায় নিযুতি হয়ে এসেছে।

নির্দিষ্ট জায়গায় এসে দেখা গেল এক ভদ্রলোক বিরাটকায় দুই অ্যালসেসিয়ান কুকুর নিয়ে তাঁর গাড়ির মধ্যে বসে আমাদের জন্য অপেক্ষা রছেন।

কিরীটী শুধালে, হরগোবিন্দ এসেছ কতক্ষণ?

তা বোধ হয় ঘণ্টাখানেক হবে।

ঠিক আছে, আমাদের গাড়ির পিছনে পিছনে তুমি তোমার গাড়িটা নিয়ে এস—

আগে আমাদের জীপ, পিছনে হরগোবিন্দর গাড়ি।

বারুইপুরে এসে আমরা পৌঁছলাম রাত একটা নাগাদ।

পথের ধারে এক জায়গায় গাড়ি দাঁড় করান হল।

নির্মলশিববাবু প্রশ্ন করে এবারে।

কিরীটী এবার তার পকেট থেকে একটা ব্যবহৃত ঘামের গন্ধঅলা পুরনো গেঞ্জি কাগজের মোড়ক থেকে বের করে হরগোবিন্দকে বললে, তোমার জ্যাকি আর জুনোকে নিয়ে এস তো গাড়ি থেকে নামিয়ে।

হরগোবিন্দ নিয়ে এল গলায় চেন বাঁধা কুকুর দুটো গাড়ি থেকে নামিয়ে।

সেই গেঞ্জিটা কুকুর দুটোকে শুঁকতে দেওয়া হল কিছুক্ষণ।

কুকুর দুটো আকাশের দিকে অন্ধকারে মুখ তুলে বার দুই ঘেউ ঘেউ শব্দ করে এগুতে শুরু করল।

আগে আগে কুকুর দুটো, আমরা তাদের পিছু পিছু চলতে লাগলাম।

কখনো রাস্তা, কখনো মাঠ, কখনো পুকুরের ধার দিয়ে কুকুর দুটো যেতে লাগল।

প্রায় আধঘণ্টা পরে নির্জন একটা পড়ো বাড়ির কাছাকাছি আসতেই আমাদের নজরে পড়ল অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছে উর্বশী সিগারেটের সেই কালো রঙের চকচকে ভ্যানটা।

সঙ্গে সঙ্গে কিরীটী হরগোবিন্দকে চাপা কণ্ঠে যেন একেবারে ফিস্ ফিস্ শব্দে নির্দেশ করে, থামা।

হরগোবিন্দ কিরীটীর নির্দেশ মত কুকুর দুটোর গলায় বাঁধা চেনে টান দিতেই শিক্ষিত কুকুর দুটো থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

একপাও তারা আর নড়ল না।

পূর্ববৎ চাপা কণ্ঠে কিরীটী ডাকে, সুব্রত!

কি?

দেখেছিস?

হুঁ।

নির্মলশিববাবু?

বলুন।

পিস্তল আছে তো সঙ্গে?

হ্যাঁ।

লোডেড্?

হ্যাঁ।

O. K.

বাড়িটার মধ্যে আমাদের প্রবেশ করতে বিশেষ কোন বেগ পেতে হল না।

পরে জেনেছিলাম সেটা এককালে নাকি নীলকুঠি ছিল।

বিরাট বিরাট ঘর, বিরাট আঙিনা—কিন্তু সব যেন অন্ধকারে খাঁ খাঁ করছে।

পাখি কি তবে পালাল? নিজেকেই নিজে যেন মনে মনে প্রশ্নটা করি।

এমন সময় হঠাৎ নজরে পড়ল অন্ধকারে একটা ক্ষীণ আলোর আভাস।

আলোর আভাসটা আসছিল সামনেরই একটা ঘরের ঈষৎ উন্মুক্ত দ্বারপথে।

সর্বাগ্রে ছিল কিরীটী।

তার পশ্চাতে আমি ও আমার পাশে নির্মলশিববাবু।

কিরীটী দরজার কাছ বরাবর গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ে।

এবং পূর্ববৎ ফিস্‌ ফিস্‌ করে আমাকে বলে, শুনছিস?

হুঁ।

অত্যন্ত ক্ষীণ একটা গ্রোনিংয়ের শব্দ যেন কানে আসছিল সামনের ঘরের ভিতর থেকে।

নির্মলশিববাবু, গেট রেডি।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই কিরীটী যেন একপ্রকার ছুটে গিয়েই দড়াম করে ঘরের দরজাটা খুলে ঘরের মধ্যে গিয়ে পড়ল।

আমিও সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যাই।

ঘরে ঢুকে দেখি ঘরের দেওয়ালে একটা দেওয়ালগিরি টিমটিম করে জ্বলছে।

আর একটা শয্যার 'পরে অসহায়ের মত চিৎ হয়ে পড়ে আছে কে একজন।

আচমকা ঐ সময় দরজার ওপাশ থেকে একটা ছায়ামূর্তি যেন ঝাঁপিয়ে এসে কিরীটীর উপর পড়ল।

কিরীটীও সঙ্গে সঙ্গে তাকে দুহাতে জাপটে ধরে, এবং চোখের পলকে তাকে যুযুৎসুর এক মোক্ষম প্যাঁচে কায়দা করে ধরাশায়ী করে ফেলে।

আমি ততক্ষণে ছুটে শয্যার উপর শায়িত মানুষটার দিকে এগিয়ে গিয়েছি এবং তার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠি।

একি! এ যে সীতা!

কিরীটী ঐ সময় আমাকে ডেকে বলে, সুব্রত, শয়তানটাকে কায়দা করেছি, তুই আগে দেখ সীতা দেবীকে—

সীতাকে তখন আর দেখব কি। প্রাণ আছে কিনা সন্দেহ।

নিশ্চল রক্তাক্ত দেহটা শয্যার উপর পড়ে রয়েছে।

সমস্ত পরিধেয় বস্ত্র রক্তে একেবারে লাল।

ডান দিককার বুকেই রক্তাক্ত ক্ষত স্থানটা নজরে পড়ল। শয্যার এক পাশেই নজরে পড়ল পড়ে আছে রক্তমাখা একখানা ছোরা।

বুঝলাম ঐ ছোরাটাই সীতার বুকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

ঘটনার আকস্মিকতায় নির্মলশিববাবু প্রথমটায় বোধ হয় একটু হতভম্বই হয়ে গিয়েছিল।

কারণ সে তখনও একপাশে বোকার মত দাঁড়িয়েছিল।

আমি ঝুঁকে পড়লাম নিঃসাড় সীতার মুখের কাছে, প্রাণ আছে কিনা দেখবার জন্য।

কিরীটী ইতিমধ্যে তার আক্রমণকারীকে যুযুৎসুর প্যাঁচে ধরাশায়ী করে বুকের উপর চেপে বসেছিল।

নির্মলশিববাবুকে লক্ষ্য করে সে এবারে বলে, নির্মলশিববাবু, আমার পকেটে সিল্ককর্ড আছে একটা বের করুন তো, এটাকে বেঁধে ফেলা যাক।

নির্মলশিব তাড়াতাড়ি এবার এগিয়ে গেল কিরীটীর কাছে। এবং তার পকেট থেকে সিল্ককর্ডটা টেনে বের করল।

এবং ক্ষিপ্র হস্তে কিছুটা কিরীটীর সাহায্যেই শেষ পর্যন্ত নির্মলশিব আততায়ীকে বেঁধে ফেলল।

এতক্ষণ আততায়ীকে কিরীটী মাটিতে উবুর করে রেখেছিল। পিছন দিক থেকে তাকে শক্ত করে সিল্ককর্ডের সাহায্যে বাঁধবার পর চিৎ করতেই আমার লোকটার মুখের প্রতি প্রথম নজর পড়ল।

আমি চমকে উঠি লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে।

শেষ পর্যন্ত আততায়ী আর্থার হ্যামিলটন!

সত্যিই বিস্ময়ের যেন আমার অবধি থাকে না।

সীতার আততায়ী আর্থার হ্যামিলটন!

ইতিমধ্যে আততায়ী হ্যামিলটনকে বন্দী করে কিরীটী আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল।

এবং কোন কথা না বলে প্রথমেই সীতার নাকের কাছে মুখ নিয়ে পরীক্ষা করল তারপর তার হাতটা তুলে নিয়ে নাড়ির গতি পরীক্ষা করল।

এখনও প্রাণ আছে বলেই মনে হচ্ছে। তবে মনে হচ্ছে বাঁচবে না। তার পরেই পার্শ্বে দণ্ডায়মান নির্মলশিবের দিকে তাকিয়ে বললে, নির্মলশিববাবু, একে এখুনি হাসপাতালে রিমুভ করা দরকার।

আমার জীপে করেই তাহলে নিয়ে যাই?

হ্যাঁ, সেই ব্যবস্থাই ভাল হবে। চলুন—আর দেরি নয়।

বলতে বলতে কিরীটী নিজেই নীচু হয়ে রক্তাক্ত সংজ্ঞাহীনা সীতার দেহটা দুহাতে বুকের 'পরে তুলে নিল।

নির্মলশিব বন্দী আর্থার হ্যামিলটনকে নিয়ে অগ্রসর হল।

আর্থার হ্যামিলটন যেন একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

বিনা প্রতিবাদে সে চলতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু জীপে তোলা গেল না সীতার দেহটা।

কাজেই হরগোবিন্দর গাড়িতেই দেহটা তোলা হলো।

সেই গাড়িতেই আমি ও কিরীটী উঠলাম।

কিরীটীর নির্দেশে বন্দী আর্থার হ্যামিলটনকে নিয়ে জীপে উঠে বসলো নির্মলশিববাবু।

স্থির হলো হাঁসপাতালে সীতাকে পৌঁছে দিয়ে আমরা থানায় যাব।

॥ ২৩ ॥

পরদিন বেলা সাতটা নাগাদ কিছুক্ষণের জন্য সীতার জ্ঞান হলো।

কিরীটী ও আমি এবং নির্মলশিববাবু তিনজনেই সীতার বেডের সামনে ছিলাম। কিন্তু বিশেষ কিছুই বলবার ক্ষমতা তখন আর ছিল না সীতার।

নিদারুণ ভাবেই সে আহত হয়েছিল, মারাত্মক ছুরির আঘাত।

তার উপরে অতিরিক্ত রক্তস্রাব।

সীতাকে চোখ মেলে তাকাতে দেখেই কিরীটী তার মুখের 'পরে ঝুঁকে পড়ে।

কিছু বলবেন সীতা দেবী?

ছলো ছলো চোখে তাকিয়ে থাকে সীতা কিরীটীর মুখের দিকে।

কোন কথাই যেন বলতে পারে না।

ঠোঁট দুটো থর থর করে কাঁপতে থাকে কেবল।

বলুন কিছু যদি বলতে চান। কিরীটী আবার বলে।

আর্থার—

হ্যাঁ, বলুন আর্থার কি?

তাকে—তাকে বোধ হয় শেষ পর্যন্ত বাঁচাতে পারলাম না মিঃ রায়।

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, হি ইজ সেভড্।

বেঁচেছে। সে—সে—

হ্যাঁ। সে অক্ষতই আছে।

অক্ষত আছে! হি ইজ সেভড্! থ্যাংক গড্—

শেষের কথাগুলো যেন ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে গেল।

দু চোখের কোল বেয়ে দু ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

আমারও চোখে জল এসে যায়।

ঐ দিনই।

থানায় বসে কিরীটী বলছিল, বেচারী সীতার ঐ করুণ পরিণতির ব্যাপারে কোনদিনই বোধ হয় নিজেকে আমি ক্ষমা করতে পারব না।

নির্মলশিববাবু প্রশ্ন করে, কেন ও কথা বলছেন মিঃ রায়?

কারণ সীতার ঐ পরিণতির জন্য আমিই বোধ হয় দায়ী।

আপনি?

নিশ্চয়ই। সীতার ব্যাপারে অতবড় মারাত্মক ভুলটা যদি না করতাম—

ভুল?

ভুল বৈকি। সীতাকে যদি আমি কাল রাত্রে একাকী না ছেড়ে দিতাম তবে তো তাকে ঐ দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হতো না। হ্যামিলটনকে বাঁচাতে পারবে ভেবেই সীতাকে আমি যেতে দিয়েছিলাম এবং সেটা যে আমার কত বড় ভুল—

কিন্তু একটা কথা আমি এখনো বুঝে উঠতে পারি নি মিঃ রায়?

কি?

শেষ পর্যন্ত ঐ স্কাউণ্ড্রেলটাকে বাঁচানোর জন্য আপনারই বা মাথাব্যথা হয়েছিল কেন?

ঐখানেই তো আপনি ভুল করছেন নির্মলশিববাবু।

ভুল করছি মানে?

নিশ্চয়ই, কারণ সত্যি সত্যিই লোকটা স্কাউণ্ড্রেল নয়। বরং বলতে পারেন হতভাগ্য।

হতভাগ্য!

হ্যাঁ। অমন স্ত্রী আর তার ভালবাসা পেয়েও নচেৎ লোকটার আজ এই পরিণতি হয়! তাকে দুর্ভাগা ছাড়া আর কি বলব বলুন?

লোকটার প্রতি দেখছি এখনও আপনার মমতার অন্ত নেই। একটা ডায়বলিক্যাল মার্ডারার—

মার্ডারার!

নিশ্চয়ই খুনী—

কে খুনী? হ্যামিলটন? কিন্তু সে তো খুনী নয়।

খুনী নয় মানে—

অতি প্রাঞ্জল। সে হত্যা করে নি সীতাকে।

কথাটায় এবারে আমিও চমকে উঠি। কি বলছিস কিরীটী!

কিরীটী শান্ত মৃদুকণ্ঠে বলে, ঠিকই বলছি—সে খুন করে নি।

কিন্তু—

লোকটা হ্যামিলটনের মত দেখতে হয়তো। বলতে বলতে মৃদু হাসে কিরীটী।

অতঃপর প্রশ্নটা না করে পারি না। শুধাই, কে? কে তবে ঠিক হ্যামিলটনের মতই অবিকল দেখতে লোকটা?

হ্যামিলটনের ছদ্মবেশে আসল খুনী।

ছদ্মবেশে?

হ্যাঁ, হাজত ঘরে গেলেই তোমাদের ভুল আমি ভেঙে দিতে পারব।

কিরীটীর কথায় সঙ্গে সঙ্গে নির্মলশিব উঠে দাঁড়ায়। এবং বলে, চলুন, এক্ষুনি চলুন। আমার সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে মিঃ রায়।

বেশ। চলুন।

সকলে আমরা হাজত ঘরের দিকে অগ্রসর হলাম।

থানার লকআপেই লোকটা তখনও ছিল এবং লকআপে থাকলেও কিরীটীর পূর্ব নির্দেশ মত তার হাতে হাতকড়া দেওয়া ছিল।

আমরা সকলে এসে থানার সেই লকআপের মধ্যে তালা খুলে ঢুকলাম।

দিনের বেলাতেও ঘরটার মধ্যে আলো না জ্বাললে ভাল করে সব কিছু দৃষ্টিতে আসে না।

মুখ ঘুরিয়ে দেওয়ালের দিকে বসেছিল লোকটা।

আমাদের পদশব্দে সে ফিরে তাকাল।

লোকটার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই কেন যেন বুকটার মধ্যে শির শির করে ওঠে।

পিঞ্জরাবদ্ধ ক্রুদ্ধ আক্রোশে বাঘের মতই যেন চোখ দুটো তার জ্বলছিল তখন।

কিন্তু কিরীটী একটু আগে কি বলল!

এ তো আর্থার হ্যামিলটনই!

কিরীটী?

আমার ডাকে কিরীটী মৃদু হেসে বললে, এখনও মনে হচ্ছে আর্থার হ্যামিলটনই। তাই-না?

আমি এবং নির্মলশিব দুজনাই কিরীটীর মুখের দিকে তাকাই। এবার কিরীটি বলে, কিন্তু ভাল করে ওর চোখের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবি সে নয়। তোদের কেন সকলেরই ঐ ভুল হওয়াটা একান্তই স্বাভাবিক। তবে হ্যামিলটনের অপূর্ব ছদ্মবেশ নেওয়া সত্ত্বেও আমি ওর চোখের দিকে তাকিয়েই গতকাল বুঝতে পেরেছিলাম—চিনতে পেরেছিলাম ও আসলে কে। ওর ঐ দুটো চোখই আমাকে ওর সত্যকারের পরিচয় দিয়েছিল ওর ছদ্মবেশ নেওয়া সত্ত্বেও, হ্যাঁ, তোমাদের সকলকে ফাঁকি দিতে পারলেও ও আমাকে ফাঁকি দিতে পারে নি। now you see—

বলতে বলতে এগিয়ে গিয়ে লোকটার দাড়ি ধরে একটা হেচকা টান দিতেই স্পিরিটগামের সাহায্যে লাগান ফলস্ মেকআপের দাড়ি গোঁফ কিরীটীর হাতের মুঠোর মধ্যে চলে এল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি চমকে উঠলাম এতক্ষণে লোকটাকে চিনতে পেরে।

আর্থার হ্যামিলটন নয়। কাঞ্জিলাল।

অস্ফুট কণ্ঠ দিয়ে আমাদের বের হয়ে এল, একি! কাঞ্জিলাল!

হ্যাঁ, কাঞ্জিলাল। চিরঞ্জীব কাঞ্জিলাল।

॥ ২৪ ॥

আশ্চর্য! চিরঞ্জীব কাঞ্জিলাল!

কিরীটী মৃদু হেসে অদূরে দণ্ডায়মান চিরঞ্জীব কাঞ্জিলালের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, হ্যাঁ, আপাততঃ তাই মনে হলেও ঐ নামটিও কিন্তু ওর আসল আদি ও অকৃত্রিম নাম বা পরিচয় নয়। ছদ্মবেশের মত ওটিই আর একটি ছদ্মনাম।

ছদ্মনাম?

হ্যাঁ, মহৎ ব্যক্তি ও গুণীজন কিনা তাই ভদ্রলোক অনেক নামেই পরিচিত।

আরও নাম ওর আছে?, শুধাল এবারে নির্মলশিববাবুই।

আছে। আমি অবিশ্যি আর দুটি নাম জানি।

আরও দুটি নাম ওর জানেন!

জানি। বোম্বাই শহরে বৎসর চারেক পূর্বে উনি বিশেষভাবে পরিচিত

ছিলেন, মিঃ রাখন নামে। এবং তার পূর্বে বছর সাতেক আগে ছিলেন মাদ্রাজে। সেখানে নাম নিয়েছিলেন মিঃ অবিনাশ—লিঙ্গম।

তাই নাকি!

হ্যাঁ। তিন চারটি ভাষা ওর আয়ত্তে।

তবে ওর আসল নামটা কি? নির্মলশিব প্রশ্ন করে।

আসল নামটি যে কি একমাত্র বলতে পারেন উনিই। বলেই চিরঞ্জীবের দিকে তাকিয়ে কিরীটী প্রশ্ন করল, বলুন না মিঃ কাঞ্জিলাল, আপনার আসল, আদিম ও অকৃত্রিম নামটা কি?

বলাই বাহুল্য কাঞ্জিলাল নিরুত্তর রইল।

কেবল ক্রুদ্ধ জলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল নিঃশব্দে আমাদের দিকে।

কিরীটী মৃদু হেসে বলে, বোবার শত্রু নেই নির্মমশিববাবু। অতএব উনি বোবা মৌনী। যাকৃগে—এখানে আর নয়, চলুন বাইরে যাওয়া যাক।

আমরা পুনরায় নির্মলশিবের আফিস ঘরে ফিরে এলাম।

একটা চেয়ারে বসে একটা চুরোটে অগ্নি সংযোগে মনোনিবেশ করে কিরীটী।

আমিই এবারে শুধাই, ওকে তাহলে তুই পূর্ব হতেই সন্দেহ করেছিলি?

হ্যাঁ, চায়না টাউন হোটেলে ওকে যেদিন প্রথম দেখি বলা বাহুল্য আমি ওর চোখের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠেছিলাম কারণ ওর ঐ দুটি চোখ মনের পাতায় আমার অনেক দিন থেকেই গাঁথা ছিল।

ওকে তুই পূর্বে দেখেছিলি?

চাক্ষুস নয়, ফটোতে।

ফটোতে?

হ্যাঁ। ক্রিমিন্যাল রেকর্ড সেক্‌সনের দপ্তরে ওদের মত বহু চিহ্নিত গুণীজনদের যে সব নানাবিধ পরিচিতি সংরক্ষিত থাকে সেই রকমই একটা ফটোর অ্যালবামে ওর চেহারার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। ফটোতে সেই সময় ওরই চোখ দুটি সেদিনই আমার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছিল। এবং সেই দিনই ডি. সি.-কে আমি বলেছিলাম, চোখের ঐ দৃষ্টি একজন সাধারণ কালপ্রিটের নয়। রক্তের মধ্যে যাদের ক্রাইমের বিষাক্ত বীজ থাকে ও চোখের দৃষ্টি তাদেরই।

আমরা যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত কিরীটীর বিশ্লেষণ শুনতে থাকি।

কিরীটী বলতে থাকে: সেই সময়ই ডি. সি.-র কাছে লোকটার কিছু পরিচয় আমি পাই। কারণ লোকটা সম্পর্কে জানতে আমার সত্যিই আগ্রহ হয়েছিল কিন্তু ডি. সি. আমাকে বিশেষ কোন ইনফরমেশন লোকটার সম্পর্কে দিতে পারলেন না। বোম্বাই এবং মাদ্রাজের ব্যাপারটুকুই কেবল আমাকে সে সময় তিনি বললেন। মামলাটা ছিল সোনার চোরাই কারবার ও নোট জালের ব্যাপার। কিন্তু সে সময় লোকটিকে ধরেও স্থানীয় পুলিসের কর্তারা জোরালো প্রমাণের অভাবে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল ওকে।

তারপর? রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করে নির্মলশিববাবু।

তার পর বেশ কিছুদিন লোকটার আর কোন পাত্তাই পাওয়া যায় না। এবং শ্রীমান যে ইতিমধ্যে কলকাতা শহরে এসে চিরঞ্জীব কাঞ্জিলাল নাম নিয়ে তার কর্মের জাল বিছিয়েছে পুলিসের কর্তৃপক্ষ এতদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি।

তারপর?

তারপর সেদিন যখন ওকে আমি হ্যামিলটনকে অনুসরণ করতে করতে গিয়ে চায়না টাউন হোটেলে প্রথম দেখলাম, আমি আর কালবিলম্ব করি নি। সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের দৃষ্টি ওর 'পরে আমি আকর্ষণ করাই। এবং অনুসন্ধানের ফলে বিচিত্র এক ইতিহাস আমরা জানতে পারি।

ইতিহাস?

হ্যাঁ, সেই ইতিহাসই এবার বলব। প্রথমে মাদ্রাজে এবং পরে বোম্বাই থেকে পুলিসের তাড়ায় কারবার গুটিয়ে সম্ভবত চিরঞ্জীব—ঐ নামেই বলব, কলকাতায় চলে আসে সোজা। কলকাতায় এসে তার পরিচয় হয় ঘটোৎকচ অর্থাৎ আমাদের পিয়ারীলালের সঙ্গে। পিয়ারীলাল লোকটা দুর্ধর্ষ ও শয়তান কিন্তু চিরঞ্জীবের মত তার কুটবুদ্ধি ছিল না। পিয়ারীলাল তখন চায়না টাউন হোটেলটি এক ফ্রান্সিস মুরের কাছ থেকে ষড়যন্ত্র করে বাগিয়ে নিয়ে সবে হোটেলটির মালিক হয়েছে। পিয়ারীলালের সঙ্গে দোস্তি পাতিয়ে চিরঞ্জীব ঐ চায়না টাউন হোটেলেই আস্তানা নিল। তারপর পিয়ারীলালের মাথায় হাত বুলাতে কাঞ্জিলালের বিশেষ বেগ পেতে হয় নি। অতি সহজেই সে হোটেলটি গ্রাস করে নিল। এবং তার একটা পাকাপাকি নিশ্চিন্ত আস্তানাও হলো। আস্তানা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিরঞ্জীব

আবার তার পুরাতন কারবার অর্থাৎ নোট জাল ও সোনার চোরাকারবারে মন দিল। একে একে সোনার লোভে লোভে চিরঞ্জীবের দলে লোক এসে জুটতে লাগল।

কিন্তু আর্থার হ্যামিলটন ও তার স্ত্রী সীতা—

সেই কথাই এবারে বলব। ঘটোৎকচের পিয়ারীলালই আসল নাম নয়—

তবে?

ওর আসল নাম হচ্ছে ফ্রান্সিস মুর। নেটিভ ক্রিশ্চান। ফ্রান্সিস আর আর্থার ছিল দীর্ঘ দিনের বন্ধু।

বন্ধু!

হ্যাঁ। কিন্তু বন্ধুত্বটা 'য কিভাবে এত গাঢ় হয়েছিল সেটাই বিচিত্র। কারণ আর্থার তার বন্ধুর মত শয়তান ছিল না। তবে মনের মধ্যে লোভ ছিল অর্থের এবং আমার মনে হয় ঐ লোভই হয়েছিল তাদের পরস্পরের বন্ধুত্বের বাঁধন। যাই হোক যা বলছিলাম তাই বলি। চিরঞ্জীব কলকাতায় স্থিতি হবার পর তার ওভারসিজ লিংক কোম্পানী গড়ে তুললো। এবং বরাবর যেমন সে করে এসেছে এবারেও তেমনি ওভারসিজ লিংকই নয়—সঙ্গে নিজেকে এবং তার আসল কারবারকে পুলিসের শ্যেন দৃষ্টি থেকে বাঁচাবার জন্য আরও কয়েকটি উপঘাঁটি গড়ে তুলল। অবশ্যই প্রত্যেকটি উপঘাঁটিই কাছাকাছি গড়ে তুলল কেবল বিশেষ দুটি ঘাঁটি ছাড়া—প্রথম তার নিজের বাসস্থানটি ও দ্বিতীয় নোট জালের কারখানাটি—দূরে দূরে রইল।

হস্তধৃত সিগারটা ইতিমধ্যে কথা বলতে বলতে নিভে গিয়েছিল।

সেটায় পুনরায় অগ্নিসংযোগ করে গোটা দুই টান দিয়ে কিরীটী তার অর্ধসমাপ্ত কাহিনীর পুনরাবৃত্তিতে ফিরে এল।

কিরীটী বলতে লাগল: চায়না টাউন হোটেল ও বারুইপুরের ঘাঁটি বাদে অন্যান্য ঘাঁটি হলো তার, ওভারসিজ লিংক, পান্থ পিয়াবাস রেঁস্তোরা ও লাটুবাবুর গ্যারাজ। এবং নিজেকে ও সেই সঙ্গে নোট জালের কারখানাটি আড়াল করে রাখবার জন্য আমাদানী হলো 'উর্বশী সিগারেট'।

॥ ২৫ ॥

কিরীটী বলতে লাগল, চিরঞ্জীব কাঞ্জিলালের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল সর্বপ্রথম ফ্রান্সিস—আমাদের ঘটোৎকচ বা পিয়ারীলাল। তারপর এলো পানওয়ালা ভিখন ও পান্থ পিয়াবাসের মালিক কালীকিঙ্কর সাউ। এবং সর্বশেষে আমাদের হ্যামিলটন ও তার সুন্দরী স্ত্রী সীতা হ্যামিলটন।

আর্থার হ্যামিলটনের মনের মধ্যে অর্থের প্রতি লোভ থাকলেও দুর্বুদ্ধি ছিল না আগেই বলেছি। এবং স্ত্রীর সঙ্গে তার নেশার ব্যাপারে প্রায়শঃই খিটিমিটি লেগে থাকলেও কেউ তারা স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের কাছ থেকে সেপারেশনের কথাও বোধ হয় ভাবতে পারে নি।

এমন সময় চিরঞ্জীব কাঞ্জিলালের ঘটল অকস্মাৎ একদিন ঘটোৎকচের সঙ্গে বর্ধমানে হ্যামিলটনেরই রেলওয়ে কোয়ার্টারে কোন এক নিদারুণ অশুভক্ষণে আগমন। এবং এবারের ইতিহাস যা আমাকে কিছু কিছু বলেছিল আর্থার হ্যামিলটন এবং বাকীটা আমার অনুমানের 'পরে নির্ভর করে আমি গড়ে তুলেছি।

এতক্ষণে যেন কিরীটীর কথায় অকস্মাৎ আমাদের সকলেরই আর্থার হ্যামিলটনের কথাটা মনে পড়ল।

বর্তমান নাটকে বিশিষ্ট একটি স্থান নিয়েও আর্থার হ্যামিলটনকে যেন আমরা সীতার করুণ ট্র্যাজিডির সঙ্গে জড়িত হয়ে ও চিরঞ্জীব কাঞ্জিলালের প্রসঙ্গে এক প্রকার ভুলেই গিয়েছিলাম।

তাই হ্যামিলটনের কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমিই বললাম, আর্থার এখন কোথায় তুই জানিস কিরীটী?

জানি।

কোথায়?

বর্তমানে সে আসানসোলে তার এক আত্মীয়ের বাসায় পুলিশের সতর্ক প্রহরায় রয়েছে।

আসানসোলে?

হ্যাঁ।

কবে সেখানে গেল?

কাল রাত্রের ট্রেনে। আমিই অবিশ্যি ডি.সি.-কে বলে ব্যবস্থা করেছি।

সীতার ব্যাপারটা আর্থার জানে না বোধ হয়?

না।

কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না কিরীটী—

কি?

আর্থারের ব্যবস্থা যখন তুই করেছিলিই, সে রাত্রে সীতাকে চায়না টাউনে যেতে দিলি কেন?

না যেতে দিলে চিরঞ্জীব কাঞ্জিলালকে আজ তো হাতে-নাতে ধরতে পারতাম না। কিন্তু তাকে যেতে দিয়ে আমি ভুল করি নি—ভুল করেছি তাকে একা যেতে দিয়ে। কারণ আমার ধারণা ছিল—

কী?

কাঞ্জিলাল হয়তো শেষ পর্যন্ত সীতাকে হত্যা করবে না।

হঠাৎ অমন বিদঘুটে ধারণাটা কেন হল আপনার মিঃ রায়? প্রশ্নটা করল নির্মলশিববাবু।

কারণ, আমি জানতাম সীতাকে সত্যিই ভালবাসে কাঞ্জিলাল।

কিসে বুঝলেন সেটা?

শেষ মুহূর্তে যে কাঞ্জিলাল সীতাকে চরম আঘাত হেনেছিল সেই একটিমাত্র ঘটনা থেকেই। যাকে ভালবেসেছি বলে আগাগোড়া জেনে এসেছি এবং সেও আমাকেই ভালবাসে বলে জেনে এসেছি, হঠাৎ যখন কোন এক মুহূর্তে সেই জানাটা মিথ্যা হয়ে যায়, অর্থাৎ জানতে পারি আমার জানাটা ভুল—সেই মুহূর্তে যে হিংসার আগুন জ্বলে ওঠে তা বড় ভয়ঙ্কর। কাঞ্জিলালেরও হয়েছিল ঠিক তাই। কাঞ্জিলাল যে মুহূর্তে জানতে পারলে সীতা আজও আর্থার হ্যামিলটনকে ভুলতে পারে নি—যতই দূরে যাক সে, আজও তার সমস্ত বুকটা জুড়ে রয়েছে তার ভূতপূর্ব স্বামী হ্যামিলটনই—খুব সম্ভবত চিরঞ্জীবের বুকের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠেছিল হিংসার ভয়াবহ আগুন। যে আগুনে সীতাকে তো সে ধ্বংস করলই, নিজেরও চরম সর্বনাশকে ডেকে আনল। যে পুলিশ গত এই কয় বছর ধরে তার বহুবিধ দুষ্কৃতির সন্ধান পেয়েও তাকে ধরতে বা ছুঁতে পারে নি, সেই পুলিশের হাতেই ধরা পড়ল আজ সে।

চিরঞ্জীব যে সীতাকে ভালবাসে জানলেন কি করে মিঃ রায়? নির্মলশিব প্রশ্ন করে।

কেন? আপনার লোকরা চায়না টাউনের প্রোপ্রাইটার চিরঞ্জীবের ঘর সার্চ করে যে সব জিনিসপত্র নিয়ে এসেছিল সেদিন, তার মধ্যে আপনি

কোন উল্লেখযোগ্য বস্তু না পেলেও—তার ঘরে যে বাঁধানো বাইবেলটি আপনার লোকেরা এনেছিল তার মধ্যে একটি ফটো আমি পেয়েছিলাম—

বলতে বলতে কিরীটী ছোট একটা ফটো বের করে আমাদের সামনে তুলে ধরল।

ফটোটা চিরঞ্জীব কাঞ্জিলালের।

নির্মলশিব ফটোটার দিকে তাকিয়ে বললে, এ তো চিরঞ্জীবের ফটো দেখছি, মিঃ রায়।

হ্যাঁ—তারই—তবে—

তবে আবার কি?

এর পিছনের লেখাটা পড়লেই আপনার ঐ 'তবে'র উত্তর পাবেন। এই দেখুন—

কিরীটী ফটোটা উল্টে ধরল।

দেখলাম তার পিছনে ইংরাজীতে লেখা আছে কালী দিয়ে—

To my darling Sita

Chiranjib.

এবং তার নীচে যে তারিখটা রয়েছে সেটা একবৎসর পূর্বের।

কিরীটী বলতে লাগল, ফটো এবং এই লেখাটুকুই চিরঞ্জীব সীতা রহস্য আমার কাছে পরিষ্কার করে দিয়েছিল।

কিন্তু এ ফটো চিরঞ্জীবের ঘরে বাইবেলের মধ্যে এল কি করে? প্রশ্ন করল নির্মলশিববাবু।

খুব সম্ভবত—আমার অনুমান পরে দুজনার মধ্যে আর্থার হ্যামিলটনকে নিয়ে মনোমালিন্য হওয়ায় হয় সীতাই চিরঞ্জীবকে ফটোটা ফেরত দিয়েছিল না হয় চিরঞ্জীবই চেয়ে নিয়েছিল সীতার কাছ থেকে। সে যাক্, হ্যামিলটন পর্বটা এবারে শেষ করি। হ্যামিলটনকে দলে সম্ভবত চিরঞ্জীব টেনে নিয়েছিল সীতার আকর্ষণে। যদিচ চিরঞ্জীবের জীবনে সেইটাই সর্বাপেক্ষা বড় ভুল হয়েছিল।

কেন? নির্মলশিববাবু আবার প্রশ্ন করে।

কারণ চিরঞ্জীব যে মারাত্মক খেলায় মেতেছিল অর্থাৎ নোট জাল ও সোনার চোরাকারবার তার মধ্যে দুর্বল প্রকৃতির নারীর স্থান নেই। এবং সীতা যদি তার জীবনের সঙ্গে ঐ ভাবে জড়িয়ে না পড়ত চিরঞ্জীবের আজকের এই পরাজয় ঘটত কিনা সন্দেহ।

॥ ২৬ ॥

কিরীটী বলতে লাগল, যাই হোক হ্যামিলটনকে দলে নিলেও চিরঞ্জীব কোনদিন তার উপরে সম্ভবত পূর্ণ আস্থা রাখতে পারে নি। তাই দলের মধ্যে তাকে সক্রিয় হতে দেয় নি।

তবে?

কিন্তু সীতার জন্য তাকে হাতের মুঠোর মধ্যে রাখার প্রয়োজন ছিল তাই হাতে রেখেছিল তাকে নেশার খোরাক জুগিয়ে!

নেশা!

হ্যাঁ, নেশা। মদের নেশা। এবং বোকা সরল প্রকৃতির আর্থার হ্যামিলটনকে সেই ভাবে নেশাগ্রস্ত করে হাতের মুঠোর মধ্যে নিতে কাঞ্জিলালকে খুব বেশী বেগ পেতে হয় নি। যাই হোক ঐ ভাবে চলছিল। এমন সময় দ্বিতীয় মারাত্মক ভুল করল কাঞ্জিলাল।

কি?

হ্যামিলটনকে নেগলেক্‌ট করে। সীতাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পাওয়ার পর চিরঞ্জীব হ্যামিলটনের আর আগের মত নেশার খোরাক জোগানর ব্যাপারে যখন হাত গুটিয়ে নিল তখনই শুরু হল গোলমাল। তা ছাড়া আরও একটা গোলমাল ইতিমধ্যে শুরু হয়েছিল।

কি?

লাভের ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে গোলমাল। যার ফলে দলের কেউ হয়তো আক্রোশের বশেই পুলিশকে উড়ো চিঠি দেয়। এবং যার ফলে একজনকে ইহজগৎ থেকে সরতে তো হলই সেই সঙ্গে মোহিনীমোহনকেও চিরঞ্জীবের ব্যাপারে মাথা গলানোর জন্য সরতে হল। এবং শেষ পর্যন্ত এসব ক্ষেত্রে যা হয় দলপতির সন্দেহটা তখন ক্রমশঃ এত তীব্র হয়ে উঠতে থাকে যে, তাদের দু'চারজনকে সেই সন্দেহের আগুনে পুড়ে মরতে হয়— ভিখনকে সেই কারণেই প্রাণ দিতে হয়েছে।

একটা কথা মিঃ রায়? নির্মলশিব প্রশ্ন করে ঐ সময়।

কি বলুন?

সীতা কি চিরঞ্জীবের সব ব্যাপার জানত?

সীতা ভিতরের ব্যাপারটা পুরোপুরি প্রথম দিকে না জানতে পারলেও শেষটায় বোধ হয় সন্দেহ করেছিল।

আর হ্যামিলটন?

হ্যামিলটন বোধ হয় তা জানতে পেরেছিল তবে জানতে পারলেও বেচারীর তখন আর মুখ খুলবার শক্তি নেই, কারণ রেসের ময়দান ও মদের বোতল তখন তাকে গ্রাস করছে। ঐ দুটি মারাত্মক নেশায় কাঞ্জিলালই হ্যামিলটনকে মজিয়েছিল ক্রমে ক্রমে এবং সেই নেশার সুযোগেই তাকে একদিন সম্পূর্ণ গ্রাস করেছিল সে কথা তো আগেই বলেছি।

তারপর?

তার পরের ব্যাপারটাই শেষোক্ত ট্রাজেডির মূল।

কি রকম?

নেশায় ও অর্থের দৈন্যে এবং সীতাকে হারিয়ে পর্যদুস্ত ও নিষ্পিষ্ট আর্থার হ্যামিলটন এসব ক্ষেত্রে যা হয় শেষ পর্যন্ত তাই করেছিল।

কি?

সেও শেষ পর্যন্ত মাত্র দশ দিন পূর্বে মরণ কামড় দিল।

কি রকম?

পুলিশের কর্তাকে বেনামা চিঠি দিল। কিন্তু ধূর্ত কাঞ্জিলাল ব্যাপারটা জেনে ফেলল। এবং সঙ্গে সঙ্গে সে হ্যামিলটনকে একেবারে দুনিয়া থেকে সরাবার জন্য ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত হতে লাগল।

কিন্তু হ্যামিলটনকে সরান কি কাঞ্জিলালের মত লোকের পক্ষে খুব কষ্টসাধ্য ছিল? প্রশ্ন করলাম আমি।

ছিল না নিশ্চয়ই, তবে সে পারে নি দুটো কারণে।

দুটো কারণে?

হ্যাঁ, প্রথমতঃ কাঞ্জিলাল খুব ভালভাবেই জানতো আর্থার হ্যামিলটনের সঙ্গে সীতার সেপারেশন হয়ে গেলেও সীতা আজও তাকে ভুলতে পারে নি। দ্বিতীয়তঃ হ্যামিলটনকে সরালে সীতাকে হারাতে হবে তার। সীতাকে কাঞ্জিলাল সত্যিই ভালবেসেছিল সে তো আগেই বলেছি। মদনের ফুলশর নয়, এখানে রতির বঙ্কিম কটাক্ষই শেষ পর্যন্ত অঘটন ঘটালো। তবে একটা কথা এখানে স্বীকার না করলেঃঅন্যায় হবে।

কি? প্রশ্ন করে নির্মলশিববাবু।

সারা দক্ষিণ কলকাতার রাস্তা জুড়ে যদি মোহিনীমোহনের লাশটা অতিরিক্ত দম্ভে কাঞ্জিলাল টুকরো টুকরো করে না ছড়িয়ে দিত তো বিশেষ করে দক্ষিণ কলকাতার 'পরেই দৃষ্টি আমার আকর্ষিত হতো না। এবং সেদিনও রাত্রে

বের হয়ে ঘুরতে-ঘুরতে ওভারসিজ লিংকের 'পরে আমার নজর পড়ত না। এবং ওভারসিজ লিংকে নেহাত কৌতুহলের বশে প্রবেশ করার পর সেখানে ঘটোৎকচ ও সীতা দেবীর দর্শন না পেলে ও সেদিনকার সেই ঘটনাটা না ঘটলে হ্যামিলটনকে ঘিরে ওভারসিজ লিংকের 'পরে সন্দেহটাও আমার ঘনীভূত হতো না।

কিন্তু এ সব কথা তুই জানলি কি করে?

কিছুটা অনুমান, কিছুটা অন্তর্দৃষ্টি, কিছুটা অনুসন্ধান ও বাদবাকী আর্থার হ্যামিলটনের মুখে।

আর্থার হ্যামিলটনের মুখে!

হ্যাঁ।

কি আশ্চর্য! তাহলে চিরঞ্জীব কাঞ্জিলালই সব রহস্যের মেঘনাদ? শুধালেন নির্মলশিববাবু।

হ্যাঁ, তবে আর একটা মাস দেরি হলে চিরঞ্জীব ঠিক নাগালের বাইরে চলে যেত, কারণ যে সোনা সে চুরি করে হস্তগত করেছিল তার বোধ হয় সবটাই সে মোটা মুনাফা রেখে বিদেশে পাচার করে দিতে পেরেছিল। ওভারসিজ লিংকের কারবার সে হয়তো এভাবে শীঘ্রই গুটিয়ে নিত। কিন্তু কথায় বলে—ধর্মের কল। ঠিক সময়েই ঘটনাচক্রে যোগাযোগটা এমন হয়ে গেল যে চিরঞ্জীবের আর পালানো হলো না।

পালাতো মানে? পালালেই হলো নাকি? নির্মলশিব সদম্ভে বলে ওঠে।

পালাতো। আর একবার জাল গুটিয়ে নিলে স্বয়ং কিরীটী রায়েরও সাধ্য ছিল না চিরঞ্জীবের চুলের ডগাটি স্পর্শ করে।

সত্যি বলছেন মিঃ রায়?

এতটুকুও অত্যুক্তি নয়। ও যে কত বড় শয়তান আপনারা জানেন না এখনও, কিন্তু আমি তার সম্যক পরিচয় পেয়েছি। তবে দুঃখ রয়ে গেল, শেষ পর্যন্ত সীতাকে বাঁচাতে পারলাম না।

কি আশ্চর্য! তার জন্য আর দুঃখ কি! গিয়েছে ভালই হয়েছে, যেমন ও পথে পা দিয়েছিল!

হ্যাঁ, সবই সত্যি, তবু কখনও বোধ হয় ভুলতে পারব না শেষ পর্যন্ত যে আমার শেষ মুহূর্তে ঐ ভুলটা না হলে বুঝি তাকে অমন করে কাঞ্জিলালের হাতে প্রাণ দিতে হতো না।

নির্মলশিব শেষবারের মত বললে, কি আশ্চর্য!

॥ সমাপ্ত ॥